CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

संगीत नायक

7'3

(बंगला भाषा)

ले॰ निमाईचाँद वड़ाल

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भारतनिधि, करौंदी
वाराणसी-5

पृ॰ 188

5"×8"

प्रीति प्रकाशनी

कलकत्ता

१९६०

1970

ालय
राणसी-५

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भरतनिधि, करौंदी
वाराणसी-5

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

आम्नाय-ग्रन्थाल
करुणानिधि, करौंदी
वाराणसी-5

সঙ্গীত নায়ক

(ঔপপত্তিক গ্রন্থ)

প্রথম খণ্ড

With best compliments,
of the Author
Nemai Chand Boral
21.10.70.
New Delhi

অধ্যাপক **নিমাইচাঁদ বড়াল**

বিশ্বভারতীর সঙ্গীতের অধ্যাপক ও আকাশবাণী
কলিকাতার উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ সঙ্গীতের
প্রথম শ্রেণীর শিল্পী

★

শ্রীতি প্রকাশনী

৪১, হরিতুকীবাগান লেন, কলিকাতা-৬

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই পুস্তকের কপি রাইট গ্রন্থকার অধ্যাপক
শ্রীনিমাই চাঁদ বড়ালের সর্বসংরক্ষিত

১ম সংস্করণ আগষ্ট ১৯৭০

वाराणसी-5

মূল্য দশ টাকা

শ্রীনির্ম্মল সাহা কর্ত্তৃক পেপার ও প্রিণ্ট ৪১নং হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত ও শ্রীঅর্জুন সাহা কর্ত্তৃক প্রীতি প্রকাশনী ৪১, হরিতুকী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আম্নায়-গ্রন্থা
বরতনিধি, কবীর
বারাণসী-5

VISVA-BHARATI

FOUNDED BY
RABINDRANATH TAGORE

ACHARYA
INDIRA GANDHI
UPACHARYA
KALIDAS BHATTACHARYYA

SANTINIKETAN
WEST BENGAL, INDIA
Phone :—BOLPUR—451 (6 lines)

Ref. No...................

২রা মে, ১৯৭০

আমাদের সঙ্গীতভবনের অধ্যাপক শ্রীনিমাইচাঁদ বড়াল ধ্রুপদী কণ্ঠশিল্পীরূপে আমাদের দেশে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। সকলেই জানেন তিনি যে-বড়াল পরিবারে জন্মগ্রহন করেছেন সেই পরিবারের অনেকেই বিখ্যাত সঙ্গীত বিশারদ। শ্রীবড়াল পারিবারিক ধারা কৃতিত্বের সঙ্গে রক্ষা করে যাচ্ছেন।

বর্তমান গ্রন্থে তিনি ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। সঙ্গীতশাস্ত্র আমার অজানা। সঙ্গীত প্রিয় সাধারণ নাগরিকের যতটুকু জ্ঞান থাকে তার ভিত্তিতেই বলতে পারি গ্রন্থখানি সকলেরই ভাল লাগবে, এবং আমার মত সাধারণ নাগরিকেরা এই গ্রন্থ পাঠ করে প্রচুর জ্ঞান সঞ্চয় করবেন। যে কয়জন প্রকৃত সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছেন তাঁরা সকলেই প্রভূত প্রশংসা করেছেন।

আমাদেরই সঙ্গীতভবনের একজন অধ্যাপক যে এই জাতীয় উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ প্রকাশ করছেন, এর জন্য আমি গর্বিত বোধ করছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি এই গ্রন্থের যথাযোগ্য প্রচার হোক, এবং গ্রন্থকারও যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করুন।

স্বাঃ কালিদাস ভট্টাচার্য্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

D. J. Joshi M. A. M. Mus.,
Professor and Head of the
Department of Classical Music.

Sangit Bhabana
Santiniketan
West Bengal

অধ্যাপক নিমাই চাঁদ বড়াল রচিত 'সঙ্গীত নায়ক' একটি পূর্ণাঙ্গ ঔপপত্তিক সঙ্গীত গ্রন্থ। গ্রন্থ প্রণয়ন কালে শ্রীবড়াল আমার সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শও গ্রহণ করেন। গ্রন্থের পর্যালোচনায় লেখক একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি প্রভূত শ্রম স্বীকার করেছেন। গ্রন্থে এমন কয়েকটি নূতন অধ্যায়ের সংযোজনা ঘটেছে, যা অন্যত্র অদৃষ্টপূর্ব। যেমন, ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি, আধুনিক কালের সঙ্গীতের সমস্যা ও শিক্ষাপদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বর-সাধনা এবং কণ্ঠস্বর উৎপাদনের বিভিন্ন তথ্যমূলক চিত্র প্রভৃতি।

বর্তমানে সঙ্গীত শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নব নব পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে, সেই সব .বিষয়ের মূল্যবান আলোচনা উপরিউক্ত অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে এবং আমার বিশ্বাস ঐ আলোচনা বর্তমান সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের নানাভাবে সাহায্য করবে এবং গবেষকদেরও বিচিত্র নূতন তথ্য যোগাবে।

শ্রীবড়াল বিখ্যাত "ডাগর" ধ্রুপদ ঘরানার শিষ্য, এ বিষয়ে তাঁর উপর আস্থা রাখি।

গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য একটি মূল্যবান দিক হল এই যে, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী, কলিকাতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং অন্যান্য সঙ্গীত সংস্থার সঙ্গীত শিক্ষা-ক্রমের বিষয়গুলি ঔপপত্তিক অধ্যায়ে পূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে। বস্তুতঃ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের, সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের এবং অনুমোদিত সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের মাধ্যমে বাংলা দেশে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার সত্ত্বেও বাংলায় পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থের একান্ত অভাব ছিল। শ্রীবড়াল সে অভাব পূর্ণ করে দেশবাসী সঙ্গীতানুরাগীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। তাঁর গ্রন্থ সঙ্গীত শিক্ষার্থীর প্রভূত সহায়তা করবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ধ্রুপদী কণ্ঠশিল্পী হিসেবে শ্রীবড়ালের খ্যাতি আজ সুবিদিত। তিনি কলকাতার প্রখ্যাত বড়াল পরিবারের সন্তান এবং বর্তমানে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনে সঙ্গীতের অধ্যাপক।

শ্রীবড়াল রচিত 'সঙ্গীতনায়ক' সঙ্গীত বিষয়ক জগতে একটি মূল্যবান সংযোজন।

৯ই ফাল্গুন, ১৩৭৬
শান্তিনিকেতন।

স্বাঃ ধ্রুবতারা যোশী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Sri Nimai Chand Boral
Santiniketan

4224 Osage Avenue
Apt. 17 A., Philadelphia
Pa 19104, U.S.A.
14.3.70.

স্নেহাস্পদেষু,

তোমার ১.২.৭০ এর চিঠির জন্য ধন্যবাদ।
তিন খণ্ড "সঙ্গীত সাধনা" প্রকাশ করেছ জেনে অত্যন্ত
আনন্দিত ও আশান্বিত হলাম। খুশী হবার কারণ দুটি।
একটি, বাংলাভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করেছ বলে; আর দ্বিতীয়টি,
তুমি নিজ পরিশ্রম করে এগুলি লিখেছ বলে।
বাংলা দেশে সাধারণভাবে সঙ্গীতের চর্চার অভাব।
যতটুকু চর্চা, সে তুলনায় সঙ্গীত-গ্রন্থের সংখ্যা খুবই কম
বলতে হবে। তার মধ্যে, সব গ্রন্থই যে প্রয়োজনীয় তাও নয়।
কাজেই, তোমার মত যোগ্য ব্যক্তি, যে দীর্ঘদিন ধরে
ভারতীয় উচ্চ পর্যায়ের সঙ্গীত গুণী গুরুদের কাছে শিক্ষা
পেয়েছে, সাধনা করেছে, অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এবং এ সম্বন্ধে
যথেষ্ট অর্জন করেছে, শুধু তাই নয়, এখানে-ওখানের সঙ্গে প্রতিভার
যে সূক্ষ্ম-দৃষ্টি দিয়ে সমসাময়িক সমস্ত সঙ্গীতধারার প্রতি
[illegible] তাঁর মানবতা ও প্রগতিশীল অন্তর দিয়ে সচেতন
হয়েছে এবং প্রয়োজন বোধ অনুভব করে নিজের জ্ঞান ও
অর্জনের অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে, যদি শিক্ষার্থী ও বিদ্যানুরাগীর
প্রয়োজন মিটিয়ে গ্রন্থ রচনা করে, তবে সে গ্রন্থ যে একান্ত
উপাদেয়, সকলেরই জানা কথা যে আমার মত
আমার সঙ্গে অভিজ্ঞ ও যুক্তিসম্মত ভাবেই মান করি।
তোমার চেষ্টা সার্থক হোক এই প্রার্থনা করি।

ইতি,
শুভাকাঙ্ক্ষী,
জ্ঞান ঘোষ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গ্রন্থকারের নিবেদন

পরিবারের ধারা রক্ষার্থে, গুরুজনদের আশীর্বাদ যুক্ত প্রেরণায় ও আপন উদ্দীপনায় সঙ্গীত শিল্পী হবার আদর্শ বহন করছি। কিন্তু কতটা সাফল্য অর্জন করেছি, তা বিচার করবেন সঙ্গীতানুরাগী গুণমুগ্ধ শ্রোতা। সঙ্গীত-শিক্ষা জীবনে কোনোদিন যে অবহেলা করিনি, তা জোরের সঙ্গে বলতে পারি। সঙ্গীত শিক্ষাগুরু যা নির্দেশ দিয়েছেন, মনে প্রাণে তা গ্রহণ করেছি ও সাধনার ক্ষেত্রে তার পূর্ণরূপ দেবার চেষ্টা করছি।

দীর্ঘকাল সঙ্গীত অধ্যাপনার কাজে লিপ্ত থেকে সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের যে অসুবিধেগুলি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমার যৎসামান্য অভিজ্ঞতা হতে এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হলাম। যদি কোনো সঙ্গীত পিপাসু বা সঙ্গীত শিক্ষার্থীর এই সঙ্গীত গ্রন্থটি সামান্যতম প্রয়োজনে লাগে, তবে নিজেকে ধন্য মনে করব এবং গ্রন্থটিতে কোন ত্রুটি থেকে থাকলে মার্জনা করবেন, আশা করি। অনিবার্য কারণে নির্দেশসূচক গ্রন্থ তালিকাটি আপাততঃ দিতে না পারায় দুঃখিত।

সঙ্গীত গ্রন্থ রচনায় যাঁরা বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে বিশ্বভারতীর বাংলা সঙ্গীত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীশান্তি দেব ঘোষের নাম স্মরণ করি। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীধ্রুবতারা যোশী তাঁর বহুমূল্য মতামত দিয়ে বাধিত করেছেন। আমাদের সহকর্মী শ্রীভি, ভি, ওয়াজেলকার, ডঃ ভার্মা, বিজ্ঞান বিভাগের শ্রীযুক্ত বিনয় কর্মকার, ডঃ পার্থসারথী ঘোষ, বাংলা বিভাগের শ্রীযুক্ত সৌমেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত বিমল দত্ত, চিকিৎসা বিভাগীয় ডঃ সুশোভন বন্দোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা আমার গ্রন্থ রচনা নানাভাবে সাহায্য করায় কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থটি মুদ্রণের সময় কল্যাণীয়া রাগশ্রী বড়াল নানা দিক হতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

সমগ্র গ্রন্থটির রচনা আদৌ সম্ভব হত না, যদি না বিশ্বভারতীর প্রাক্তন শ্রদ্ধেয় উপাচার্য, ভারতের মাননীয় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাস ও বর্তমান উপাচার্য শ্রদ্ধেয় ডঃ কালীদাস ভট্টাচার্য আমায় নানা দিক হতে সাহায্য ও সহযোগীতা না করতেন।

সর্বশেষে এই গ্রন্থটির মুদ্রণের ও প্রকাশের জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মল কুমার সাহা মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

নিমাই চাঁদ বড়াল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भरतनिधि, करौंदी
वाराणसी-5

সূচী পত্র

	পাতা
উপক্রমণিকা	... (i)
প্রথম অধ্যায়	
ঔপপত্তিক	... 1
দ্বিতীয় অধ্যায়	
সঙ্গীত ও শিক্ষা তত্ত্ব	... 126
তৃতীয় অধ্যায়	
ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি	... 134
চতুর্থ অধ্যায়	
আধুনিক কালে সঙ্গীতের সমস্যা ও শিক্ষা পদ্ধতি	... 150
পঞ্চম অধ্যায়	
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বর সাধনা	... 156
চিত্র	... 169

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপক্রমণিকা

Convention বা নিয়মানুগ সংস্কার বলে যে কথাটি আছে, তা সাধারণভাবে আমরা মেনেই নিয়েছি। যদি নামানতাম তবে হয়তো আমরা ভিত্তিহীন হয়ে পড়তাম। আমরা চোখে যা দেখতে পাই, তাকে convention এর মাধ্যমেই গ্রহণ করেছি। যেমন একটি 'গাছ'। আমরা শৈশবাবস্থা হতেই বস্তুটি 'গাছ' বলে জেনেছি, এবং বস্তুটির গাছের বদলে যদি অন্য নাম প্রচলিত থাকত তবে তাই বলতাম। গাছের 'গা' এবং 'ছ' এ দুটির সাথে এমন কোনো বৈজ্ঞানিক বা ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি নিহিত নেই, যার দ্বারা 'গাছ' শব্দটির সাথে বস্তুটির কোনো সাদৃশ্য দেখতে পাই। এটাই convention এর মাধ্যমে স্বীকার করেছি।

কোনো কিছু বলতে গিয়ে পুরাতন কথার (Reference) নির্দেশ আমরা নিয়েথাকি। কোনো কোনো সময় বক্তা বা গ্রন্থকার মূল বাক্যটির প্রস্তাবনা করেন। কিন্তু এখানে সেই সব দুর্বোধ্য বাক্যের অবতারণা না করে মূল উপলব্ধি হ'তেই আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ করব।

আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু হ'লো "ভারতীয় সঙ্গীত"। 'রাগ,' বাংলা শব্দটার সাথে আমরা সবাই অল্পবিস্তর পরিচিত। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে 'রাগ' শব্দটার আরো কিছু সংজ্ঞাযুক্ত অর্থ পাওয়া যায়। "যে সুর সমষ্টির প্রয়োগ মানুষের মনকে রাঙিয়ে তোলে, তাহাই ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে 'রাগ'।" এই মনকে রাঙিয়ে তোলার ক্ষেত্রে, ভারতীয় সঙ্গীতের ঔপপত্তিক নানা নিয়মকানুন প্রযুক্ত হয়েছে, যার আলোচনা এই বিষয় বস্তুর অন্তর্গত নয়।

সঙ্গীত জগতে যে (Melody) সুতামগুলি রাগের পর্যায়ে সাধারণভাবে সর্বজন স্বীকৃত এখানে তারই ভাব ও রস নিয়ে আলোচনা করব।

গীত, বাদ্য, নৃত্য এবং কাব্য পৃথক পৃথক ভাবে অথবা মিলিত রূপে, যে অলৌকিক, অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভূতির সৃষ্টি করে এবং যার দ্বারা শ্রোতার মনকে তন্ময় করে তোলে, তাহাই 'রস'।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের মনে যে অনেক প্রকার ভাব সঞ্চার হয়, তাহাও 'রস' নামে পরিচিত। সাহিত্য জগতে এই সব ভাবগুলি, নয় ভাগে বিভক্ত এবং শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, বীর, শান্ত, ভয়ানক, রুদ্র, বিভৎস এবং অদ্ভুত ইত্যাদি বিভিন্ন রসের পরিভাষা। রসের প্রথম পরিভাষা, গায়ক, বাদক, নর্তক, দর্শকদের মনকে তন্ময় করে তোলে। যোগীদের ধ্যানের সময় যোগীরা যেমন ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকেন, রসমগ্ন কলাকারও ঐরূপ সঙ্গীতের ধ্যানে একেবারে মগ্ন হয়ে যান। যোগী মগ্ন হন তাঁর ইষ্টদেবের ধ্যানে এবং তখন জগতের পার্থিব বস্তুর প্রতি জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। তেমনি কলাকার অর্থাৎ গায়ক, বাদক, অথবা নর্তকও নিজের বিষয়বস্তুর, সঙ্গীতের সুর অথবা ছন্দের ধ্যানে ধ্যানস্থ হয়ে মগ্ন থাকেন।

রসের প্রভাব সাহিত্যে এবং সঙ্গীতে সমানভাবেই পড়েছে। রসহীন সঙ্গীতকে নীরস এবং রসযুক্ত সঙ্গীতকে সরস সঙ্গীত বলা হয়। সরস সঙ্গীত জনমনকে অভিভূত করে এবং আত্মার আনন্দের খোরাক যোগায়। সঙ্গীতের রসের স্থান যে কি তা অনায়াসেই বোঝা যায়। কারণ সঙ্গীত-শাস্ত্রে 'সরস গান' বা সঙ্গীতই গ্রহণীয় এবং নীরস সঙ্গীত বা গান সর্বদা পরিত্যাজ্য।

কলাকার শব্দ, রস ও রং প্রভৃতির একত্র সাধনার দ্বারা এমন এক পরিস্থিতি গড়ে তোলে, যেন, স-হৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে ভাব জাগরিত হয়। যখন ভাব নির্বিকার হয়ে যায় তখন মনে রস অথবা আনন্দের নিষ্পত্তি ঘটে। মানুষের মনের সাথে ভাবের সম্বন্ধ এবং আত্মার সাথে রসের সম্বন্ধ। গীতায় কথিত আছে, ইন্দ্রিয়ের পর মন, মনের পর বুদ্ধি, এবং বুদ্ধির পর আত্মা। এই আত্মাই সব হ'তে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। যে শিল্পীর কলা, তাঁর আত্মার সাথে একীভূত হয়েছে তাঁর শিল্পকলা অলৌকিক আনন্দ প্রদান করতে সক্ষম হয়। যে গায়কের গান তাঁর নিজের আত্মার সাথে যতটা সম্বন্ধযুক্ত তাঁর গান ততোই প্রভাবশালী হয়ে থাকে। প্রায়শঃ দেখা যায় যে, যে শিল্পী নিজের সঙ্গীতে নিজের আত্মাকে আনন্দ দান করতে পারেন, সেই সঙ্গীত শ্রোতাদের মনেও প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। এ বিষয়ে একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার কথা বলছি। কলকাতায় 'লালচাঁদ' উৎসবের কথা অনেকেই জানেন। কলকাতার সঙ্গীতাসরের প্রথম বড় সঙ্গীতের আসর। এই আসর বিখ্যাত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সঙ্গীত শিল্পী স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়ালের স্মৃতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হত এবং সারা ভারতের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ বিনা পারিশ্রমিকে তাঁদের সঙ্গীত পরিবেশন দ্বারা স্বর্গীয় শিল্পীর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। আজকের যাঁরা প্রথম শ্রেণীর শিল্পী তাঁদের অনেকেই এই 'লালচাঁদ উৎসবে' প্রথম পরিচিতি লাভ করেছিল। এই অনুষ্ঠানে অর্থের কোনপ্রকার লেনদেন না থাকায় শিল্পীদের মনে এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে এক আত্মিক যোগ ঘটেছিল এবং তাই তাঁরা পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে সঙ্গীতের মাধ্যমে স্বর্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। এ রকম একটি সঙ্গীত আসরে 'মুস্তরী বাঈ' নামে এক গায়িকা তাঁর গান এমনই আন্তরিকতার সঙ্গে পরিবেশন করেন যে, উপস্থিত বিখ্যাত শিল্পীগণ ও শ্রোতাগণ অভিভূত হয়ে পড়েন এবং সেদিন আর কোনো শিল্পীর পক্ষেই সঙ্গীত পরিবেশন সম্ভব হয় নি। সেদিনকার মুস্তরীবাঈএর গানে বোধ হয় তাঁর আত্মার যোগ ঘটেছিল, তাই সে সঙ্গীত এতো প্রভাব বিস্তার করেছিল। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায় ছিলেন এবং রেডিওর মাধ্যমে সে সঙ্গীত শুনে এতোই প্রভাবিত হন যে, সঙ্গীতানুষ্ঠানের সমাপ্তির পরই অনুষ্ঠান কর্তা রাইবাবুকে মুস্তরীবাঈএর গান আবার সোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সার্থক সঙ্গীতের প্রভাব যে কতদূর বিস্তৃত হতে পারে তা 'মিঞা তানসেনের' জীবনী হ'তে আরো বুঝতে পারা যায়। যাঁরা কলকাতায় ১০ বৎসর পূর্বের সঙ্গীতের আসরে যোগদান করেছেন, বর্তমানেও সার্থক সঙ্গীতের প্রভাব সম্বন্ধে তারা কিছুটা অনুমান করতে পারবেন।

কিন্তু যে শিল্পী, লোক-রঞ্জন করার জন্য সঙ্গীতের পরিবেশন করে থাকেন, সে 'সঙ্গীত' মর্মজ্ঞ শ্রোতার নিকট আদৃত হয় না। সাধনার দ্বারা শিল্পী যখন চরম উৎকর্ষ লাভ করে, তখনই শিল্পী নিজের আত্মার আনন্দবর্দ্ধনে সক্ষম হন এবং শিল্পীর লক্ষ্য তাহাই হওয়া উচিত। সঙ্গীত,—গান, বাজনা ও নৃত্য এই তিনের মিলনেই হয়। কিন্তু সাধারণ ভাষায় গান, বাজনা ও নৃত্যের এই তিনের যে কোনো একটির অবলম্বনেই সঙ্গীত শব্দের অবতারণা করা যায়। তাই 'সঙ্গীত' শব্দের গানের অংশের তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

সঙ্গীতে যোগ্য স্বর, তাল, লয় ও কাব্যকে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত করেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাস্তবিক রস উৎপন্ন করা যেতে পারে। বসন্ত ঋতুর রাগ—বসন্ত, হিণ্ডোল, বাহার প্রভৃতি। শীতের পর যখন বসন্ত ঋতুর আগমন বার্তা সুচিত হয় তখন উপরিউক্ত বিশেষ ঋতু-রাগগুলি গীত হয়। বসন্ত কালের রাগের গীতিকবিতাগুলিও বসন্ত ঋতুর রূপ বর্ণনাযুক্ত হয়ে গীতি কবিতাগুলি রাগের রূপ ও রসের সাথে আরো বৈষিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন ভারতীয় সঙ্গীতের প্রধান ধারা—'ধ্রুপদ'। বসন্ত রাগের একটি ধ্রুপদগানের গীতিকবিতায়—"ঋতু বসন্ত আয়ি সব বন ফুলে, নয়ে নয়ে ভার পাতা কলিয়ন, বন উপবন কি······" প্রভৃতি বসন্তের বর্ণনা যুক্ত হয়ে বসন্ত রাগের ধ্রুপদ গানটি আরো সরস হয়েছে। খেয়াল গায়কীর বসন্ত রাগের একটি বিখ্যাত খেয়াল গানের গীতিকবিতা "ফাগুয়া বৃজ দেখনকো চলোরি, ফাগবেমে মিলুঙ্গী কুঁবর কানহাইয়া······" প্রভৃতি বসন্ত ঋতুর একটি প্রধান উৎসব মুখর কাহিনীর কথা বর্ণিত হয়ে গানটির সাথে রাগের রূপ ও রসের মিলনে যেন এক অপূর্ব রূপ সৃষ্টি করেছে। যদুভট্ট রচিত—বাহার রাগের গান "আজু বহত বসন্ত পবন সুমন্দ······" বসন্ত ঋতুর গানটির অনুকরণে বাহার রাগে হুবহু রূপ বর্তমান রেখে বাংলায় বসন্ত ঋতুর জন্য গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন—"আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ······"। তিনিও গান রচনা করার সময় রাগের রূপ ও রসের কথা বিস্মৃত হন নি।

পরবর্তি ঋতু গ্রীষ্ম। এই ঋতুও ভারতীয় সঙ্গীতের রসের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং গ্রীষ্মকালেও বিশেষ বিশেষ রাগ গীত হয়। কিন্তু তার পরবর্তি ঋতু বর্ষা এবং এই ঋতুর প্রকোপ যেমন আমাদের সমাজজীবনের সাথে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত, তেমনি ভারতীয় সঙ্গীতের রাগ-রসের ক্ষেত্রেও এক মহত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই বর্ষা ঋতুর আগমনে ভারতীয় সঙ্গীতে 'মল্লার' ও নানা প্রকার মল্লারের অবতারণা করা হয়। কথিত আছে, যে মল্লার রাগের সাথে বর্ষা ঋতুর বিশেষ নিকট সম্বন্ধ আছে। বর্ষার বর্ণনাও এই সব বর্ষা ঋতুর রাগের গানেও বহু পরিমাণে পাওয়া যায়। যেমন—মিঞা তানসেন রচিত মিঞা মল্লার রাগের বিখ্যাত একটি ধ্রুপদ গান "আয়ি হৈ ঘটা উমড় উমড় ঘুমড় ঘুমড় ঘোর······" প্রভৃতি। বর্ষার আগমন বার্তার রূপ এই গানটির মধ্যে বর্ণিত। মিঞা মল্লার রাগের রসের সঙ্গে এই গীতি কবিতার রসের মিলন যে সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ হয়েছে সে বিষয়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। বহুপ্রকারের 'মল্লার' রাগ পাওয়া যায়। যেমন—মেঘমল্লার, গৌড়মল্লার, সুরদাসী মল্লার, রামদাসী মল্লার, চর্যু কীমল্লার, ধুরিয়া মল্লার প্রভৃতি। খেয়াল গায়কীর গৌড় মল্লারের একটি বিখ্যাত গানের গীতিকবিতার নমুনা বলা হচ্ছে।"ঝুক আয়ী বাদরিয়াঁ সাবনাকি……"। এই গানটির মধ্যেও বর্ষা রাগের রসের সঙ্গে গীতিকবিতার মিলন ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ, তাঁর বর্ষার গানে সুরারোপ করার সময় বর্ষার রাগের কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্মরণ করেছেন। যেমন—"মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে……", "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার……" প্রভৃতি। এক্ষেত্রে রাগের রূপগুলি যথাযথ কিনা কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর মিলবে, "রবীন্দ্রনাথের গানে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রভাব" নামক আলোচনায়। এখানে রাগের রূপ, সাধারণ ভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কাজী নজরুল প্রভৃতি বিখ্যাত কবি তথা সঙ্গীত রচয়িতারাও তাঁদের বর্ষার গানে বর্ষার রাগের রস ও ভাবযুক্ত সুরের কথা বিস্মৃত হননি। উপরিউক্ত গানগুলির রাগের রস ও গীতিকবিতার রস উভয়ই সমান প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। এ গুলির মধ্যে যে কোন একটির গৌণভাব পূর্ণ রসোৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এ ছাড়া গানের রসোৎপাদনের জন্য আরো একটি বস্তুর বিশেষ আবশ্যক আছে, সেটা হল 'সুকণ্ঠ'।

কণ্ঠস্বর তিন প্রকারের হয়। প্রথম সুরেলা কণ্ঠস্বর, দ্বিতীয় রসযুক্ত কণ্ঠস্বর এবং সেষোক্ত বেসুরো কণ্ঠস্বর। বেসুরো কণ্ঠস্বর সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সর্বদা পরিত্যাজ্য, তাই এই কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে অধিক আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। সুরেলা কণ্ঠস্বর রসোৎপাদনে অধিক সহায়ক হয়ে থাকে। যে কণ্ঠস্বর রসযুক্ত হয়, তা অবশ্য সুরেলা হয়। কারণ বেসুরো কণ্ঠস্বর বা আওয়াজ কখনও রসপূর্ণ হয় না। আবার কোন কোন কণ্ঠস্বর যা হয়তো সুরেলা, কিন্তু সেই কণ্ঠস্বরের রস উৎপাদনের ক্ষমতা নাও থাকতে পারে। তাই কণ্ঠসঙ্গীতে সত্যকার রস-উৎপাদন করতে হ'লে সুরেলা এবং রসপূর্ণ কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন হয়।

আধুনিক কালে খেয়াল গানের প্রচার অধিক মাত্রায় ঘটছে, তাই এখানে খেয়াল গানের বিভিন্ন অঙ্গের দিকে দৃষ্টি রেখে সঙ্গীতের রসোৎপাদন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সম্বন্ধে আলোচনা করব।

খেয়াল গানের শৈলীর মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি ভাগ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ আলাপ, দ্বিতীয়তঃ বোলতান, ও শেষে তানযুক্ত হয়ে গানের গায়কী সম্পূর্ণ হয়। খেয়াল গানের এ সব ভাগের মধ্যে আলাপ অংশেই রসোৎপাদনে অধিকমাত্রায় মহত্ত্ব থাকে। তাই গুণীজন শিল্পী খেয়াল গানের আলাপ অংশের দিকেই বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। যদিও নবরস উৎপাদনের শক্তি গানের অন্যান্য ভাগেও থাকে, কিন্তু প্রকৃত মনোরঞ্জনকারী রস উৎপাদন আলাপ গানের অংশেই অধিক মাত্রায় বর্তমান থাকে। পদ্ধতি-সহকারে, শান্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ আলাপ শ্রোতার মনকে একাগ্রতার দিকেই আকর্ষিত করে। শিল্পীও আলাপ করার সময় তার মনের বিস্তার পার্থিব বস্তু হ'তে সঙ্কুচিত করে স্বরের ধ্যানে কেন্দ্রীভূত হয়ে আত্মভোলার মত হয়ে যান। গমক, মীড়, খট্‌কা ও মূর্কী প্রভৃতির উপযুক্ত প্রয়োগে আলাপের সৌন্দর্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু গমক, মীড়, প্রভৃতি একইভাবে সব রাগে প্রযুক্ত হয় না। কারণ এক একটি রাগের প্রকৃতি ও ভাব ভিন্ন প্রকারের দেখা যায়। কোনো রাগালাপে মীড় হয়তো অধিক উপযোগী হয়, আবার কোনো কোনোটির রাগালাপে মূর্কীর প্রয়োগ অধিক রসোৎপাদনে সক্ষম। এই ভাবে যে রাগের রাগালাপে যার উপযোগ অধিক প্রশস্ত, সেই ভাবের রাগালাপে বাস্তবিক 'রস' উৎপাদন ও সেটির প্রয়োগ অধিক সহায়ক হয়ে থাকে। যেমন দরবাড়ী কানাড়া রাগের প্রকৃতি গাম্ভীর্যপূর্ণ। এই রাগের রাগালাপে 'মীড়ের' প্রাধান্য অতিশয় উপযুক্ত হয়, কারণ মীড়ের দ্বারা এক স্বরের সঙ্গে অন্য স্বরের সম্বন্ধ অবিকৃত থাকে। অর্থাৎ এক সুর হ'তে অন্য স্বরে গমন করার সময় স্বরের অভ্যন্তরে যে বিচ্ছেদ ঘটে তা মীড়ের সাহায্যে মিলিত হয় এবং এর দ্বারা স্বরের মধ্যে যে মিলন ঘটিত হয়, তাতে স্বরের আবেশের মধ্যে বেশ একটা স্নিগ্ধশান্তভাব প্রকাশ পায়। এই রাগের রাগালাপেও বেশ একটা ধীর স্থির ভাবে গান গাওয়ার আবশ্যকতা থাকে। কিন্তু তার পরিবর্তে দরবাড়ীকানাড়া রাগের রাগালাপে যদি চাঞ্চল্যের ভাব এসে পড়ে তবে রাগ, নিজস্ব রূপ, রস, ভাব ও সৌন্দর্য হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এই রাগের রাগালাপে 'গমক' অঙ্গেরও ব্যবহার হ'য়ে থাকে। কারণ এই রাগের প্রকৃতিতে, শান্ত, গম্ভীর এবং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই সাথে কিছু বীর রসেরও সমন্বয় ঘটেছে। চপলতার সাথে রাগালাপ করা এর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। এজন্য এই রাগ অত্যন্ত প্রচলিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়মানুসারে গাওয়া হয় না। তবে যথার্থ দক্ষ্যশিল্পী যথার্থভাবে গাওয়ার ঢঙ্গে এই রাগের রসোৎপাদন করে থাকেন। ভৈরব রাগ ভক্তি, শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির রাগ। কিন্তু ভৈরব রাগের রাগালাপে দরবাড়ী কানাড়া অপেক্ষা কম মীড়ের ব্যবহার দেখা যায় এবং গমকের ক্ষেত্রেও, দরবাড়ী কানাড়া হতে ভৈরব রাগে অধিক মাত্রায় 'গমক' ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়, কারণ ভৈরবে ভক্তিরসের সাথে কিছু রুদ্র রসেরও আভাষ পাওয়া যায়। গমক, অর্থাৎ ভৈরব রাগের কোমল ঋষভ ও কোমল ধৈবতের মধ্যে নিহিত যে আন্দোলন বর্ত্তমান থাকে। এই গমক তান সাধারণ গমক হ'তে পৃথক। আবার খাম্বাজ রাগের রাগালাপে ছোট ছোট মুর্কীযুক্ত আলাপের প্রয়োগ রাগরূপ পরিগ্রহ করতে অত্যন্ত সহায়ক হয়ে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে গমক তানের প্রয়োগ ভাব সম্প্রসারণে সহায়ক নয়। বরং মীড়ের ব্যবহারই হিতকর হয়। এইভাবে যে রাগের রাগালাপে যে অঙ্গগুলির যেটুকু প্রয়োগ রসসঞ্চারে অধিক সহায়ক হয়, সেই সেই রাগের রাগালাপে সেই অঙ্গগুলির সেইরূপ অনুপাত ব্যবহার হওয়া উচিৎ। কিন্তু এই সামঞ্জস্য জ্ঞান অর্জন একমাত্র উপযুক্ত গুরু বা শিক্ষকের সান্নিধ্যেই সম্ভব। বর্ত্তমানে সঙ্গীত-শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে পুস্তকের সাহায্যেই সঙ্গীত শিক্ষা করছেন এবং শিক্ষা কেন্দ্রেও শিক্ষাগুরু যিনি শিক্ষা দিচ্ছেন, তিনিও পুস্তকের সাহায্য ব্যতিরেকে সঙ্গীত শিক্ষা দেন না। ফলে সঙ্গীত শিক্ষার সূক্ষ্ম দিকগুলি অবহেলিত হচ্ছে এবং ফলস্বরূপ সঙ্গীতের মানও নিম্ন পর্যায়ে নেমে যাচ্ছে। কারণ স্বর সপ্তকের অন্তর্গত স্বরের যে সূক্ষ্মাংশগুলি থাকে এবং যে শ্রুতিগুলির প্রভাবে ও স্বরবিন্যাসে সমপ্রকৃতির স্বরবিশিষ্ট রাগের রূপ রস ও সৌন্দর্য পৃথক হয়ে যায়, স্বরের সেই সূক্ষ্মাংশ বা শ্রুতিগুলি যাকে ইংরাজী ভাষায় স্বরের 'Just intonation' উপযুক্ত স্বস্থান বলা হয়, তা পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষা করা যায় না। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের রাগের রূপ, রস ও সৌন্দর্য, প্রকৃত রূপে এখানেই বর্তমান।

দরবাড়ী কানাড়া রাগে যে স্বরগুলি ব্যবহারের নির্দেশ আছে এবং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দরবাড়ী কানাড়া রাগের রূপ, রস ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে হ'লে, প্রকৃত দরবাড়ী কানাড়া রাগের নির্দিষ্ট স্বরস্থানের জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। পুস্তকে দরবাড়ী কানাড়া রাগের স্বরের ব্যবহারের বিবরণে পাওয়া যায় গান্ধার, ধৈবৎ ও নিষাদ স্বরগুলি কোমল রূপ প্রাপ্ত এবং বাকী স্বরগুলি শুদ্ধ। হয়তো আরো বলা আছে যে, কোমল গান্ধার ও কোমল ধৈবৎ যথাক্রমে মধ্যম ও কোমল নিষাদের সাথে আন্দোলিত হবে। কিন্তু শুধু এটুকু উদাহরণ দ্বারা প্রকৃত রূপ, রস ও সৌন্দর্য নির্ণয়, আদৌ সহজসাধ্য নয়। কারণ একই স্বররূপ-যুক্ত এমন রাগ পাওয়া যায়, যার প্রয়োগ পার্থক্যে ভিন্ন ভিন্ন রাগ সৃষ্টি হয়। যেমন—পুরিয়া, মারবা ও সোহিনী। কিন্তু প্রকৃত শিল্পী তথা গুরুর নিকট যিনি শিক্ষালাভ করেছেন তিনি এরূপ বিশিষ্ট রাগের যথার্থ স্বররূপ ও প্রকৃত রস ও ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম হন। পুস্তক কেবল মাত্র নিছক সাহায্য ছাড়া কিছুই নয়। প্রকৃত সঙ্গীতের পথ একমাত্র অভিজ্ঞ শিক্ষাগুরুর নিকট হতেই পাওয়া যেতে পারে। গানের মধ্যে আলাপ অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই অংশ হতেই রাগের রূপ ও রস, গায়কের ভাব, ব্যবহৃত স্বরের তথ্য প্রভৃতি যথাযথ ব্যবহারে গানের সম্পূর্ণ রূপ রসোত্তীর্ণ হয়ে জমে ওঠে। যে শিল্পী প্রকৃত রাগালাপ করতে অক্ষম, তিনি রাগের প্রকৃত রসোৎপাদন করতে সক্ষম নন। গানের দ্বিতীয় ভাগ হল 'বোলতানের' বোলতান করার সময় গানের বোল অর্থাৎ বাণী বিভিন্ন স্বর বিন্যাসের সাথে সমন্বিত হয়ে বিভিন্ন ছন্দোযুক্ত হয়। বোলতান শব্দটি হ'তে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এই বিভাগে তানেরও কিছু প্রয়োগ থাকে। কোন কোন শিল্পী বোলতানের বিস্তার করার সময় এমন কিছু নিরসতা উৎপন্ন করেন যার ফলে সঙ্গীতের গানের মধ্যে যে মনোরঞ্জকতা থাকা দরকার তা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়। বোলতানের মধ্যে অবশ্যই ছন্দের বৈচিত্র্য থাকবে। কিন্তু সেই ছন্দবৈচিত্র্যের নামে, বোলতানের স্বর ও ছন্দের সাথে যদি কুস্তী বা লড়াই ভাবের অবতারণা হয়ে যায়, তবে সে আর রসপূর্ণ-সঙ্গীত থাকবে না। আলাপের সমাপ্তি হয়ে গেছে, বোলতানের কাজ করতে হবে। এবং এবার একেবারে ঝড়ের বেগে বোলতানের লড়াই, এরূপ মনোভাব সঙ্গীত পরিবেশনের রসোৎপাদনে আদৌ সহায়ক হবে না। এ জন্য বোলতানের প্রস্তার এমন শৈলীযুক্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হওয়া দরকার যে, স্বর ও লয়ের সাথে তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত হবে। যেমন গণিতশাস্ত্র নীরস হওয়া সত্ত্বেও গণিতশাস্ত্রে দক্ষতাপূর্ণ কাজের দ্বারা রস সৃষ্টি করা যায়। তেমনি দক্ষ শিল্পীও অভিজ্ঞতার সাহায্যে বোলতানে রসসৃষ্টি করতে পারেন বৈশিষ্ট্য সহকারে।

বোলতানের ভাগ ও বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ কারণ, রাগালাপ গানে গীতের বাণীগুলিকে গ্রহণ করা হয় না। কিন্তু বোলতান রচনা করার সময় গীতের বাণীর সাথে স্বরের বিন্যাস দ্বারা বোলতান রচিত হয় এবং গীতের বাণীর ভাবের সাথে সমন্বয় সাধন করেই বোলতানের অবতারণা হয়ে থাকে। বোলতানের সাথে রাগালাপ ও তান দুই মিশ্রিত হয়। এ জন্য মনের ভাব ও বুদ্ধি দুটির পরিচয়ই বোলতানের মধ্যে পাওয়া যায়। উপযুক্ত বোলতানের প্রয়োগে গানের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। গুরুদেবের রচিত গানে স্বরের সাথে বাণী, বিশেষ ছন্দযুক্ত হয়ে গীত হয় এবং এই গানে বোলতান কবিতার মূল শব্দগুলির সাথে নূতন ব্যাঞ্জনাযুক্ত নূতন শব্দের যোগ দেখা যায়। এই বোলতানগুলি গানের সাথে উপযুক্ত হওয়ায় ইহার সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পায়। কিন্তু হিন্দী গানের বোলতানে আমরা নতুন শব্দের বা কথার সংযোজন পাই না। তবে মূলগানের বাণীগুলি নূতন স্বরের তানে, ছন্দে, বৈচিত্র্যময় হতে দেখা যায়। এখানে কীর্তন গানের আখোরের বাণীর কথা স্মরণ করলে বোলতানের নমুনা আরো পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা যায়। আলাপে শ্রোতা রসের আনন্দে ভরপুর হয় এবং বোলতানে শ্রোতা ভাবে বিভোর হয়ে যায়। এই অংশের গায়কীতে গমক, মীড়, মূর্কী প্রভৃতির উপযুক্ত প্রয়োগ করা যেতে পারে। শিল্পীকে সদা জাগ্রত থাকতে হবে যে, এইসব প্রয়োগ কোনো কোনো রাগে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ও রসসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন কোন কোন শিল্পী নীরস বোলতান গানের গায়কীতে ব্যবহার করে তার ছন্দ বৈচিত্র্যের ও স্বরের কসরতের অধিকার ও ক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য আগ্রহান্বিত হন এবং তাতে গৌরব বোধ করেন। গায়কের পরিচয় ও স্বভাব তাঁর গানের শৈলী ও প্রকৃতি হ'তে অনায়াসেই পাওয়া যায়। যে শিল্পী গান করার সময় স্বর ও তাল প্রভৃতির সাথে কুস্তী লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকেন, সঙ্গীত সম্বন্ধীয় প্রকৃত রস হতে তিনি বিচ্যুত হন। শিল্পকলার সৌন্দর্য মধুর কলা প্রদর্শনের মাধ্যমে ও মধুর স্বভাব দ্বারাই প্রকাশিত হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সঙ্গীতে রাগালাপের সাথে তান ভাগকে উপযুক্তভাবে যুক্ত করার জন্যই বোলতানের অবতারণা করা হয়ে থাকে। রাগালাপ গান প্রথমে বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হয় এবং তান পরবর্তি অংশে বেশ দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়। বিলম্বিত গতি হ'তে হটাৎ দ্রুত গতিযুক্ত গানের অংশে চলে গেলে রসহানি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। তাই মধ্যগতির বোলতান উভয়ের মধ্যস্থানে সংযুক্ত হবার পরই দ্রুতগতিযুক্ত তান পর্যায়ের গায়কী রসহানির কারণ ঘটায় না। আর যে সঙ্গীতের ধারাতে বোলতান করার রীতি নাই, সেখানে রাগালাপের গতি বিলম্বিত হ'তে কিছুটা বৰ্দ্ধিত করে এবং দ্রুততানের গতি কিছুটা কমিয়ে রাগালাপের সাথে সঙ্গতি রেখে পরবর্তি অংশে দ্রুততান করার রীতি রসসৃষ্টির বাধা হয় না।

গানের তৃতীয় ভাগ হল তান। এই অংশটি শিল্পীর বিচার-বুদ্ধির পরিচায়ক। বিবিধ প্রকারের তানের রচনা ও নিত্যনূতন স্বরবিন্যাসের দ্বারা রাগরূপ, রস ও সৌন্দর্যকে অবিকৃত রেখে গান করা অত্যন্ত দক্ষতার পরিচায়ক। গমক তানের দ্বারা ভয়ানক ও রুদ্র রসের, মধুর কণ্ঠস্বর দ্বারা তানে মনে শৃঙ্গার ও করুণ রস এবং সাধারণ কণ্ঠস্বর দ্বারা তানে শান্ত রসের সৃষ্টি হয়। কিন্তু রাগের রসের আনন্দ উৎপন্ন করতে হ'লে আলাপ ও বোলতানের সাহায্যে যতটা সাফল্য লাভ করা যায়, তানের দ্বারা তা হয় না। তানের মধ্যে বৈচিত্র্য ও চটকদারী ভাব ফুটে ওঠে। আবার তান সব রাগের রূপ যথোচিতভাবে বজায় রাখতে পারে না। রাগের রস অনুসারে কোনো কোনো রাগে আলাপ, রসসৃষ্টিতে অধিক সহায়ক। আবার কোনো রাগে 'তান' সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক। আবার তোড়ি, ইমন, মালকোষ প্রভৃতি রাগে আলাপ এবং তান উভয়ই সমানভাবে প্রযোজ্য হয়। দরবারীকানাড়া রাগে তান অপেক্ষা রাগালাপের আধিক্য বেশী দেখা-যায়। বিভিন্ন প্রকারের বৈচিত্র্যপূর্ণ তান শ্রোতার মনে আশ্চর্যের ভাব আনে।

এ পর্যন্ত গান গাওয়ার অঙ্গের উপরই আলোচনা ও বিচার করা হ'লো। এখন গীতের বাণী ও রাগের রস সম্বন্ধে কিছু বিচার ও আলোচনার প্রয়োজন। গীতের বাণীর রস ও ভাব রাগের ভাব ও রসের সাথে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। শৃঙ্গার রসের কবিতায় শৃঙ্গার রসযুক্ত রাগের সংযোগ ঘটলে পূর্ণ রসসৃষ্টির পক্ষে যেন মানিকজোড়ের মিলন বোধ হয়। যেমন—ঠুংরী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গানের বাণী সাধারণতঃ শৃঙ্গার বা বিরহ রসাত্মক হয় এবং সেই গানের বাণীর সাথে যদি ভৈরবরাগ মিলিত করা যায় তবে তা নিশ্চয়ই উপযুক্ত হবে না এবং রসসৃষ্টির দিক হ'তে পরস্পর বিরোধী হবে। কিন্তু এই ঠুংরী গানের বাণীর সাথে যদি চপল প্রকৃতির খাম্বাজ, পিলু, কাফী প্রভৃতি রাগের সমন্বয় করা হয় তবেই পূর্ণ রসসৃষ্টির সহায়ক হবে।

বর্তমান সময়ের অধিকতর গীত রচনা শৃঙ্গার রসের অন্তর্গত এবং অন্যান্য সর্বপ্রকার রসের রাগেই গীত হ'তে দেখা যায়। কিন্তু আমরা যদি এ বিষয়ে একটু চিন্তা করে দেখি, তবে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে সকল প্রকার রাগে একই রসের বা ভাবের গীতি কবিতা গাওয়া উপযুক্ত নয়। যেমন 'শংকড়া' বীর রসের রাগ। এই রাগে শৃঙ্গার রসের গীতি-কবিতা গাওয়া আদৌ উচিত হবে না এবং গাইলেও শ্রুতিমধুর বা মনোরঞ্জনের দিক থেকে হয়তো তা ফলপ্রসূ হবে না। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কোন কোন রাগ, কোন রসের অন্তর্গত হতে পারে। ভারতীয় সঙ্গীতের পুরাতন গানগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে এ বিষয়ে একটা সহজ সমাধান পাওয়া যাবে। যেমন ধ্রুপদ গানগুলি রাগ-রসের অনুকূলেই রচিত। শংকড়া রাগের যে বিখ্যাত ধ্রুপদ গান পাওয়া যায়, তার বাণী "য়া জগ ঝুট জানরি মন সাঁচ শিব শক্তি কর বাখান······"। এই রচনা হতে শংকড়া যে শৃঙ্গার বিরহ বা করুণ রসের অন্তর্গত নয় তা শিল্পী মাত্রেই স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথও এই রাগে যে গীত রচনা করেছেন তাও এরূপ "আমারে কর জীবন দান, প্রেরণ কর অন্তরে তব আহ্বান······।" পুরাতন একটি বিখ্যাত খেয়াল গান পাওয়া যায়, সে গানটিও এরূপ—"শংকর ভং ডারি ভোলে, মস্তক পর চন্দ্র শোভে······"।

রাগে ব্যবহৃত স্বরগুলির নিয়মে রাগ গীত হওয়ার সময়ের নির্দেশ আছে। দিন ও রাত্রির মধ্যে আটটি প্রহর আছে। সন্ধিপ্রকাশ সময় দিন ও রাত্রির মধ্যে দুবার হয়। যেমন প্রাতঃকাল সন্ধিপ্রকাশ ও সায়ংকাল সন্ধিপ্রকাশ। এই সময় যে সমস্ত রাগ গাওয়া হয় তা অধিকতর শান্ত ও ভক্তিরসের রাগ। শান্ত ও ভক্তি রসযুক্ত রাগে ঋষভ ও ধৈবত, কোমল এবং মধ্যম শুদ্ধ প্রভৃতি স্বরগুলির রূপ দেখা যায়। যেমন, ভৈরব, বিভাষ, যোগীয়া, গুণক্রী প্রভৃতি এবং এইসব রাগগুলিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বাভাবিক ভাবেই মনে শান্ত রসের ভাব বিস্তার করে। ভৈরব প্রভৃতি রাগের গানগুলির দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে গীতি-কবিতাগুলি ও সমপ্রকৃতির রসযুক্ত কবিতা। যেমন—ভৈরব রাগের একটি বিখ্যাত ধ্রুপদ—"তুম হো গণপত দেব, বুধদাতা শীষ ধরে গজশুণ্ড…"। একটি বিখ্যাত খেয়াল গান "জাগো মোহন প্যারে……" প্রভৃতি ভৈরব রাগের অধিকাংশ পুরাতন গানের রচনার মধ্যে এরূপ শান্ত ও ভক্তি রসের গীতি-কবিতার সমাবেশ পাওয়া যায়। পরবর্তি যুগে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথও তাঁর শান্ত ও ভক্তি রসের গীতি-কবিতায় এরূপ রাগের স্বর সংযুক্ত করেছেন। যেমন—"কেন বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে……"। মন জাগো মঙ্গললোকে……" প্রভৃতি। কিন্তু ঠিক এই সময়ে গীত হবার পূর্ব সময়ের কয়েকটি রাগ ঋষভ, ধৈবৎ কোমল ও শুদ্ধ মধ্যমের ব্যবহারের সাথে তীব্রমধ্যমও ব্যবহৃত হয় এবং তীব্রমধ্যম ব্যবহারের জন্যই নিম্নোক্ত কয়েকটি রাগ উপরিউক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত হয় না। যেমন—রামকেলী, ললিত, পরজ, ও বসন্ত প্রভৃতি। এই রাগগুলিতে যদিও ঋষভ, ধৈবত কোমল এবং শুদ্ধ মধ্যম আছে তবু তীব্র মধ্যমের ব্যবহারে এই রাগগুলির রস সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। 'ললিত' শান্ত প্রকৃতির রাগ। কিন্তু যখনই তীব্রমধ্যমের সংমিশ্রণ হয়, তখনই শৃঙ্গার রস, প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। রামকেলী, ভৈরব রাগের সমপ্রকৃতির স্বরবিশিষ্ট রাগ। কিন্তু এই রাগেও তীব্রমাধ্যমের ব্যবহারে শৃঙ্গার রসের উৎপত্তি হয়। তাই এই সব রাগে যে সব গান পাওয়া যায় তা সাধারণতঃ শৃঙ্গার রসের গীতি-কবিতা। যেমন ললিত রাগের বিখ্যাত গান—"রৈনকা স্বপ্না", রামকেলীর প্রসিদ্ধ গান "সগরী রৈনকে জাগে পাগে…", এবং এই রচনাগুলি রাগ রসানুকুল। ভৈরব রাগের "জাগো মোহন প্যারে…" গানটি রামকেলী রাগে আদৌ ভাল লাগবে না। আবার "সগরী রৈণকে জাগে পাগে……" গানটি ভৈরব রাগে সমীচিন হবে না। রামকেলী রাগের আরো যেসব প্রসিদ্ধ গান আছে যেমন—"ভোরকী চিড়িয়াঁ বোলাই কগবা……", "ভোরভয়ী টাঁট লাঙ্গরঙ্গ মৈকা জানে ন দেত……"। এই গানগুলির মধ্যেও শৃঙ্গারের আভাব স্পষ্টই দেখা যায়।

এর পরবর্তী রাগগুলি বিলাবল এবং বিলাবল অঙ্গের এবং তারপর তোড়ী বা এই অঙ্গের। এই রাগগুলি অধিকাংশই শান্ত এবং করুণ রস প্রকৃতির। এ ছাড়া পরবর্তী যেসব রাগ পাওয়া যায় তা হল 'সারং'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রভৃতি প্রকৃতির এবং এগুলির মধ্যে শান্ত, শৃঙ্গার ও ভক্তি এই তিন রসের মিশ্রণ পাওয়া যায়। তারপর ভীমপলশ্রী, ধানী, ধানেশ্রী প্রভৃতি আরো অনেক রাগ। সায়ংকালে গেয় সন্ধিপ্রকাশ রাগগুলি এরপর আসে। এই রাগগুলিতে শান্ত, করুণ ও ভক্তি প্রভৃতি রস বর্ত্তমান। উপরিউক্ত রসের এই রাগগুলি—শ্রী, মারবা, পূরবী প্রভৃতি। তীব্রমধ্যম, শৃঙ্গার রসোৎপাদক স্বর হলেও কোমল ঋষভ ও ধৈবত শুদ্ধ এবং গান্ধারের প্রভাবে, তীব্র-মধ্যম থাকলেও তা দুর্বল। এবার পাওয়া যায় কল্যাণ প্রকারের রাগ। যেমন কল্যাণ (ইমন), ভূপালী, রাজকল্যাণ, দুর্গাকল্যাণ, শুদ্ধকল্যাণ প্রভৃতি অন্তর্গত। তারপর কেদার, কামোদ, ছায়ানট, প্রভৃতি শৃঙ্গার রসের রাগ পাওয়া যায়; শুদ্ধমধ্যমের সাথে তীব্রমধ্যম, যে সমস্ত রাগে পাওয়া যায়, সে সব রাগগুলিতে শৃঙ্গার রসের আভাষ পাওয়া যায়। কেদার গম্ভীর প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও তীব্রমধ্যমের ব্যবহারে শৃঙ্গার রসের উৎপত্তি হয়। এই ক্রমানুসারে খাম্বাজ জয়জয়ন্তী ও দেশ প্রভৃতি তীব্রমধ্যম বর্জ্জিত রাগগুলিও শৃঙ্গার রসের রাগের অন্তর্গত। জয়জয়ন্তীকে ভারতীয় সঙ্গীতে "পরমেল প্রবেশক" রাগ বলা হয়। কারণ এই রাগটি একটি মেলের অন্তর্গত হ'তে শুরু হয়ে পরবর্তি মেলে প্রবেশ করে সমাপ্ত হয়। তারপর মালকোষ, দরবাড়ি কানাড়া, আড়ানা প্রভৃতি প্রকারের রাগ পাওয়া যায় এবং যেগুলির চলন মধ্য এবং তার সপ্তকে সেগুলি বীর রসাত্মক। মধ্য ও মন্দ্র সপ্তকে যেগুলির অধিক চলন পাওয়া যায় সেগুলি শান্ত রসাত্মক এবং যেগুলি তিন সপ্তকের মধ্যেই সমানভাবে বিস্তৃত হয় সেগুলিতে শান্ত ও শৃঙ্গার রসের প্রভাব পাওয়া যায়। এইভাবে দিন রাত্রিতে গেয় ভারতীয় রাগগুলি বিভিন্ন রসের অন্তর্গত দেখা যায়। সত্যিকারের মর্ম্মজ্ঞ শ্রোতাই সঙ্গীতের এইসব রসের অনুভব উপলব্ধি করতে পারেন। কিছুদিন পূর্বের রচিত অধিকাংশ খেয়াল গানই শৃঙ্গার রসের রচনা। কিন্তু এইরূপ এক রসের অন্তর্গত অধিকাংশ রচনা হওয়া উচিত নয়। তাই রচনাকারদের উচিত, গান রচনা করার সময় রাগের ভাব ও রসের দিকে দৃষ্টি রেখে গীতগুলি, তদনুসারে রচিত করা এবং কোন ক্রমেই গীতি-কবিতাগুলির রস ও রাগের রস পরস্পর-বিরোধী না হয়।

ভারতীয় সঙ্গীতে রাগগুলির রস ও ভাব যেমন পুরনো রচনাগুলির মধ্যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একটা সাদৃশ্য বজায় আছে, পরবর্তী যুগে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতায়ও রাগের রূপ, রস, ভাবের ও সৌন্দর্যের এবং নির্দিষ্ট সময়ে গীত হবার প্রথা প্রভৃতি সাধারণভাবে বজায় আছে। যে কবিতায় তিনি প্রভাতের কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানে তিনি প্রভাতী রাগের স্বরারোপ করেছেন। যেমন—"প্রভাতে বিমল আনন্দে.........", আবার কবিতার মধ্যে যখন সন্ধ্যার বর্ণনা দিচ্ছেন তখন গানে সন্ধ্যার স্বরের সংযোজন করেছেন। যেমন—"আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা......" গানটিতে পূরবী রাগের স্বর যুক্ত করেছেন। আবার দেখা যায়, তাঁর গীতি-কবিতায়, যেমন ভাব ও রস নিহিত আছে, তেমনি ভাব ও রসের স্বরও সেই গানে তিনি দিয়েছেন। যেমন—"তোমার অসীমে প্রাণমণ লয়ে......"। এই গানের স্বরটিও অনুরূপ ভাব ও রসযুক্ত রাগ 'বেহাগের' অন্তর্গত,—প্রভৃতি এরূপ অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে।

এখন তাল ও লয়ের দিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া দরকার। বিলম্বিত লয়ের গানে শান্ত ও গম্ভীর রস উৎপন্ন হয়। মধ্যলয়ে সাধারণতঃ শৃঙ্গার রস পাওয়া যায়। দ্রুত লয়ের গানে কিছুটা অদ্ভুত রসের প্রকৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু শব্দ ও স্বরের সংযোগে এসব রসের পরিবর্তন ঘটতে পারে। তবে সাধারণত উপরিউক্ত রসসৃষ্টি দেখা যায়। চৌতাল, সুরফাঁকতাল, ধামার প্রভৃতি ধ্রুপদ গানের তালে বীর শান্ত ও শৃঙ্গার রস উৎপন্ন হয়ে থাকে। ত্রিতাল, দীপচন্দ্রী, তিলবাড়া এবং যৎ প্রভৃতি তালে সাধারণভাবে শৃঙ্গার রসের গীত ও রাগ গাওয়া হয়। কাহারবা ও দাদরা তালেও শৃঙ্গার রসাত্মক রাগের রচনাগুলি গাওয়া হয়। বিলম্বিত একতাল ও ঝুমরা তালে শান্ত ও শৃঙ্গার রসাত্মক রচনা গাওয়া হয়। বাস্তবিক রস উৎপন্ন করার জন্য রাগ ও গীতের কবিতার পর, তাল লয়েরও একটা বিশেষ মহত্ত্ব আছে।

অনেক গুণীজন শিল্পী শুধু রাগের রসের উপরও বিচার ও আলোচনা করেছেন এবং ইহা অত্যন্ত বিরাট এবং চিন্তনীয় বিষয়। এই বিষয়ের উপর অবশ্য প্রাচীনকাল থেকেই বিচার বিবেচনা ও আলোচনা হয়ে আসছে। প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে প্রত্যেক স্বরের রং, রস ও স্বভাব পৃথক পৃথক ভাবে নির্দ্ধারিত করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ সঙ্গীতজ্ঞেরা ইহা অতিশয়োক্তি ভেবে দৃষ্টি দেন না। কিন্তু গভীরভাবে অনুসন্ধান ও চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে যে, সঙ্গীত শাস্ত্রের এসব বর্ণনা অলীক নয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই পুস্তকটি পিতামহ

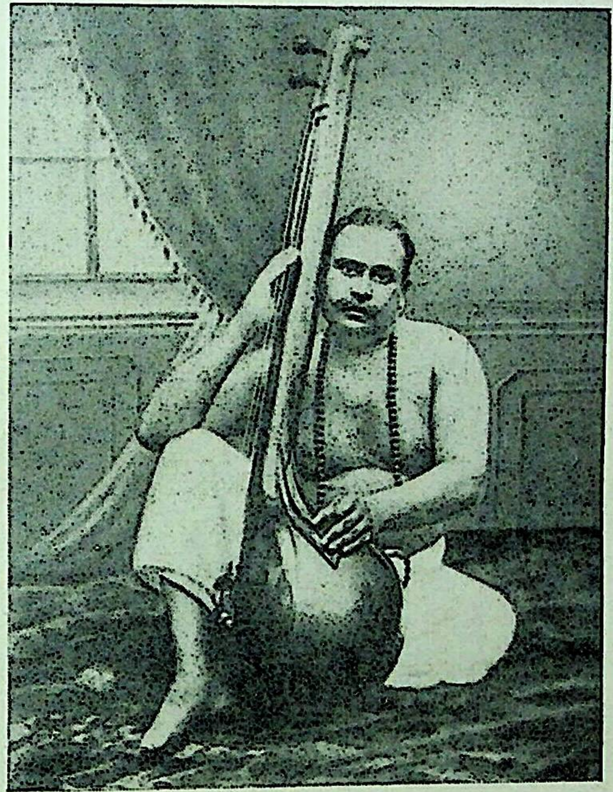

৺লালচাঁদ বড়ালের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি করা হল।

নিমাইচাঁদ বড়াল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এর মধ্যে কিছু না কিছু গূঢ় রহস্য পাওয়া যাবে, সঙ্গীত শাস্ত্রে। প্রাচীন কালের সঙ্গীতাচার্যের মতামতগুলি শ্রদ্ধাপূর্বক বিচার বিবেচনা করার মত লোক বর্তমানে খুবই কম। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়া থাকা সঙ্গীতের উপেক্ষিত শাস্ত্র ও বিষয়গুলি একত্র করে সংগ্রহ করা বর্তমানে সঙ্গীতের একটি বড় কাজ ও সমস্যা। এই কাজ কোন একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। সঙ্গীতের 'রসোৎপাদক অঙ্গ' যেগুলি আজ বিস্মৃত হবার উপক্রম হয়েছে, সেগুলির যথাযথ অনুসন্ধান ও সংগৃহীত হাওয়া দরকার। তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঙ্গীতের প্রকৃত পৃষ্ঠপোষকতা অত্যন্ত দরকার এবং সঙ্গীতজ্ঞদের এ বিষয়ে এগিয়ে আসা উচিৎ।

স্বাঃ নিমাই চাঁদ বড়াল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রথম অধ্যায়

উপপত্তিক

সঙ্গীত—মধুর ধ্বনি বা সুললিত স্বরসমষ্টি, ভাবযুক্ত সুন্দর ও সূক্ষ্ম রসপূর্ণ সুররূপ, যা শ্রবণ করা মাত্র প্রাণীমাত্রের মন ভাবাবেগে প্রসন্ন এবং রঞ্জিত হয়ে ওঠে, তাকেই 'সঙ্গীত' বলে অভিহিত করা হয়।

ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে বলা হয় :—

গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।

(সঙ্গীত রত্নাকর)

অর্থাৎ গান, বাজনা ও নৃত্য এই তিন বিভাগের সমন্বয়ে সঙ্গীতের সৃষ্টি। চিত্তাকর্ষক ললিতকলার মধ্যে সঙ্গীত এমন একটি ললিতকলা, যার মাধ্যমে সঙ্গীত-শিল্পী নিজের মনের সূক্ষ্ম ভাবনা, সুর, ছন্দ ও ভাব দ্বারা সুন্দর রূপে প্রকাশ করতে সক্ষম হন। উপরিলিখিত শ্লোক হ'তে যদিও সঙ্গীতে তিনটি কলার সমাবেশ দেখা যায়। (যেমন—গান, বাজনা ও নৃত্য) তবুও এই তিনের মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতই প্রধান, তাই কণ্ঠসঙ্গীতকেই মুখ্যতঃ সঙ্গীত বলা হয়ে থাকে।

ভারতীয় সঙ্গীত, দুটি মুখ্য ধারায় বা ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। যথা উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এবং দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটক সঙ্গীত। উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চল জুড়ে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত প্রাধান্য লাভ করেছে। এবং তামিলনাড়ু, কেরালা, অন্ধ্র ও মহিসুর প্রভৃতি সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চল জুড়ে কর্ণাটক সঙ্গীতের প্রচার দেখা যায়। কিন্তু এই দুই সঙ্গীত ধারার মূল আধার অভিন্ন। মুসলমান যুগে, আর্যাবর্তে আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশের সঙ্গীত সংস্কৃতির প্রসার যখন হয়েছিল, তখন উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত, এই আরব্য ও পারস্য দেশের সঙ্গীতের প্রভাব হ'তে মুক্ত থাকতে পারেনি। ফলস্বরূপ, আর্যাবর্তের সঙ্গীত, আরব্য ও পারস্য সঙ্গীত-সংস্কৃতির প্রভাবে বর্ত্তমান দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্নাটক সঙ্গীত হতে বহুলাংশে পৃথক হয়ে পড়ে। আর্যাবর্তের বা উত্তর-ভারতীয় ও দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণ ভারতীয় উভয় সঙ্গীত পদ্ধতির মধ্যেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মোট বারটি স্বর ও বাইশটি শ্রুতির ব্যবহার পাওয়া যায় এবং থাট-রাগ বর্গীকরণ মানা হয়েছে। কিন্তু উভয় পদ্ধতির সঙ্গীতের মধ্যে স্বরের নামগুলি, রাগরাগিণীর নামগুলি, তালের নাম ও গীতরীতির প্রভূত অন্তর দৃষ্ট হয়। তাল পদ্ধতির মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য পাওয়া যায়। (বর্তমান যুগে, উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে, বেশ কয়েকটি দক্ষিণ ভারতীয় রাগের অনুপ্রবেশ ঘটেছে)

হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী স্বরের তুলনাত্মক আলোচনা—হিন্দুস্থানী এবং কর্ণাটকী উভয় সঙ্গীত পদ্ধতিতেই দ্বাদশ স্বরের বর্তমান দেখা যায় এবং স্বরসপ্তকে তাদের অবস্থিতি একইভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বরগুলির নামকরণ এক নয়। যেমন—কর্ণাটকী শুদ্ধ ঋষভ স্বরটি, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কোমল ঋষভ। কর্ণাটকী শুদ্ধ ধৈবৎ, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের কোমল ধৈবৎ। আবার হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের শুদ্ধ ঋষভ ও শুদ্ধ ধৈবৎ যথাক্রমে কর্ণাটকী সঙ্গীতের শুদ্ধ গান্ধার ও শুদ্ধ নিষাদ স্বরের সমান। এইভাবে স্পষ্টই দেখা যায় যে, কর্ণাটকী শুদ্ধ স্বরসপ্তক হিন্দুস্থানী স্বরসপ্তকের নামানুসারে নিম্নরূপ হবে। যথ—সা রে̱ রে ম প ধ̱ ধ র্সা। কারণ হিন্দুস্থানী কোমল ঋষভ ও কোমল ধৈবৎ স্বর দুটি যথাক্রমে কর্ণাটকী শুদ্ধ ঋষভ ও শুদ্ধ ধৈবতের সমান এবং হিন্দুস্থানী শুদ্ধ ঋষভ ও শুদ্ধ ধৈবৎ স্বরদুটি যথাক্রমে কর্ণাটকী শুদ্ধ গান্ধার ও শুদ্ধ নিষাধ স্বরদুটির সমান।

উপরিউক্ত ঠাটই দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের 'কনকাঙ্গী' নামক শুদ্ধ ঠাট। এই ঠাটটি প্রাচীন 'মুখারী' ঠাটের স্বরসপ্তকের সমান।

কর্ণাটকী সঙ্গীত পদ্ধতিতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির 'কোমল স্বরের' ন্যায় কোন স্বরের নামকরণ আদৌ নেই। হিন্দুস্থানী স্বরস্থানে কোমল স্বরের পর অর্থাৎ কোমল স্বরের দক্ষিণ দিকে শুদ্ধ স্বরের অবস্থান পাওয়া যায়। কিন্তু কর্ণাটকী শুদ্ধ স্বরাবস্থান, হিন্দুস্থানী শুদ্ধ স্বরাবস্থানের বাম দিকে দেখা যায় এবং বিকৃত স্বরগুলি, শুদ্ধ স্বরের অবস্থান হতে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বা তীব্ররূপ প্রাপ্ত। যেমন—শুদ্ধ ঋষভের পরই দক্ষিণ দিকের স্বরটিকে চতুঃশ্রুতি ঋষভ বা শুদ্ধ গান্ধার বলা হয়। শুদ্ধ গান্ধারের পরই সাধারণ গান্ধার স্বরটি অবস্থিত। সাধারণ গান্ধার স্বরটির ষটশ্রুতি ঋষভও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলা হয়ে থাকে। 'সাধারণ গান্ধার' স্বরটির পরবর্তি তীব্র স্বর হল 'অন্তর গান্ধার' কর্ণাটকী সাধারণ গান্ধার, হিন্দুস্থানী কোমল গান্ধারের সমান পূর্বেই বলা হয়েছে এবং কর্ণাটকী 'অন্তর গান্ধার,' হিন্দুস্থানী 'শুদ্ধ গান্ধার' স্বরের সমান। অর্থাৎ নামকরণের পার্থক্য ছাড়া স্বরের কোন প্রভেদ নেই। ক্রমানুসারে ঠিক একই প্রকার পার্থক্য ধৈবৎ ও নিষাদ স্বর দুটির বেলায় পাওয়া যায়। শুদ্ধ- ধৈবতের পর ক্রমশঃ শুদ্ধ নিষাদ বা চতুঃশ্রুতি ধৈবৎ। তারপর কৈশিক নিষাদ অথবা ষট্শ্রুতি ধৈবৎ এবং শেষে কাকলী নিষাদ। হিন্দুস্থানী স্বরসপ্তকে ক্রমানুসারে যেমন—কোমল ধৈবতের পর শুদ্ধ ধৈবৎ এবং কোমল নিষাদের পর শুদ্ধ নিষাদ প্রভৃতি পাওয়া যায়। (দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরসপ্তকে ইহা নেই।) হিন্দুস্থানী তীব্রমধ্যম স্বরস্থানে, কর্ণাটকী পদ্ধতিতে 'প্রতিমধ্যম' স্বরনাম পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত তালিকা হতে আরো পরিষ্কার বোঝা যাবে—

স্বর সংখ্যা	কর্ণাটকী স্বরনাম	হিন্দুস্থানী স্বরনাম
১	সা	সা
২	শুদ্ধ রে	কোমল রে
৩	শুদ্ধ গ (চতুঃশ্রুতি রে)	শুদ্ধ রে
৪	সাধারণ গ (ষটশ্রুতি রে)	কোমল গ
৫	অন্তর গ	শুদ্ধ গ
৬	শুদ্ধ ম	শুদ্ধ ম
৭	প্রতি ম	তীব্র ম
৮	প	প
৯	শুদ্ধ ধ	কোমল ধ
১০	শুদ্ধ নি (চতুশ্রুতি ধ)	শুদ্ধ ধ
১১	কৈশিক নি (ষট্শ্রুতি ধ),	কোমল নি
১২	কাকলী নি	শুদ্ধ নি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত-পদ্ধতির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈষম্য নিম্নরূপে দেখা যায়:

সাদৃশ্য—উভয় সঙ্গীত পদ্ধতিই বহু পুরাতন কাল হতে প্রচলিত। দুই পদ্ধতিতেই সপ্তকের অন্তর্গত মোট দ্বাদশ স্বরস্থান পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী উভয় সঙ্গীত পদ্ধতিতে স্বরাবস্থানের কোনো পার্থক্য নেই। দ্বাদশ স্বরের উপর নির্ভর করে উভয় সঙ্গীত পদ্ধতির ঠাট পদ্ধতি রচিত হয়েছে। দুই সঙ্গীত পদ্ধতিতেই রাগ গাওয়া হয়, ঠাট গাওয়া হয় না। আলাপ গান ও গানের সাথে তান করার পদ্ধতি হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী উভয় সঙ্গীত পদ্ধতিতে প্রচলিত আছে। জন্য ও জনক অর্থাৎ ঠাট ও রাগ বর্গীকরণ উভয় প্রথার সঙ্গীতে বর্তমান দেখা যায়।

বৈসাদৃশ্য—হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতিতে মোট দ্বাদশটি স্বরের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু কর্ণাটকী সঙ্গীত ধারায় মোট ষোলটি স্বরের নাম আছে। এই দুই সঙ্গীত ধারার শুদ্ধ ঠাট ভিন্ন প্রকারের দেখা যায়। এমন অনেকগুলি রাগ পাওয়া যায়, যা এক সঙ্গীত ধারায় বর্তমান পাওয়া গেলেও অন্যটিতে নেই। কর্ণাটকী সঙ্গীতে কানাড়ী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষায় গানগুলি রচিত। কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের গানগুলি ব্রজভাষা, হিন্দী, পাঞ্জাবী, প্রভৃতি ভাষায় রচিত। দুই ধারার সঙ্গীত পদ্ধতির তাল পদ্ধতি ভিন্ন প্রকারের। হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী সঙ্গীত পদ্ধতিতে গীতরীতির ধারা সম্পূর্ণ পৃথক। কর্ণাটকী সঙ্গীতের আধারে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের জন্ম হলেও কালক্রমে দুই সঙ্গীতের রূপ বর্তমানে সম্পূর্ণ পৃথক।

ধ্বনি—বায়ুর কম্পনের সাহায্যে উৎপন্ন, যা আমরা শ্রবনেন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করতে পারি, তাহাই 'ধ্বনি'। ধ্বনির মাধ্যমেই সঙ্গীতের সৃষ্টি। মানুষের কণ্ঠের মধ্যে যে স্বরতন্ত্রী (vocal chord) আছে, সেগুলি বায়ুর সাহায্যে আঘাত প্রাপ্ত হলে কম্পনের সৃষ্টি হয় এবং এই কম্পন হতেই কণ্ঠস্বরের উৎপত্তি হয়। ততযন্ত্রের তারের উপর আঘাত করলে তারে কম্পনের সৃষ্টি হয় এবং সেই কম্পন হতেই 'ধ্বনির' উৎপত্তি হয়। পাখোয়াজ, খোল, তবলা, ঢোল, নাকাড়া, প্রভৃতি 'ঘন বাদ্যযন্ত্রে' আঘাত দ্বারা কম্পন সৃষ্টি করতে পারলে বা বাঁশি, সানাই প্রভৃতি 'শুষির বাদ্যযন্ত্রে' বায়ুর কম্পন সৃষ্টি হলে পর 'ধ্বনির' সৃষ্টি হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আন্দোলন—সুরে বাঁধা বীণা, তানপুরা, সেতার বা সরোদ প্রভৃতি তত্তযন্ত্রে বা তারের বাদ্যযন্ত্রে কোনরূপ আঘাত দ্বারা শব্দ বা ধ্বনি উৎপাদন করার সময়, তারটি উপর নীচে বা পার্শ্ববর্তী পরস্পর বিপরীত দিকে আন্দোলিত হয়। তারটি আন্দোলিত হবার সময় স্বস্থান হতে প্রথমে একদিকে চলে গিয়ে, তৎক্ষণাৎই স্বস্থানে ফিরে এসে আবার সমদূরবর্তী বিপরীত দিকে প্রস্থান করে পুনর্বার স্বস্থানে প্রত্যাগমন করে। হঠাৎ কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত না হলে, তারটির আগমণ প্রত্যাগমণ এইভাবে বেশ কিছু সময় চলতে থাকে এবং 'ধ্বনি' সৃষ্টি করে থাকে। যে সময় তারটি একদিক হতে বিপরীত দিকে চলা ফেরা করে চলে এবং ধ্বনি উৎপন্ন করে, তাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় 'আন্দোলন' বা 'অনুকম্পন' (vibration) বলা হয়।

ক চিত্র

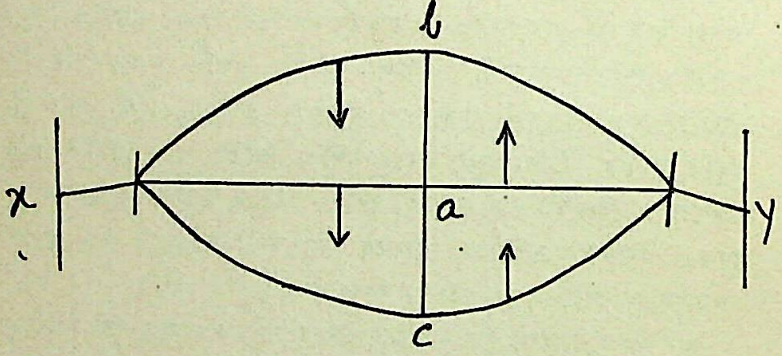

উপরের 'ক' চিত্রে *xy* একটি তার লাগানো আছে। তারটির আঘাত করার বা বাজাবার স্থান হল *a* বিন্দু। তারটির উপর বাজাবার জন্য যখন আঘাত করা হয়, তখন তারটি *a* বিন্দুরস্থান হতে প্রথমে উপর দিকের *b* বিন্দু পর্যন্ত গিয়ে আবার *a* বিন্দু হয়ে, বিপরীত দিকের সমদূরবর্তি *c* বিন্দু পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে আবার *a* বিন্দুতে ফিরে আসে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ *ab* সরল রেখা সমান *ac* সরল রেখা। তারের এই *a* বিন্দু হতে *b* বিন্দু পর্যন্ত প্রস্তারিত হয়ে *c* বিন্দু স্পর্শ করে স্বস্থান *a* বিন্দুতে ফিরে আসা, তারের কর্মকে একটি সম্পূর্ণ 'আন্দোলন' বলা হয়।

উপরে বর্ণিত ক চিত্রে তারটি *a* বিন্দু হতে *b* বিন্দুতে গিয়ে আবার বিপরীত দিকে *c* বিন্দু পর্যন্ত এসে, পুনর্বার তারাটি *a* বিন্দুতে ফিরে আসা এবং এই আন্দোলন, ধ্বনি উৎপাদনের সময় বাধাহীন গতিতে ক্রমাগত চলতে থাকে। এই আন্দোলন চলার সময় প্রতি সেকেণ্ডে তারটি যতবার উভয় দিকে আন্দোলিত হয় অর্থাৎ *a* বিন্দুতে যতবার আসে, এবং যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, সেই ধ্বনির আন্দোলন সংখ্যা বা কম্পাঙ্ক ততো হয়। আন্দোলনের প্রথম ভাগে *a* হতে *b* ও *c* বিন্দুর যে দূরত্ব থাকে, পরবর্তি সময়ে তা ক্রমশঃ কম হতে থাকে এবং কিছু সময় পর এই আন্দোলন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ধ্বনিও তখন স্তব্ধ হয়। তারে অর্থাৎ *xy*তে আন্দোলনের শুরু হতে যে আন্দোলন শুরু হয় এবং যখন ধ্বনি কম হতে থাকে তখন উপরি লিখিত ক চিত্রের *a* বিন্দু হতে *b* ও *c* বিন্দুর দূরত্ব অর্থাৎ *ab* ও *ac* সরল রেখার দৈর্ঘ্য কম হতে থাকে। এই ভাবে প্রতি সেকেণ্ডে, আন্দোলন সংখ্যা যখন প্রায় সমান পাওয়া যায় অর্থাৎ তারের আন্দোলন সমান থাকে, তখন তাকে 'নিয়মিত আন্দোলন' বলা হয়। কিন্তু যখন আন্দোলন সংখ্যা পরিবর্তনশীল থাকে, অর্থাৎ সমান থাকে না, তখন তাকে 'অনিয়মিত আন্দোলন' বলা হয়। যে আন্দোলন নিয়মিত ভাবে কিছুক্ষণ ধরে আন্দোলিত হয়, তাহাই 'স্থির আন্দোলন' এবং যা অল্পক্ষণের জন্যও সমান ভাবে আন্দোলিত হয় না, মাঝে মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাকে 'অস্থির আন্দোলন' বলা হয়।

নাদ—নিয়মিত এবং স্থির আন্দোলন হতে উৎপন্ন যে ধ্বনি, মধুর এবং সঙ্গীতোপযোগী, তাহাকেই 'নাদ' বলা হয়। নাদ দুই প্রকারের হয়। যথা আহত নাদ ও অনাহত নাদ। সঙ্গীতে কেবল 'আহতনাদেরই' প্রয়োজন আছে।

অনিয়মিত এবং অস্থির আন্দোলন দ্বারা, যে ধ্বনির উৎপত্তি হয়, তা সাধারণ 'শব্দ'। সাধারণ শব্দ বলতে, কোলাহল, গণ্ডগোল প্রভৃতি ধ্বনিকে বোঝায়, যা সুশ্রাব্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উপযোগী নয়। প্রত্যেক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাদের একটি নির্দিষ্ট আন্দোলন সংখ্যা থাকে। আন্দোলন সংখ্যার পরিবর্তনে নাদেরও পরিবর্তন হয়ে যায়। নাদ সম্বন্ধে তিনটি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। যেমন,—নাদের উঁচুনীচু ভাব, নাদের ধ্বনির গুণাগুণ এবং নাদের জাতি ও গুণ।

নাদের উঁচুনীচু ভাব, নাদের আন্দোলন সংখ্যার উপর নির্ভরশীল থাকে। কোনো স্বরের আন্দোলন সংখ্যার দ্বিগুণ আন্দোলন সংখ্যাযুক্ত স্বরও দ্বিগুণ উঁচু স্বর হয়।

নাদের ধ্বনির গুণাগুণের বিষয়, নাদের আন্দোলনের চওড়া বা প্রস্থের দিকে বিস্তারের উপর নির্ভর করে। ক চিত্রে *b* ও *c* বিন্দুর দূরত্ব হল নাদের আন্দোলনের বিস্তৃতির দিক। তানপুরার তারের উপর যদি জোরে আঘাত করা হয়, তাহলে তারগুলি চওড়া দিকে অধিক বিস্তারিত হয় এবং ধ্বনির শক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে নাদ অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যাবে। কিন্তু সেই একই তানপুরার তারের উপর যদি আস্তে আঘাত করা হয়, তবে তার চওড়া দিকের বিস্তৃতি বিশেষ হবে না এবং নাদের শ্রুতি সুদূর-শ্রাব্য হবে না। অর্থাৎ শব্দ ক্ষীণ হবে।

নাদের জাতি ও গুণাগুণ, যা উক্ত নাদের সাথে সাথে অন্য সহায়ক নাদের অর্থাৎ ভিন্ন আন্দোলন সংখ্যাযুক্ত নাদ মিশ্রিত থাকে। অধিকাংশ নাদই, শুধুমাত্র একটি বিশেষ ধ্বনির আন্দোলন সংখ্যার উপর নির্ভরশীল থাকে না। তার সাথে উচ্চসংখ্যক কম্পাঙ্ক বা আন্দোলনযুক্ত অন্য কোন একটি সহায়ক নাদ মূল নাদের সাথে সংযুক্ত থাকে। যাঁর শ্রবনেন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম শব্দ অনুধাবনে সক্ষম, তিনি সেই নাদের বা ধ্বনির জাতি ও গুণাগুণ শুনে অনায়াসেই অনুভব করতে পারেন। মূল নাদের সাথে যে সূক্ষ্ম আর একটি সহায়ক নাদ বা ধ্বনি সন্নিবেশিত থাকে, তাকে সহায়ক নাদ বলা হয়ে থাকে। যেমন, তানপুরার তারের ও ব্রীজের মধ্যস্থলে সুতা দিয়ে ধ্বনির অনুকম্পণ বৃদ্ধি করা হয় এবং তার দ্বারা সহায়ক নাদ সংযুক্ত হয়ে ধ্বনির জাতি বা গুণাগুণ নির্ণীত হয়। ভারতীয় সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি, সহায়ক নাদ দ্বারা সংযুক্ত হয়ে আরো মাধুর্যপূর্ণ হয়। সহায়ক নাদের কম্পাঙ্ক মূল নাদের সঙ্গে বেশ কিছু পার্থক্য নিশ্চয়ই থাকে এবং এ জন্যই এ সব নাদের জাতি ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। চোখ বন্ধ করেও নাদের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধ্বণি শুনে বলা যায় যে, কোন বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি। ইহাকেই নাদের জাতি গুণাগুণের বিশেষত্ব বলা হয়।

নাদস্থান—কোন একটি স্বরের অবস্থান নির্দ্ধারণ কর্মই নাদস্থান। নাদস্থান পরিচিত হয়, স্বরসপ্তকের মাধ্যমে। সপ্তক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরিবর্তি অংশে পাওয়া যাবে।

কোন একটি স্বরের দ্বিগুণ উঁচু বা আন্দোলন সংখ্যাযুক্ত স্বরের পূর্ব পর্যন্ত ক্ষেত্রকে একটি 'নাদস্থান' বলা হয়। মানুষের অবয়বের সাথে এই নাদস্থানের সম্পর্ক পাওয়া যায়। শরীরের তিনটি অবয়বের অংশ, যথা—হৃদয়-কণ্ঠ ও মস্তিষ্ক। এই তিনটি স্থল নাদোচ্চারণের তিনটি উৎস স্থান বলে জানা যায়। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে নাদস্থানের তিনটি অবস্থা পাওয়া যায়। যথা—মন্দ্র, মধ্য ও তার, যথাক্রমে উদারা, মুদারা ও তারা নাদস্থান।

মন্দ্র বা উদারা নাদস্থানের উচ্চারণের সময় হৃদয়ের উপর বেশ একটু চাপের সৃষ্টি হয়, তা অনুভব করা যায়। মধ্য বা মুদারা স্থানের স্বরোচ্চারণে কণ্ঠের মধ্যে একটা স্পর্শ অনুভূত হয়। এবং তার স্থানের স্বরোচ্চারণে মস্তিষ্কে যেন কিছু জোড় পড়ে মনে হয়। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নাদস্থানগুলিকে এক একটি সীমাবদ্ধ অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। নিম্নের চিত্র হতে আরো স্পষ্ট বোঝা যাবে।

মন্দ্রনাদস্থান	মধ্যনাদস্থান	তারনাদস্থান
সা়	। সা	। সা̇

এই চিত্রে সা় স্বর হতে সা স্বরএর পূর্বস্থান পর্যন্ত মন্দ্রস্থান। সা স্বর হতে সা̇ এর পূর্ব অংশ পর্যন্ত মধ্য নাদস্থান এবং সা̇ স্বর হতে বাকী অংশটী তার নাদ স্থান বলা হয়। বাদ্যযন্ত্রে নাদস্থান তিন প্রকারের চেয়ে অধিক হতে পারে। কিন্তু উত্তর ভারতীয় রাগ সঙ্গীতে সাধারণতঃ এই তিন নাদস্থানের কথা বলা হয় এবং মানুষের কণ্ঠস্বরেও এই তিন নাদস্থান বর্তমান দেখা যায়।

শ্রুতি—সঙ্গীতোপযোগী স্বরের যে সূক্ষ্মাংশগুলি শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হয় তাকেই 'শ্রুতি' বলা হয়। এক নাদস্থানের মধ্যে অসংখ্য সূক্ষ্মনাদ থাকতে পারে। কিন্তু এই বৃহৎ সংখ্যক নাদগুলি পরস্পর এতোই নিকটবর্তী হয় যে, একটী নাদের ধ্বনির সঙ্গে অন্যটীর পার্থক্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুধাবন করা বিশেষ কঠিন হয়ে পড়ে। আবার গান করার সময় সেই নাদগুলির বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা বা বিশ্লেষণ করা অসাধ্য কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় সঙ্গীতজ্ঞ ও পণ্ডিত সঙ্গীতবেত্তারা চিন্তা করতে লাগলেন যে, একটি নাদস্থানের মধ্য হতে সর্বাধিক কতগুলি পৃথক পৃথক নাদ নির্ণয় করা যায়, যা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রুতিগোচর হয় এবং কণ্ঠের সাহায্যে পরিবেশিত হতে পারে। বহু চিন্তার পর অধিকন্তু মোট দ্বাবিংশটী নাদই শ্রুতিগোচর হতে পারে এবং তার বেশী নাদ শ্রুতির দ্বারা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হবে না, এরূপ স্থির হয়। কারণ সূক্ষ্মনাদের মধ্য হতে এই দ্বাবিংশটী নাদের বেশী সংখ্যক নাদের সংলাপ করলে পর, একটী নাদ, অপরটি হতে এতোই নিকটবর্তী হয়ে যাবে যে, শেষ পর্যন্ত তা পার্থক্য করা, বিশেষ কঠিন হয়ে পড়বে। এই অবস্থায় সঙ্গীতের রূপ ঠিক রেখে সঙ্গীত পরিবেশন, অত্যন্ত সংকটময় হয়ে পড়তে পারে। তাই একটি নাদস্থানে দ্বাবিংশটি নাদের উপস্থিতি সর্বমান্য হয় এবং এই এক একটি নাদের নামাকরণ হয় 'শ্রুতি'। অর্থাৎ এক নাদস্থানের মধ্যে অসংখ্য নাদ হতে সর্বাধিক দ্বাবিংশটি নাদ, যা একটী হতে অপরটী শ্রবণ বা গান করার দ্বারা সম্পূর্ণ পৃথক করা সম্ভব, এমনই দ্বাবিংশটী নাদের নাম দ্বাবিংশ 'শ্রুতি' বলা হয়েছে। নাদ এবং শ্রুতিগুলির মধ্যে তারতম্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, সব শ্রুতিগুলিই 'নাদ', কিন্তু সব নাদগুলিই 'শ্রুতি' নয়। যে নাদগুলি বিশেষতঃ সঙ্গীত শ্রবণ ও পরিবেশনের সময় পৃথক করা সম্ভব হয় সেই নাদগুলিই শ্রুতি পর্যায়ে পড়ে। সঙ্গীতে এই দ্বাবিংশ শ্রুতি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

স্বর—শ্রুতিগুলির দূরত্ব অতি অল্প হওয়ায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুরে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হয় না। এই শ্রুতিগুলির দূরত্ব কিছুটা বর্দ্ধিত করলে পর সুরের বৈচিত্র্য প্রকাশ পেতে পারে এই চিন্তা হতে 'স্বরের' উৎপত্তি। অর্থাৎ প্রথম শ্রুতি হতে কতগুলি শ্রুতি বাদ দিলে, পরিবর্তি শ্রুতিটী সুশ্রাব্য ও উপলব্ধ হয়, তার নির্ণয় দ্বারা শ্রুতির মধ্যে স্বরস্থানের অবস্থিতি পাওয়া যায়। আবার দ্বাবিংশ শ্রুতি শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিচার করা বা কণ্ঠসঙ্গীতে আয়ত্ব করা বিশেষ অভ্যাস সাপেক্ষ। তাই কণ্ঠসঙ্গীতে দ্বাবিংশ শ্রুতির মধ্য হতে কিছু কিছু দূরত্ব বর্দ্ধিত করে, অর্থাৎ মধ্যবর্তি কয়েকটী শ্রুতিকে বাদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দিয়ে স্বরগুলির সৌন্দর্য প্রকাশের ও ব্যবহারের সুবিধা ও সরলতার জন্য কয়েকটী বিশেষ শ্রুতিকে নির্বাচন করা হয়েছে। এই শ্রুতিগুলি মুখ্যতঃ সাতটি। নাদ স্থানের দ্বাবিংশ শ্রুতি হতে মুখ্যতঃ যে সাতটি শ্রুতি, সঙ্গীতে ব্যবহারের সুবিধা ও সরলতার জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে, সেগুলিকে 'স্বর' আখ্যা দেওয়া হয়। এবং এগুলিকে শুদ্ধ স্বর বলা হয়। এই সাত স্বরের আধারের উপরই সমগ্র সঙ্গীত কলার সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ হয়েছে। এই স্বরগুলির নামকরণ, যথাক্রমে—ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবৎ ও নিষাদ এবং এগুলির সংক্ষিপ্ত নাম যথাক্রমে সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি।

শ্রুতির মধ্যে স্বরের অবস্থান—প্রাচীন বা মধ্যকালীন এবং বর্তমান সঙ্গীতপদ্ধতিতে শ্রুতির উপর স্বরের অবস্থানের বিশেষ পার্থক্য পাওয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যকালীন পদ্ধতিতে স্বর, শ্রুতির অন্তিম শ্রুতির উপর অবস্থিত ছিল। কিন্তু পরবর্তিকালে অর্থাৎ বর্তমানে স্বর, শ্রুতির প্রথম শ্রুতির উপর স্থাপিত হয়েছে। অন্তিম শ্রুতি এবং প্রথম শ্রুতি বলতে, এক একটি স্বরের অন্তর্গত ক্রম সহযোগে যে শ্রুতিগুলি পাওয়া যায়, তারই অন্তিমটি অথবা প্রথমটি বোঝায়।

প্রাচীন পদ্ধতিতে, চতুর্থ শ্রুতির উপর ষড়জ স্বরটি, সপ্তম শ্রুতির উপর ঋষভ স্বরটি, নবম শ্রুতির উপর গান্ধার স্বরটি, ত্রয়োদশ শ্রুতির উপর মধ্যম স্বরটি, সপ্তদশ শ্রুতির উপর পঞ্চম স্বরটি, বিংশশ্রুতির উপর ধৈবৎ স্বরটি, দ্বাবিংশ শ্রুতির উপর নিষাদ প্রভৃতি স্বরের সংস্থান করা হয়েছে। প্রথম চারটি শ্রুতি ষড়জ স্বরের বলা হয়। তারপর পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম, এই তিনটি শ্রুতি ঋষভের। অষ্টম ও নবম শ্রুতি দু'টি গান্ধারের। দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্রুতিগুলি মধ্যম স্বরের চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ শ্রুতিগুলি পঞ্চম স্বরের। অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শ্রুতিগুলি ধৈবৎ স্বরের এবং বাকী একবিংশ ও দ্বাবিংশ শ্রুতি দুটি নিষাদ স্বরের বলে ধরা হয়। ১৪ পৃষ্ঠায় ১নং চিত্রে দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত চিত্রে,—ষড়জের শ্রুতিগুলির মধ্যে অন্তিম শ্রুতির উপর ষড়জ স্বরের অবস্থান, ঋষভের শ্রুতিগুলির মধ্যে অন্তিমশ্রুতির উপর ঋষভ স্বরের অবস্থান, গান্ধারের শ্রুতিগুলির মধ্যে অন্তিম শ্রুতির উপর গান্ধার স্বরের অবস্থান, মধ্যমের শ্রুতিগুলির মধ্যে অন্তিম শ্রুতির উপর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মধ্যম স্বরের অবস্থান, পঞ্চমের শ্রুতিগুলির মধ্যে অন্তিমশ্রুতির উপর পঞ্চম স্বরের অবস্থান, ধৈবতের শ্রুতিগুলির মধ্যে অন্তিমশ্রুতির উপর ধৈবৎ স্বরের অবস্থান এবং নিষাদ শ্রুতিগুলির মধ্যে নিষাদ স্বরটি অন্তিম শ্রুতির উপর অবস্থিত দেখা যায়।

কিন্তু আধুনিক কালে শ্রুতির উপর স্বরস্থানের প্রণালী সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। এ জন্যই প্রাচীন বা মধ্যকালীন শুদ্ধ স্বর সপ্তক হতে আধুনিক কালের শুদ্ধ স্বরসপ্তক সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেছে। প্রাচীন বা মধ্যকালীন শুদ্ধ স্বরসপ্তকে ঋষভ ও গান্ধার স্বরের মধ্যে কেবলমাত্র এক শ্রুতির পার্থক্য ছিল। কিন্তু আধুনিককালের ঋষভ গান্ধার স্বরের মধ্যে এই পার্থক্য বর্দ্ধিত হয়ে দুই শ্রুতিতে পরিণত হয়েছে। অনুরূপভাবে ধৈবৎ ও নিষাদ স্বরের মধ্যেও প্রাচীন বা মধ্যকালীন শুদ্ধ স্বরসপ্তকে এক শ্রুতির পার্থক্য ছিল। কিন্তু আধুনিককালে, ধৈবৎ নিষাদ স্বরের ক্ষেত্রেও গান্ধারের ন্যায় দূরত্ব বর্দ্ধিত হয়ে দুই শ্রুতির পার্থক্য হয়েছে। প্রাচীন বা মধ্যকালীন সময়ে ঋষভ স্বরের নিকটবর্তী গান্ধার স্বরটি এবং নিষাদ স্বরটি ধৈবৎ স্বরের নিকটবর্তী থাকায় গান্ধার ও নিষাদ স্বরদুটি কোমলরূপ প্রাপ্ত ছিল। ফলতঃ প্রাচীন বা মধ্যকালীন শুদ্ধ স্বরসপ্তকের রূপ, বর্তমান 'কাফীঠাটের' ন্যায় ছিল। কিন্তু আধুনিক কালে ঋষভ, গান্ধার ও ধৈবৎ, নিষাদ স্বরের দূরত্ব বর্দ্ধিত হওয়ায় গান্ধার ও নিষাদ স্বর দুটি শুদ্ধরূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এবং এজন্য বর্তমান শুদ্ধ ঠাটের রূপ বিলাবল ঠাটের ন্যায় পাওয়া যায়।

এই পার্থক্য কিভাবে হয়েছে তা অত্যন্ত লক্ষণীয় বিষয়। ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বর তিনটি চারশ্রুতিযুক্ত, ঋষভ ও ধৈবৎ স্বর দুটি তিনশ্রুতিযুক্ত এবং গান্ধার ও নিষাদ স্বরদুটি দুই শ্রুতিযুক্ত আজও আছে। তাহলে গান্ধার ও নিষাদের সুররূপ বর্তমানে কিভাবে পরিবর্তিত হল প্রশ্ন জাগে। শ্রুতির উপর স্বরাবস্থান আধুনিককালে, সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হওয়ায় এই পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। স্বর শ্রুতির অন্তিম শ্রুতির উপর হতে প্রথম শ্রুতির উপর অবস্থিত হয়েছে বর্তমান কালে। যেমন—ষড়জ স্বরটি চতুর্থশ্রুতির উপর স্থাপিত না হয়ে প্রথমশ্রুতির উপর, ঋষভ স্বরটি সপ্তম শ্রুতির স্থাপিত না হয়ে পঞ্চমশ্রুতির উপর, গান্ধার স্বরটি নবম শ্রুতির উপর না হয়ে অষ্টম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রুতির উপর, মধ্যম স্বরটি ত্রয়োদশ শ্রুতির উপর না হয়ে দশম শ্রুতির উপর, পঞ্চম স্বরটি সপ্তদশ শ্রুতির উপর না হয়ে চতুর্দশ শ্রুতির উপর, ধৈবৎ স্বরটি বিংশশ্রুতির উপর না হয়ে অষ্টাদশ শ্রুতির উপর এবং নিষাদ স্বরটি দ্বাবিংশ শ্রুতির পরিবর্তে একবিংশ শ্রুতির উপর বর্তমানে স্থাপিত দেখা যায়। ১৪ পৃষ্ঠায় ২নং চিত্রে দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত শ্রুতিগুলির উপর স্বরাবস্থানের জন্যই বর্তমান শুদ্ধ স্বরসপ্তক 'বিলাবল ঠাটের' রূপের ন্যায় পাওয়া যায়। এই পরিবর্তনের জন্য অর্থাৎ অন্তিম শ্রুতির উপর স্বরাবস্থান হতে প্রথম শ্রুতির উপর স্বরাবস্থান, ভারতীয় রাগ রাগিনীর উপরও যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার নজীর পাওয়া যায়। সঙ্গীতের মূল শুদ্ধ স্বরসপ্তকের পরিবর্তন ঘটলে, সঙ্গীতের অন্যান্য কাঠামোর পরিবর্তন ঘটাও স্বাভাবিক। কিন্তু এই পরিবর্তন ঠিক কোন্ সময়ে ঘটেছিল বা কোন্ পুস্তকে প্রথম এই পরিবর্তনের কথা উল্লিখিত আছে, তার সঠিক অনুসন্ধান করা দরকার। কারণ, এই পরিবর্তন শাস্ত্রসম্মত কোন সঙ্গীতজ্ঞের বা সঙ্গীতশাস্ত্রকার দ্বারা কিভাবে হয়েছিল, সেই তথ্য জানা গেলে সঙ্গীত সম্বন্ধীয় আরো কিছু তথ্য জানা সহজ হবে। তুলনামূলক স্বরাবস্থানের একটি চিত্র দেওয়া হল।

নিম্ন শ্রুতির উপর স্বরাবস্থানের প্রাচীন বা মধ্যকালীনও আধুনিক কালের তুলনামূলক চিত্র পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বরের নাম	শ্রুতির নাম	প্রাচীন বা মধ্যকালীন শুদ্ধ স্বর	আধুনিক শুদ্ধ স্বর
ষড়জ	১। তীব্রা		ষড়জ—সা
	২। কুমুদ্বতী		
	৩। মন্দা		
	৪। ছন্দোবতী	ষড়জ—সা	
ঋষভ	৫। দয়াবতী		ঋষভ—রে
	৬। রঞ্জনী		
	৭। রিক্তকা	ঋষভ—রে	
গান্ধার	৮। রৌদ্রী		গান্ধার—গ
	৯। ক্রোধী	গান্ধার—গ	
মধ্যম	১০। বজ্রিকা		মধ্যম—ম
	১১। প্রসারিনী		
	১২। প্রীতি		
	১৩। মার্জনী	মধ্যম—ম	
পঞ্চম	১৪। ক্ষিতি		পঞ্চম—প
	১৫। রক্তা		
	১৬। সন্দিপীনি		
	১৭। আলাপীনি	পঞ্চম—প	
ধৈবৎ	১৮। মদন্তী		ধৈবৎ—ধ
	১৯। রোহিনী		
	২০। রম্যা	ধৈবৎ—ধ	
নিষাদ	২১। উগ্রা		নিষাদ—নি
	২২। ক্ষোভিনী	নিষাদ—নি	

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

১নং চিত্র

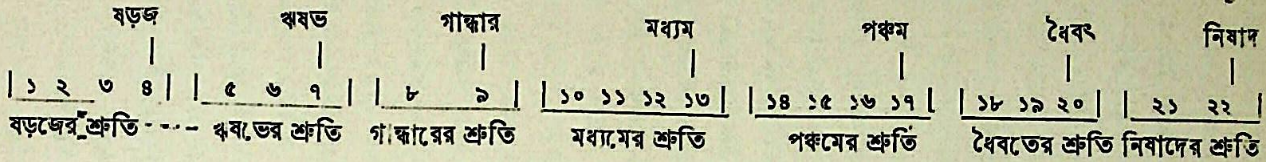

২নং চিত্র

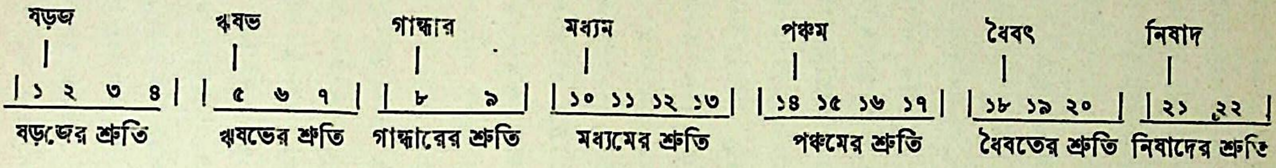

৩নং চিত্র

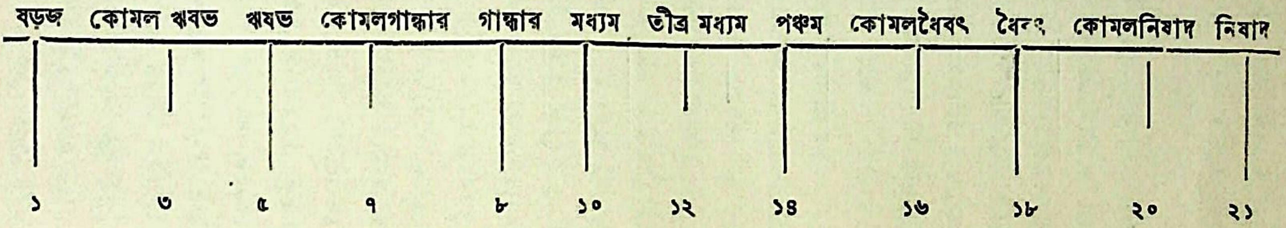

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বর প্রকরণ—সঙ্গীতে সাত শুদ্ধ স্বরের ব্যবহারের কথা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এই শুদ্ধ সাত স্বরের সাহায্যে সঙ্গীতের পূর্ণ সুররূপ লাভে অসুবিধা হওয়ায়, বাইশ শ্রুতির মধ্য হতে আরো কয়েকটি স্বরের সৃষ্টি হয়। এই স্বরগুলিকে "বিকৃত স্বর" বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ স্বর দুই প্রকারের পাওয়া যায়। যথা—'শুদ্ধ' ও 'বিকৃত'। স্বরের শ্রুতিগুলির মধ্যে মুখ্য শ্রুতির উপর অবস্থিত স্বরগুলি "শুদ্ধ স্বর" নামে অভিহিত হয় এবং পরস্পর মুখ্যস্বরগুলির মধ্যস্থলে অবস্থিত স্বরগুলি "বিকৃত স্বর" বলা হয়। উত্তর ভারতীয় স্বরপ্রকরণে বিকৃত স্বর দুই ভাগে বিভক্ত। যেমন, কোমল স্বর এবং তীব্র স্বর। যে বিকৃত স্বরটি স্বরের মুখ্য শ্রুতি হতে বাম দিকে কোন একটি শ্রুতির উপর থাকে, তাকে 'কোমলস্বর' বলা হয়ে থাকে। আর যে বিকৃত স্বরটি স্বরের মুখ্য শ্রুতির দক্ষিণ দিকের কোন একটি শ্রুতির উপর অবস্থিত থাকে, তাকে 'তীব্রস্বর' বলা হয়। এই কোমল এবং তীব্র স্বরের স্থান দুই শুদ্ধ স্বরের অন্তরবর্তী যে কোন শ্রুতির উপর অবস্থিত হতে পারে। তবে সাধারণ পর্যায়ে, কোমল ও তীব্র স্বরগুলি নির্দিষ্ট শ্রুতির উপর স্থাপিত। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে ঋষভ, গান্ধার, ধৈবৎ ও নিষাদ শুদ্ধ স্বরগুলির কোমল স্বর পাওয়া যায়। এবং কেবলমাত্র শুদ্ধমধ্যম স্বরের ক্ষেত্রে তীব্রস্বর বলা হয়ে থাকে। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে, কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে কোমলস্বর, অতিকোমল, অনুকোমল ও তীব্রকোমল রূপ প্রাপ্ত হয় এবং তীব্রস্বর, তীব্রতর এবং তীব্রতম রূপ প্রাপ্ত হয়। এই সুররূপগুলি বিশেষ বিশেষ শ্রুতির উপর নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। ষড়জ এবং পঞ্চম, এই স্বর দুটির কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যায় না উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতিতে। তাই এ দুটি স্বরকে "অচল স্বর" বলা হয়ে থাকে। সাতটি শুদ্ধ স্বর ও পাঁচটি বিকৃত স্বর, মোট বারটি স্বরের সমাবেশে সমগ্র উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের আধার সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো ওস্তাদকে, শুদ্ধস্বরকে তীব্রস্বর এবং শুদ্ধ মধ্যমকে কোমল মধ্যম বলতে শোনা যায়, তবে তা খুবই কম প্রচলিত। ১৪ পৃষ্ঠায় ৩নং চিত্রে দ্বাবিংশ শ্রুতির উপর দ্বাদশ স্বরস্থানের বিবরণ দেওয়া হল।

উল্লিখিত চিত্রে, "শ্রুতির উপর আধুনিক স্বরস্থান" মানা হয়েছে এবং সেই পদ্ধতিতে বর্ণনা দেওয়া হল। কর্ণাটক সঙ্গীতের স্বরনাম ভিন্ন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকারের।

সপ্তক—দ্বাবিংশ শ্রুতির মধ্যে মুখ্য সাত স্বরের সমাবেশে সুরের যে অংশ পরিব্যাপ্ত থাকে, তারই সাঙ্গীতিক নামকরণ হল "সপ্তক"। একটি স্বরের দ্বিগুণ উঁচু স্বরের পূর্বস্থল পর্যন্ত, একটি সপ্তকের পরিধি এবং ইহার মধ্যেই সাত শুদ্ধ স্বর ক্রমানুসারে অর্থাৎ ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, ও নিষাদ অবস্থিত। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে তিনটি সপ্তক পাওয়া যায় এবং তাদের নাম মন্দ্র বা উদারা, মধ্য বা মুদারা এবং তার বা তারা সপ্তক। মন্দ্রসপ্তকের দ্বিগুণ উঁচু মধ্যসপ্তক এবং মধ্যসপ্তকের দ্বিগুণ উঁচু তার সপ্তক। প্রত্যেক সপ্তকের মধ্যেই সাতটি শুদ্ধস্বর ও পাঁচটি বিকৃত স্বর পাওয়া যায়। এক সপ্তকের মধ্যে সাতটি মুখ্য স্বর থাকায় "সপ্তক" বলা হয়। অর্থাৎ ষড়জ হতে নিষাদ স্বর পর্যন্ত। কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মধ্য ষড়জ হতে তার-ষড়জ ক্ষেত্র নিয়েই সপ্তকের মহত্ত্ব পরিস্ফুট হয় এবং মধ্য ষড়জ হতে তার-ষড়জ পর্যন্ত ক্ষেত্রে মোট আটটি স্বর, গণনায় পাওয়া যায় (যদিও ষড়জ স্বরটি দু' বার আছে) এবং কোনা কোনা মতে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞেরা, এই সপ্তককে, অষ্টক বা octave বলার পক্ষপাতী দেখা যায়।

ঠাট—কোন কিছু সৃষ্টি করতে হলে, প্রথমে তার পরিকল্পনা করতে হয়, অর্থাৎ তার একটি কাঠামো রচনা করতে হবে। তারপর সেই কাঠামোর উপর আরো রংয়ের সাহায্যে পূর্ণতর সৌন্দর্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। যদি কাঠামো ছাড়া বা পরিকল্পনা বিহীন কিছু সৃষ্টি করার চেষ্টা করা যায়, তবে তা ঠিক হবে না। সেইরূপ সঙ্গীতে সুররূপ সৃষ্টি করতে হলে পরিকল্পনা বা কাঠামো বা ঠাটের বিশেষ প্রয়োজন হয়। তাই নাদ, শ্রুতি, স্বর ও সপ্তকের পর ঠাটের বিষয় এসে পড়ে। স্বরের সাহায্যে কোনো সুররূপ সৃষ্টি করতে হলে, সেই সুররূপ সৃষ্টির জন্য স্বর সমষ্টির এক বিশেষ কাঠামো বা ঠাটের প্রয়োজন হয়। এই কাঠামো বা ঠাটের সাহায্য গ্রহণ না করলে সুররূপ বিস্মৃত হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই কোনো সুররূপকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে যে স্বরের কাঠামোর প্রয়োজন তাকে "ঠাট" বলে। সঙ্গীতের এই ঠাটে শুদ্ধ বা বিকৃতরূপযুক্ত মোট সাতটি স্বরের অবশ্য বর্তমান থাকা দরকার এবং এই ঠাট হতে একাধিক রাগের সৃষ্টি হতে পারে। সপ্তকের শুদ্ধ বিকৃত স্বর হতে সাত স্বরের অনেকগুলি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঠাট রচিত হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে কেবল সেইগুলিই গৃহীত ঠাট হবে যার মধ্য হতে রঞ্জকতা পূর্ণ রাগের সৃষ্টি হতে পারে। এই ভাবে বহু ঠাটের মধ্য হতে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে বর্তমানে নিম্নলিখিত দশটি ঠাট নির্বাচিত করা হয়েছে :—

(১)	বিলাবল ঠাট —	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	(শুদ্ধ ঠাট)
(২)	কল্যাণ ঠাট —	সা	রে	গ	ম॑	প	ধ	নি।	
(৩)	খাম্বাজ ঠাট —	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি̲।	
(৪)	কাফী ঠাট —	সা	রে	গ̲	ম	প	ধ	নি̲।	
(৫)	আশাবরী ঠাট —	সা	রে	গ̲	ম	প	ধ̲	নি̲।	
(৬)	ভৈরবী ঠাট —	সা	রে̲	গ̲	ম	প	ধ̲	নি̲।	
(৭)	ভৈরব ঠাট —	সা	রে̲	গ	ম	প	ধ̲	নি।	
(৮)	পূরবী ঠাট —	সা	রে̲	গ	ম॑	প	ধ̲	নি।	
(৯)	তোড়ী ঠাট —	সা	রে̲	গ̲	ম॑	প	ধ̲	নি।	
(১০)	মারবা ঠাট —	সা	রে̲	গ	ম॑	প	ধ	নি।	

সপ্তকে, মধ্য ষড়জ হতে তার-ষড়জ এর মধ্যস্থলের মধ্যে সাত শুদ্ধ ও পাঁচ বিকৃত স্বর এবং সব শ্রুতিগুলিই অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়, কিন্তু ঠাটের ক্ষেত্রে কেবল নির্দিষ্ট সাত স্বরের সমষ্টিই প্রধান। ঠাটের নিম্নরূপ বিশেষত্ব বর্তমান থাকে।

(ক) ঠাটে সাতটি স্বর শুদ্ধ অথবা বিকৃত, যে কোন রূপেই হোক, বর্তমান থাকবে। সাত স্বরের সমষ্টি না হলে ঠাট হবে না। রাগের ক্ষেত্রে সাত স্বরের কম সংখ্যক স্বর হতে পারে ; অর্থাৎ ছয় বা পাঁচ স্বরযুক্ত, কিন্তু ঠাট সর্বদা সাত স্বরযুক্ত হবে। একটি ঠাট হতে একাধিক রাগ রচিত হয় এবং সাত স্বরযুক্ত রাগও পাওয়া যায়। তাই ঠাটে সাত স্বরের বর্তমান না থাকলে, সাত স্বরযুক্ত রাগ সৃষ্টি হবে না।

(খ) ঠাটে রসব্যাঞ্জক সুন্দর রাগ রচিত হবার অবকাশ থাকবে। ঠাটের স্বরসমষ্টি ক্রমানুসারে অর্থাৎ সা রে গ ম প ধ নি হয়। কিন্তু রাগের ক্ষেত্রে স্বরের এই ক্রম নাও থাকতে পারে।

ঠাটে আরোহণ বা অবরোহণ কিছুই থাকে না। (কিন্তু ইহা রাগে প্রযোজ্য) উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতিতে ঠাটে একই স্বর দুই রূপযুক্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয়ে পাশাপাশি ব্যবহৃত হয় না কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় ঠাট পদ্ধতিতে একই স্বর দুই রূপযুক্ত হয়ে পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) ঠাট গান করা হয় না। গাওয়া হয় রাগ। তাই রাগের ক্ষেত্রে আরোহণ অবরোহণ প্রভৃতির দরকার। ঠাটে কেবল স্বরসমষ্টির রূপ দেখে ঠাট পরিচয় করা হয়। যেমন,—'সা রে গ ম প ধ নি'। এই ঠাটের সব স্বরগুলি শুদ্ধ থাকায় 'বিলাবল ঠাট' বলা হবে। বিলাবল ঠাটের পরিচিতির জন্য অন্য কোন নিয়মের প্রয়োজন হয় না।

(ঙ) ঠাট পরিচিতির জন্য প্রতিটি ঠাটের একটি করে নাম নির্দিষ্ট থাকে। ঠাট হতে উৎপন্ন প্রসিদ্ধ রাগটির নামানুসারে সেই ঠাটের নামকরণ করা হয়। যেমন উপরিলিখিত ঠাট হতে উৎপন্ন প্রসিদ্ধ রাগটির নাম বিলাবল। তাই ঠাটটির নামকরণও বিলাবল করা হয়েছে। উত্তর ভারতীয় ঠাট পদ্ধতিতে সব ঠাটগুলির নামকরণ এইভাবে উৎপন্ন প্রসিদ্ধ রাগের নামানুসারেই ঠাটের নাম নির্দিষ্ট হয়েছে।

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে ঠাটের ব্যাখ্যা উপরিউক্তভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতে "মেল পদ্ধতি" পাওয়া যায়। এই মেল, বাহাত্তরটি আছে। দক্ষিণ ভারতীয় বিখ্যাত সঙ্গীতশাস্ত্রকার 'বেঙ্কটমখীর' 'চতুর্দণ্ডি' প্রকাশিকা নামক গ্রন্থে মেল সম্বন্ধে নিম্নরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

ঠাটের উৎপত্তি সম্বন্ধে, যতদূর ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে এরূপ জানা যায় যে, সর্বপ্রথমে লোচন কবিই গ্রাম, মূর্চ্ছনার দ্বারা পরম্পরাগত রাগবর্গীকরণ পদ্ধতি পরিহার করে ঠাট বা মেলের কথা চিন্তা করেন। তিনি রাগগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ ধারা হতে পৃথক করে দ্বাদশটি "জনক মেল বা ঠাট" এবং মোট পঁচাত্তরটি "জন্য রাগের" কথা চিন্তা করেন। লোচনের পর বহুদিন ঠাট বা মেল পদ্ধতির কোন প্রগতি হয়নি। সপ্তদশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে (আনুমানিক ১৬৫৬ খৃঃ) 'হৃদয় নারায়ণদেব' নামে এক সঙ্গীত শাস্ত্রকার 'হৃদয় প্রকাশ ও হৃদয় কৌতুক' নামক গ্রন্থে ঠাট বা মেলের আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু তিনি লোচন কবির পদ্ধতি হতে নিজে কিছু পরিবর্তন করেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মেল বা ঠাটের প্রচলন অধিক মাত্রায় হতে দেখা যায়। এই সময়কার সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ 'সঙ্গীত পরিজাত' ও "রাগতত্ত্ব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিবোধ"। এই গ্রন্থে মেল ও ঠাট সম্বন্ধে বিশেষ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং উনত্রিংশ শ্রুতির এবং একশত দ্বাবিংশ রাগের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথমে, সপ্তকে দ্বাদশ স্বরের অবস্থিতির বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সময়েই শ্রীনিবাসজী তাঁর গ্রন্থে মেল বা ঠাটের সম্যক পরিভাষার বর্ণনা দেন ও ঠাট হতে রাগের উৎপত্তির ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে ঠাটের তিনটি রূপ হয়, যথা—সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব। এইভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ঠাটের সংখ্যা ঠিক কি হবে, তা নিয়ে এক সমস্যার উদ্ভব হয়। এই সময় দক্ষিণ ভারতে, পণ্ডিত সঙ্গীতজ্ঞ বেঙ্কটমখী গাণিতিক হিসাবে মোট বাহাত্তরটি মেলের পরিচয় দেন এবং হিসাবানুসারে তা নির্ভুল ছিল। কোনো কোনো সঙ্গীতজ্ঞের মতে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে বেঙ্কটমখীর "বাহাত্তর ঠাট বা মেল" ঠিক মত প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতের আধার প্রায় এক হওয়ায় "বাহাত্তর মেল বা ঠাট" পদ্ধতিতে রাগ বর্গীকরণ সম্ভব হতে পারে বলে অন্য কোনো কোনো শাস্ত্রকার মনে করেন। মুসলমান প্রভাবে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের রাগে কিছু পরিবর্তন অবশ্য পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক কালে ঠাট পদ্ধতির দ্বারা রাগবর্গীকরণ আরো বৈজ্ঞানিক সম্মত ভাবে হয়েছে। পঃ ভাতখণ্ডেজী, সমগ্র দ্বাদশ স্বরের উপর দশটি ঠাটের রচনা করেছেন, যদিও তিনি অধিক সংখ্যক ঠাটের কথা স্বীকার করেন। লোচন কবি ঠাট পদ্ধতির কথা চিন্তা করেছিলেন এবং এই ঠাট পদ্ধতি সম্পূর্ণ করেন পঃ ভাতখণ্ডেজী এবং তাঁর রচিত দশ ঠাট, সঙ্গীত জগতে আজ স্বীকৃত।

দাক্ষিণাত্যের সঙ্গীত শাস্ত্রকার পঃ বেঙ্কটমখী সপ্তদশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে "চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা" নামক গ্রন্থটি রচনা করেন এবং এই গ্রন্থে তিনি গাণিতিক হিসাবের দ্বারা শুদ্ধ বিকৃত মিলে দ্বাদশ স্বর হতে সর্বাধিক মোট বাহাত্তরটি ঠাটের রচনা করেন এবং প্রত্যেকটি ঠাট হতে জাতিভেদের আধারের উপর ভিত্তি করে মোট চারশত চুরাশীটি রাগ রচনার কথা বর্ণনা করেন। বেঙ্কটমুখীর বাহাত্তর মেল পদ্ধতি, অনুশীলন করার পূর্বে তিনি যে মুখ্য নিয়মগুলির আধারের উপর নির্ভর করেছেন তা অবশ্য জানা দরকার। বেঙ্কটমখীর ঠাট সম্বন্ধে নিম্নোলিখিত কথাগুলিও অবশ্য জানা দরকার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রথম—ঠাট অবশ্যই সম্পূর্ণ হবে, অর্থাৎ সপ্তকের সাতস্বরের বর্তমান অবশ্যই থাকবে এবং সেগুলি শুদ্ধ অথবা বিকৃত যে কোনো রূপযুক্ত হতে পারে ও ক্রমানুসারে অবস্থিত থাকবে। দ্বিতীয়—ঠাট গাওয়া হয় না। তাই ঠাটে রঞ্জকতার কোনো প্রশ্ন উঠে না। একটি স্বরের দুটি রূপ একত্রে ব্যবহৃত হলেও কোনো ক্ষতির কারণ হয় না।

এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই ভালভাবে এর ব্যাখ্যা দরকার। যদি এক দৃষ্টিকোণ হতে অবলোকন করা যায় তো মনে হতে পারে যে, দুটি নিয়ম পরস্পর বিরোধী, কারণ দ্বিতীয় নিয়মানুসারে, যদি কোন এক স্বরের দুটি রূপ নেওয়া হয় এবং তা ক্রমানুসারে থাকে তো সম্পূর্ণ সাত স্বরের গণনা ঠিক রাখতে গেলে মধ্যবর্তি কোন একটি স্বর অবশ্যই বাদ পড়বে। সুতরাং ঠাটের সম্পূর্ণ সাতটি স্বর ব্যবহৃত হতে পারবে না। কারণ কোনো একটি স্বরের দুটি রূপ অর্থাৎ শুদ্ধ ও বিকৃত উভয়ই থাকলে, মধ্যবর্তি একটি স্বরের অবশ্যই বিলোপ হবে। উদাহরণার্থে—হিন্দুস্থানী স্বরসপ্তকের কোনো একটি স্বর যেমন 'গান্ধার'। আর এই গান্ধার স্বরের কোমল এবং শুদ্ধ উভয় রূপই যদি একত্রে একটি ঠাটে থাকে, তবে মোট সাতটি স্বর হতে বাকী থাকে পাঁচটি স্বর এবং এই পাঁচটি স্বরই কেবল গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ ঠাট করতে হলে, একটি গান্ধার স্বর ছাড়া বাকী ছয়টি স্বর ব্যবহৃত হওয়া দরকার। যেমন—সা রে ম প ধ ও নি। কিন্তু সাতটি স্বরের মধ্যে দুটি গান্ধার ব্যবহৃত হওয়ায় এবং পাঁচটি স্বরস্থান খালি থাকায় অন্য যে কোনো একটি স্বর বাদ পড়বেই। যেমন—সা <u>গ</u> গ ম প ধ নি। অর্থাৎ গান্ধার দুটি রূপযুক্ত থাকায় এবং ঋষভ বাদ পড়ায় এই ঠাটে মোট সাতটি স্বর পাওয়া গেল। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে এই ঠাটটি সম্পূর্ণ হল না। কারণ এই ঠাটে সম্পূর্ণ সাত প্রকারের স্বরের বর্তমান নেই। অর্থাৎ ঋষভ স্বরটি বাদ আছে। সুতরাং এই ঠাটে উপরিউক্ত প্রথম নিয়মের আবশ্যকীয় নিয়মটি পালিত হল না। এইভাবে উভয় নিয়ম পরস্পর বিরোধী বলা যায়। কিন্তু এই বিরোধের নিরসন অবশ্য করা যায়। বেঙ্কটমখী বাস্তব ক্ষেত্রে স্বরের যে নামগুলি ব্যবহার করেছেন বা নামকরণের যে বিশেষত্ব আছে, তার দ্বারাই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। পূর্বে কর্ণাটকী স্বরপদ্ধতির নামের সাথে হিন্দুস্থানী স্বরনামের যে মিল দেখানো হয়েছে সেদিকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টি অনেকটা পরিষ্কার বোধ হতে পারে। বেঙ্কটমখী কৃত বারটি স্বরের নাম কর্ণাটকী স্বরনামানুসারে ব্যবহার করেছেন অথবা ওই স্বরের নামগুলি মুখ্যতঃ গ্রহণ করেছেন বলা যেতে পারে। কেবলমাত্র এক অন্তর দেখা যায় এই যে, কর্ণাটকী আধুনিক স্বরসপ্তকের সাধারণ গান্ধারের দ্বিতীয় নামকরণে ষটশ্রুতি ঋষভ বলা আছে এবং কৈশিক নিষাদের দ্বিতীয় নাম ষটশ্রুতি ধৈবৎ। কিন্তু বেঙ্কটমখীর সাধারণ গান্ধার ও কৈশিক নিষাদকে যথাক্রমে পঞ্চশ্রুতি ঋষভ ও পঞ্চশ্রুতি ধৈবৎ বলেছেন। বেঙ্কটমুখী কর্ণাটকী সঙ্গীত পদ্ধতিরই পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ এই পরিবর্তনটুকু ঘটেছিল, তা বলা কঠিন। তবে এই পার্থক্যটুকু বিশেষ কিছু পরিবর্তন নয় বলে মনে করলে ভুল হবে না। এখন উপরিউক্ত সমস্যা সমাধান করার জন্য যেটুকু জ্ঞান অবশ্য থাকা চাই, তা হল যে, বেঙ্কটমখী, যে ঠাটে একটি স্বরের উভয় রূপ গ্রহণ করেছেন তা হল গান্ধার বা নিষাদের এবং ঋষভ বা ধৈবতের উভয় রূপ। এরূপ ব্যবহারের সময় গান্ধারের এক রূপকে চতুঃশ্রুতি বা পঞ্চশ্রুতি ঋষভ এবং অন্য রূপটিকে সাধারণ গান্ধার বা অন্তর গান্ধারের সমান ধরা হয়। এইভাবে উভয় নিষাদকে একটি ঠাটে রাখার সময় একটিকে চতুঃশ্রুতি ধৈবৎ বা পঞ্চশ্রুতি ধৈবৎ এবং দ্বিতীয় রূপকে কৈশিক বা কাকলী নিষাদ বলা হয়। এইভাবে ঠাটের মধ্যে সাত স্বরের উপস্থিতি মানা হয়েছে।

অতএব বেঙ্কটমখীর ঠাটের বিষয়ে যে দুটি নিয়মের উল্লেখ আছে তার মধ্যে দ্বিতীয় নিয়মটি সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হয়নি। তাই যদি একটু পরিবর্তন করে, এই বলা যায় যে, ঠাটের মধ্যে ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম এই স্বরগুলি অবশ্যই থাকবে এবং বাকী চারটি স্বর ঋষভ, গান্ধার, ধৈবৎ ও নিষাদ-এর যে কোনটি নির্বাচন করা যেতে পারে। তবেই নিয়মটি সম্পূর্ণ সিদ্ধ হবে বলে মনে হয়।

এখন বেঙ্কটমখীর "চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা" গ্রন্থে সপ্তকে কিভাবে বাহাত্তর প্রকার মেলের বা ঠাটের উৎপত্তি হয়েছে, নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া হল।

সর্বপ্রথমে দ্বাদশ স্বরের পূর্ণ স্বরসপ্তক গ্রহণ করা হল—

সা রে রে গ গ ম ম প ধ ধ নি নি।

এই দ্বাদশ স্বর হ'তে "তীব্র মধ্যম" স্বরটিকে পৃথক করা হল। যথা—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সা রে রে গ গ ম প ধ ধ নি নি।

অর্থাৎ মোট একাদশটি স্বর পাওয়া গেল। এর সাথে তার সপ্তকের ষড়জকে যুক্ত করা হল। এখন পুরা সপ্তককে দুভাগে বিভক্ত করা হল যেমন—

সা রে রে গ গ ম । প ধ ধ নি নি সা।

প্রথম ভাগ ষড়জ হতে মধ্যম স্বর পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়ভাগ পঞ্চম হতে তার ষড়জ পর্যন্ত। এই এক একটি ভাগকে পূর্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ বলা হয়েছে। পূর্বার্দ্ধে ছয়টি স্বর এবং উত্তরার্দ্ধে বাকী ছয়টি স্বর পাওয়া যায়, অবশ্য স্বরগুলি শুদ্ধ ও বিকৃত রূপ সমেত।

এখন ঠাটের মধ্যে তার ষড়জ যুক্ত হওয়ায় মোট আটটি স্বর পাওয়া গেল। অতএব পূর্বার্দ্ধের চারিটি স্বর নির্বাচন করা হল এবং উত্তরার্দ্ধের চারিটি স্বর গ্রহণ করা হল। পূর্বার্দ্ধের একটি অংশ, উত্তরার্দ্ধের আরেকটি অংশ যুক্ত হয়ে, এক একটি সম্পূর্ণ "ঠাটে" পরিণত হয়। পূর্বার্দ্ধ হতে যে চারিটি স্বরসমূহ রচিত হয়, তাকে ঠাট বা "মেল পূর্বার্দ্ধ বা পূর্বমেলার্দ্ধ" এবং এইভাবে উত্তরার্দ্ধের যে চারিটি স্বরসমূহ পাওয়া যায় তাকে ঠাট বা "মেল উত্তরার্দ্ধ বা উত্তর মেলার্দ্ধ" বলা হয়।

নিম্নে যে তালিকা দেওয়া হল তার থেকে আমাদের ধারণা আরো স্পষ্ট হবে যে, কি ভাবে পূর্বমেলার্দ্ধ ও উত্তর মেলার্দ্ধ রচিত হয়। চারটি স্বরসমষ্টির, ছয়টি পূর্বমেলার্দ্ধ ও ছয়টি উত্তর মেলার্দ্ধ রচিত হয়েছে এবং তার অধিক কিছু সম্ভব নয়।

পূর্বার্দ্ধ	। ম	উত্তরার্দ্ধ
সা রে রে গ গ ম		প ধ ধ নি নি সা

পূর্বমেলার্দ্ধ	উত্তরমেলার্দ্ধ
১। সা রে রে ম	১। প ধ ধ সা
২। সা রে গ ম	২। প ধ নি সা
৩। সা রে গ ম	৩। প ধ নি সা
৪। সা রে গ ম	৪। প ধ নি সা
৫। সা রে গ ম	৫। প ধ নি সা
৬। সা গ গ ম	৬। প নি নি সা

উপরিউক্ত তালিকার মধ্যে পূর্বমেলার্দ্ধের প্রথমটির সাথে উত্তর মেলার্দ্ধের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

একটির পর একটি যুক্ত করলে মোট ছটি সম্পূর্ণ ঠাট বা মেল পাওয়া যায়। পূর্বমেলার্দ্ধে দ্বিতীয়টির সাথে, তারপর উত্তরমেলার্দ্ধের ছয়টি স্বরসমষ্টি, আবার সংযুক্ত হলে আরো নতুন ছয়টি ঠাট বা মেলের উৎপত্তি হয়। প্রভৃতি এইভাবে পূর্বমেলার্দ্ধের প্রতিটি অংশের সাথে উত্তরমেলার্দ্ধের প্রতিটির সংযুক্তি হলে ছয়×ছয়=ছত্রিশটি "ঠাট বা মেলের" উৎপত্তি হয়। তারপর শুদ্ধ মধ্যমকে পরিত্যাগ করে তীব্র মধ্যমের সহায়তা গ্রহণ করে আরো নতুন ছত্রিশটি ঠাট বা মেল পাওয়া যায়, এবং এইভাবে মোট বাহাত্তরটি নতুন মেল বা ঠাটের সৃষ্টি করেছেন "বেঙ্কটমখী"।

উপরিউক্ত সব ঠাটগুলির মধ্যেই ষড়জ, মধ্যমও পঞ্চম স্বরগুলি বর্তমান আছে দেখা যায়। প্রথম হতে ষষ্ঠ পূর্বমেলার্দ্ধ ও প্রথম হতে ষষ্ঠ উত্তর মেলার্দ্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এবং হিন্দুস্থানী স্বরের নামানুসারে বিচার করলে, যে ঠাটে এক স্বরের দুটি রূপ বর্তমান, সেখানে কোনো না কোনো একটি স্বর নিশ্চিত বাদ পড়েছে মনে হয়। কিন্তু কর্ণাটকী স্বরের নামকরণের মাধ্যমে, যদি দেখা যায়, তবে সব মেলার্দ্ধগুলিই যে সম্পূর্ণতা প্রমাণিত হয়। নিম্নে প্রদত্ত তুলনামূলক নামগুলি হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে।

	হিন্দুস্থানী		কর্ণাটক
পূর্বমেলার্দ্ধ	(১) সা <u>রে</u> রে ম	=	"সা", শুদ্ধ "রে", শুদ্ধ "গ" ও "ম"
	(২) সা <u>গ</u> গ ম	=	"সা", ষটশ্রুতি "রে", অন্তর "গ" ও "ম"
উত্তরমেলার্দ্ধ	(১) প <u>ধ</u> ধ সা	=	"প", শুদ্ধ "ধ", শুদ্ধ "নি", "সা"
	(২) প <u>নি</u> নি সা	=	"প", ষটশ্রুতি "ধ", কাকলী "নি", "সা"

বেঙ্কটমখীর "চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা" নামক গ্রন্থে বাহাত্তর মেলের নিম্নরূপ নাম পাওয়া যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

১। কনকাম্বরী
২। ফেনুদ্যুতি
৩। সামবরালী
৪। ভানুমতি
৫। মনোরঞ্জনী
৬। তনুকীর্তি
৭। সেনাগ্রণী
৮। তোড়ী
৯। ভিন্নষড়জ
১০। নটাভরণ
১১। কোকিলরব
১২। রূপবতী
১৩। হেজুজ্জী
১৪। বসন্ত ভৈরবী
১৫। মায়া মালব গৌল
১৬। বেগবাহিনী
১৭। ছায়াবতী
১৮। শুদ্ধমালবী
১৯। ঝংকার ভ্রমরী
২০। রীতি গৌল
২১। কিরণাবলী
২২। শ্রীরাগ
২৩। গৌরী বেলাবলী
২৪। বীর বসন্ত
২৫। শরাবতী
২৬। তরঙ্গিনী
২৭। সৌরসেনা
২৮। কেদারগৌল
২৯। শংকরাভরণ
৩০। নাগাভরণ
৩১। কলাবতী
৩২। চুড়ামণি
৩৩। গঙ্গা তরঙ্গিনী
৩৪। ছায়ানট
৩৫। দেশাক্ষী
৩৬। চলনাট
৩৭। সৌগন্ধিনী
৩৮। জগমোহিনী
৩৯। বরালিকা
৪০। নভোমণী
৪১। কুন্তিনী
৪২। রবিক্রিয়া
৪৩। গীর্বাণী
৪৪। ভবানী
৪৫। শৈবপন্তবরালী
৪৬। স্তবরাজ
৪৭। সৌবীরা
৪৮। জীবন্তিকা
৪৯। ধবলাঙ্গ
৫০। নামদেশী
৫১। রামক্রিয়া
৫২। রমামনোহরী
৫৩। গমকক্রিয়া
৫৪। বর্ণাবতী
৫৫। শামলা
৫৬। চামরা
৫৭। সমদ্যুতি
৫৮। সিংহরবা
৫৯। ধামবতী
৬০। নৈষধ
৬১। কুন্তল
৬২। রতিপ্রিয়া
৬৩। গীতপ্রিয়া
৬৪। ভূষাবতী
৬৫। শান্তকল্যাণ
৬৬। চতুরঙ্গিনী
৬৭। সন্তান মঞ্জরী
৬৮। জ্যোতি
৬৯। ধৌত পঞ্চম
৭০। নাসামণি
৭১। কুসুমাকর
৭২। রসমঞ্জরী

পঃ বেঙ্কটমখীর পর কর্ণাটক সঙ্গীতে আরো একটি মূল্যবান গ্রন্থ পাওয়া যায় তার নাম "রাগলক্ষণম্"। এই গ্রন্থের রচয়িতাও বাহাত্তর মেলের বা ঠাটের কথা মেনেছিলেন এবং এই ঠাটগুলি হতে পাঁচশত রাগের উৎপত্তি সূচিত করেন। এই গ্রন্থে প্রচলিত বাহাত্তর মেল বা ঠাট বর্তমান কর্ণাটক সঙ্গীত পদ্ধতিতে প্রচলিত এবং কর্ণাটক সঙ্গীতের আধার গ্রন্থ বলে জানা যায়।

"রাগ লক্ষণম্" গ্রন্থে এবং "চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা" গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে স্বরস্থানের কিছু প্রভেদ দৃষ্ট হয়। হিন্দুস্থানী দ্বাদশ স্বর, বেঙ্কটমখীর দ্বাদশ স্বর ও রাগলক্ষণম্ গ্রন্থের দ্বাদশ স্বর এর পাশাপাশি তুলনামূলক নমুনা নিম্নে দেওয়া হল।—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হিন্দুস্থানী স্বর	বেঙ্কটমখীর স্বর	রাগলক্ষণের স্বর
১। সা	সা	সা
২। রে̱ (কোমল)	শুদ্ধ রে	শুদ্ধ রে
৩। রে (শুদ্ধ)	পঞ্চশ্রুতি রে বা শুদ্ধ গ	চতুশ্রুতি রে বা শুদ্ধ গ
৪। গ̱ (কোমল)	ষটশ্রুতি রে বা সাধারণ গ	ষটশ্রুতি রে বা সাধারণ গ
৫। গ (শুদ্ধ)	অন্তর গ	অন্তর গ
৬। ম (শুদ্ধ)	শুদ্ধ, ম	শুদ্ধ ম
৭। ম (তীব্র)	প্রতিম বা বরালী ম	প্রতি ম
৮। প	প	প
৯। ধ̱ (কোমল)	শুদ্ধ ধ	শুদ্ধ ধ
১০। ধ (শুদ্ধ)	পঞ্চশ্রুতি ধ, বা শুদ্ধ নি	চতুশ্রুতি ধ, বা শুদ্ধ নি
১১। নি̱ (কোমল)	ষটশ্রুতি ধ বা কৈশিক নি	ষটশ্রুতি ধ, বা কৈশিক নি
১২। নি (শুদ্ধ)	কাকলী নি	কাকলী নি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এবার নিম্নে কর্ণাটক সঙ্গীতে বর্তমানে, "রাগলক্ষণম্" গ্রন্থের, যে বাহাত্তর মেল প্রচলিত আছে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ হল।—এই বাহাত্তর মেলে বা ঠাটে বেঙ্কটমুখীর "চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা" গ্রন্থের বাহাত্তর মেল ঠাটের সাথে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। পূর্বে "চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকার" বাহাত্তর মেলের নামের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তার সাথে নিম্নে প্রদত্ত তালিকার তুলনা করলেই বোঝা যাবে। যথা—

"রাগলক্ষণম্" গ্রন্থের বাহাত্তর মেল বা ঠাটের তালিকা—

১।	কনকাঙ্গী—	সা	রে	রে	ম	প	ধ	ধ।	
২।	রত্নাংগী—	সা	রে	রে	ম	প	ধ	নি।	
৩।	গানমূর্তি—	সা	রে	রে	ম	প	ধ	নি।	
৪।	বনস্পতি—	সা	রে	রে	ম	প	ধ	নি।	
৫।	মানবতী—	সা	রে	রে	ম	প	ধ	নি।	
৬।	তানরূপী—	সা	রে	রে	ম	প	নি	নি।	
৭।	সেনাবতী—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	ধ।	
*৮।	হনুমত্তোড়ী—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	(ভৈরবী ঠাট)
৯।	ধেনুকা—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	
১০।	নাটক প্রিয়—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	
১১।	কোকিল প্রিয়—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	
১২।	রূপবতী—	সা	রে	গ	ম	প	নি	নি।	
১৩।	গায়ক প্রিয়—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	ধ।	
১৪।	বকুলাভরণ—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	
*১৫।	মায়ামালব গৌল	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	(ভৈরব ঠাট)
১৬।	চক্রবাক—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	
১৭।	সূর্যকান্ত—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	
১৮।	হাটকাম্বরী—	সা	রে	গ	ম	প	নি	নি।	
১৯।	ঝংকার ধ্বনি—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	ধ।	
*২০।	নটভৈরবী—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	(আশাবরী ঠাট)
২১।	কীরবাণী—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	
*২২।	খরহরপ্রিয়—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	(কাফীঠাট)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

২৩।	গৌরীমনোহরী	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।		
২৪।	বরুণপ্রিয় —	সা	রে	গ	ম	প	নি	নি।		
২৫।	মাররংজনী —	সা	রে	গ	ম	প	ধ	ধ।		
২৬।	চারুকেশী —	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।		
২৭।	সারসাংগী —	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।		
*২৮।	হরিকাম্বোজী	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	(খাম্বাজ ঠাট)
*২৯।	ধীরশংকরাভরণ	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	(বিলাবল ঠাট)
৩০।	নাগানন্দিনী —	সা	রে	গ	ম	প	নি	নি।		
৩১।	যাগপ্রিয়া —	সা	গ	গ	ম	প	ধ	ধ।		
৩২।	রাগবর্ধিনী —	সা	গ	গ	ম	প	ধ	নি।		
৩৩।	গাঙ্গেয়ভূষণা —	সা	গ	গ	ম	প	ধ	নি।		
৩৪।	বাগধীশ্বরী —	সা	গ	গ	ম	প	ধ	নি।		
৩৫।	শূলিনী —	সা	গ	গ	ম	প	ধ	নি।		
৩৬।	চলনাট —	সা	গ	গ	ম	প	নি	নি।		
৩৭।	সালগ —	সা	রে	রে	ম	প	ধ	ধ।		
৩৮।	জালার্ণব —	সা	রে	রে	ম	প	ধ	নি।		
৩৯।	ঝালবরালী —	সা	রে	রে	ম	প	ধ	নি।		
৪০।	নবনীত —	সা	রে	রে	ম	প	ধ	নি।		
৪১।	পাবনী —	সা	রে	রে	ম	প	ধ	নি।		
৪২।	রঘুপ্রিয় —	সা	রে	রে	ম	প	নি	নি।		
৪৩।	গবাঁবোধী —	সা	রে	গ	ম	প	ধ	ধ।		
৪৪।	ভবপ্রিয় —	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।		
*৪৫।	শুভপন্তুবরালী—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	(তোড়ী ঠাট)
৪৬।	ষড়বিধমার্গিনী—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।		
৪৭।	সুবর্ণাঙ্গী —	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।		
৪৮।	দিব্যমণি —	সা	রে	গ	ম	প	নি	নি।		
৪৯।	ধবলাম্বরী —	সা	রে	গ	ম	প	ধ	ধ।		
৫০।	নামনারায়ণী—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।		
৫১।	কামবর্দ্ধনী —	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	(পূরবী ঠাট)

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri
Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৫২।	রামপ্রিয়	—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	
*৫৩।	গমণশ্রিয়	—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	(মারবা ঠাট)
৫৪।	বিশ্বম্ভরী	—	সা	রে	গ	ম	প	নি	নি।	
৫৫।	শ্যামলাঙ্গী	—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	ধ।	
৫৬।	ষন্মুখ প্রিয়	—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	
৫৭।	সিংহেন্দ্রমধ্যম	—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	
৫৮।	হৈমবতী	—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	
৫৯।	ধর্মবতী	—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	
৬০।	নীতিমণী	—	সা	রে	গ	ম	প	নি	নি।	
৬১।	কাংতামণী	—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	ধ।	
৬২।	ঋষভপ্রিয়	—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	
৬৩।	লতাংগী	—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	
৬৪।	বাচস্পতি	—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	
*৬৫।	মেচকল্যাণী	—	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি।	(কলাণ ঠাট)
৬৬।	চিত্রাম্বরী	—	সা	রে	গ	ম	প	নি	নি।	
৬৭।	সুচরিত্র	—	সা	গ	গ	ম	প	ধ	ধ।	
৬৮।	জ্যোতিঃস্বরূপিনী		সা	গ	গ	ম	প	ধ	নি।	
৬৯।	ধাতুবর্ধিনী	—	সা	গ	গ	ম	প	ধ	নি।	
৭০।	নাসিকাভূষণী		সা	গ	গ	ম	প	ধ	নি।	
৭১।	কোসল	—	সা	গ	গ	ম	প	ধ	নি।	
৭২।	রসিকপ্রিয়া	—	সা	গ	গ	ম	প	নি	নি।	

উপরিউক্ত বাহাত্তর ঠাট হতে তারকা চিহ্নিত ঠাট সংখ্যা অষ্টম, পঞ্চদশ, বিংশ, দ্বাবিংশ, অষ্টবিংশ, উনত্রিংশ, পঞ্চচত্বারিংশ, একপঞ্চাশত্তম, ত্রিপঞ্চাশত্তম, ও পঞ্চষষ্টত্তম প্রভৃতি সংখ্যার ঠাটগুলি বর্তমান উত্তর ভারতীয় দশঠাট যথাক্রমে —ভৈরবী, ভৈরব, আশাবরী, কাফী, খাম্বাজ, বিলাবল, তোড়ী, পূরবী, মারবা ও কল্যাণ প্রভৃতির সমান দেখা যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিম্নের তালিকা হতে তুলনাটি আরো পরিষ্কার বোঝা যাবে।

হিন্দুস্থানী দশ ঠাট	দক্ষিণ পদ্ধতির মেল ও সংখ্যা	
১। কল্যাণ	মেচকল্যাণী	(৬৫)
২। বিলাবল	ধীরশংকরাভরণ	(২৯)
৩। খাম্বাজ	হরি কাম্বোজী	(২৮)
৪। ভৈরব	মায়া মালব গৌল	(১৫)
৫। পূর্বী	কাম বর্দ্ধিণী	(৫১)
৬। মারবা	গমনশ্রিয়া	(৫৩)
৭। কাফী	খরহরপ্রিয়	(২২)
৮। আশাবরী	নটভৈরবী	(২০)
৯। ভৈরবী	হনুমত্তোড়ী	(৮)
১০। তোড়ী	শুভপন্তুবরালী	(৪৫)

দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরের নামানুসারে এবং ঠাটের বা মেলের নিয়মানুসারে গাণিতিক হিসাবে বাহাত্তর মেল বা ঠাট রচিত হতে পারে। কিন্তু হিন্দুস্থানী বা উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে ঐরূপ প্রথায় মেল বা ঠাট নির্ণয় করা যাবে না। কারণ ঠাটের নিয়ম বজায় রাখতে হলে এবং গানিতিক হিসাবে মেল বা ঠাট নির্ণয় করতে গেলে পূর্ব মেলার্দ্ধের প্রথম ও ষষ্ঠ সংখ্যক স্বর রচনা সমূহকে বাদ দিতে হবে। কারণ হিন্দুস্থানী বা উত্তর ভারতীয় ঠাট পদ্ধতিতে কোমল ঋষভ ও শুদ্ধ ঋষভ এবং কোমল গান্ধার ও শুদ্ধ গান্ধার একত্রে ব্যবহারের নিয়ম নেই। সুতরাং পূর্বমেলার্দ্ধের দুই, তিন, চার ও পাঁচ স্বর রচনা সমূহ ও উত্তর মেলার্দ্ধের দুই, তিন, চার ও পাঁচ স্বর রচনা সমূহ অর্থাৎ পূর্বমেলার্দ্ধের চারিটি ও উত্তর মেলার্দ্ধের চারিটি স্বর রচনা গ্রহণ করে একটির সাথে অন্যটি সংযুক্ত করলে মোট ষোলটি শুদ্ধ মধ্যমযুক্ত মেল বা ঠাট এবং আরো মোট ষোলটি তীব্রমধ্যমযুক্ত, সর্বসমেত বত্রিশটি মেল বা ঠাট পাওয়া যাবে। উত্তরমেলার্দ্ধে কোমল ধৈবৎ ও শুদ্ধ ধৈবৎ এবং কোমল নিষাদ ও শুদ্ধ নিষাদ একত্রে ঠাটের নিয়মানুসারে ব্যবহার নিষিদ্ধ। তাই উত্তর মেলার্দ্ধের প্রথম ও ষষ্ঠ স্বর রচনাগুলি বাদ পড়ে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত-পদ্ধতি অনুসারে মোট দ্বাদশ স্বরের মধ্যে দ্বাত্রিংশ ঠাট, নিম্নরূপে পাওয়া যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বরসমষ্টির প্রথম ভাগ	স্বরসমষ্টির দ্বিতীয় ভাগ
১। সা রে গ ম	১। প ধ নি সা
২। সা রে গ ম	২। প ধ নি সা
৩। সা রে গ ম	৩। প ধ নি সা
৪। সা রে গ ম	৪। প ধ নি সা

এই ভাবে প্রথম চারটি স্বর রচনার সাথে দ্বিতীয় চারটি স্বর রচনা একত্রে মিলাইলে শুদ্ধ মধ্যমযুক্ত চার × চার ষোলটি মেল বা ঠাট উৎপন্ন হবে এবং এই ভাবে তীব্র মধ্যম যুক্ত করে আরো ষোলটি মেল বা ঠাটের উৎপত্তি হবে। নিম্নের চিত্রে বিষয়টি আরো স্পষ্ট বোঝা যাবে।

শুদ্ধ মধ্যম যুক্ত ষোলটি মেল বা ঠাট।

*১। সা রে গ ম প ধ নি সা	৫। সা রে গ ম প ধ নি সা
২। সা রে গ ম প ধ নি সা	*৬। সা রে গ ম প ধ নি সা
৩। সা রে গ ম প ধ নি সা	৭। সা রে গ ম প ধ নি সা
৪। সা রে গ ম প ধ নি সা	৮। সা রে গ ম প ধ নি সা
*৯। সা রে গ ম প ধ নি সা	১৩। সা রে গ ম প ধ নি সা
১০। সা রে গ ম প ধ নি সা	১৪। সা রে গ ম প ধ নি সা
*১১। সা রে গ ম প ধ নি সা	*১৫। সা রে গ ম প ধ নি সা
১২। সা রে গ ম প ধ নি সা	*১৬। সা রে গ ম প ধ নি সা

উপরোল্লিখিত মেল বা ঠাটে কেবলমাত্র শুদ্ধ মধ্যম স্বরের ব্যবহার করে ষোলটি মেল বা ঠাট পাওয়া গেল। ঠিক এই পদ্ধতি অনুসারে শুদ্ধ মধ্যমের পরিবর্তে যদি কেবলমাত্র তীব্রমধ্যম রাখা যায় তবে আরো ষোলটি নূতন মেল বা ঠাট পাওয়া যাবে। নিম্নের চিত্রে স্বর রচনাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যেমন—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তীব্রমধ্যমযুক্ত	বাকী ষোলটি মেল বা ঠাট
১। সা রে গ ম প ধ নি সা	৫। সা রে গ ম প ধ নি সা
*২। সা রে গ ম প ধ নি সা	*৬। সা রে গ ম প ধ নি সা
৩। সা রে গ ম প ধ নি সা	৭। সা রে গ ম প ধ নি সা
৪। সা রে গ ম প ধ নি সা	৮। সা রে গ ম প ধ নি সা
৯। সা রে গ ম প ধ নি সা	১৩। সা রে গ ম প ধ নি সা
১০। সা রে গ ম প ধ নি সা	১৪। সা রে গ ম প ধ নি সা
১১। সা রে গ ম প ধ নি সা	১৫। সা রে গ ম প ধ নি সা
১২। সা রে গ ম প ধ নি সা	*১৬। সা রে গ ম প ধ নি সা

এই ভাবে ষোলটি শুদ্ধ মধ্যমযুক্ত ও ষোলটি তীব্র মধ্যমযুক্ত ঠাট মিলে মোট বত্রিশটি ঠাট বা মেল পাওয়া যায় এবং " * " এরূপ চিহ্নিতগুলি বর্তমান দশ ঠাটের বা মেলের সমান। যেমন শুদ্ধ মধ্যমযুক্ত ষোলটি মেলের মধ্যে প্রথমটি ভৈরবী, ষষ্ঠটি ভৈরব, নবমটি আসাবরী, একাদশটি কাফী, পঞ্চদশটি খাম্বাজ, ষষ্ঠদশটি বিলাবল এবং তীব্র মধ্যমযুক্ত ষোলটির মধ্যে দ্বিতীয়টি তোড়ী, ষষ্ঠটি পূরবী, অষ্টমটি মারবা ও ষষ্ঠদশটি কল্যাণ প্রভৃতি হিন্দুস্থানী দশ ঠাটের সমান।

হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে যদিও উপরিউক্তভাবে বত্রিশ ঠাট পাওয়া যায়, কিন্তু এই পদ্ধতির ঠাট নির্ণয় হিসাব সর্বপ্রথম বেঙ্কটমখীই দেখান এবং সেজন্য বেঙ্কটমখীর বাহাত্তর মেল বা ঠাট সর্বদাই গ্রহণ যোগ্য। কিন্তু হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী সঙ্গীতে স্বরসংস্থানের পার্থক্য থাকায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। পরবর্তি যুগে পঃ ভাতখণ্ডেজী যে দশ ঠাটের প্রচলন করেন সে সম্বন্ধে পুরাতন ঠাটের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার দরকার। এই দশ ঠাটের দ্বারা সমগ্র উত্তর ভারতীয় রাগগুলির বর্গীকরণ হয়েছে। এই দশ ঠাটকেও তিনটি বর্গে বিভাজিত করা যেতে পারে। যেমন, ঋষভ, গান্ধার ও ধৈবৎ শুদ্ধ স্বরযুক্ত রাগের জন্য কল্যাণ বিলাবল ও খাম্বাজ ঠাট। ঋষভ, কোমল ও গান্ধার, নিষাদ শুদ্ধ স্বরযুক্ত রাগের জন্য ভৈরব, মারবা ও পূরবী প্রভৃতি ঠাট। এবং গান্ধার ও নিষাদ কোমল স্বরযুক্ত রাগের জন্য কাফী, ভৈরবী,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আশাবরী ও তোড়ী প্রভৃতি ঠাট বর্গীকরণ করা যেতে পারে। এইভাবে দশ ঠাটের অন্তর্গত উত্তর ভারতীয় সব রাগগুলিকে, পঃ ভাতখণ্ডেজী অন্তরভুক্ত করেছেন। বাকী ঠাটগুলিকে গ্রহণ করেন নি। ঠাট সম্বন্ধীয় আলোচনা বর্তমানে নানা গ্রন্থে এই পর্যন্ত হয়েছে।

বর্ণ—স্বরের বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াত্মক প্রয়োগকে "বর্ণ" বলা হয়। বর্ণ চার প্রকার। যেমন—স্থায়ী, আরোহী অবরোহী ও সঞ্চারী। এক স্বরে বারবার গাওয়া বা বাজানোকে "স্থায়ী বর্ণ" বলা হয়। যেমন—সা, সা, সা, প্রভৃতি। স্বরের ক্রমানুসার আরোহণকে "আরোহী বর্ণ" বলে। যেমন—সা রে গ ম প ধ নি প্রভৃতি। স্বরের ক্রমানুসারে অবরোহণকে "অবরোহী বর্ণ" বলে। যেমন—র্সা নি ধ প ম প্রভৃতি। (তার-সপ্তকের সা এর মাথায় বিন্দু আছে) উপরিউক্ত স্থায়ী, আরোহী বর্ণগুলি মিলিত হয়ে "সঞ্চারী বর্ণ" হয়। যেমন সা রে গ ম প ম গ রে ম ম ম প প প প্রভৃতি। সঙ্গীতে স্বর বিন্যাসের ক্রিয়াই প্রধান তাই "বর্ণ" উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

অলঙ্কার—স্বরের নিয়মবদ্ধ এক বিশিষ্ট রচনাকে "অলঙ্কার" বলা হয়। অলঙ্কারের মধ্যেও বর্ণের বিশেষ স্থান আছে। কিন্তু ইহার আরোহণ ও অবরোহণ, এই দুই চলনেই এক বিশেষ নিয়মের অনুগামী হতে হয়। চার প্রকার বর্ণের সাথে অলঙ্কার বিশেষভাবে যুক্ত থাকে। কোনো কিছু গাইতে হলে এই চারি বর্ণের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। আজকাল অলঙ্কারকে কেহ কেহ "পাল্টা" বলে থাকেন। কারণ, অলঙ্কার শব্দের অর্থ গহনা এবং পল্টার সাহায্যে গানে সৌন্দর্য যুক্ত হয় তাই পাল্টাকেঅলঙ্কারের পর্যায়ে বলেন। পুরাতন গ্রন্থে "অলঙ্কার" শব্দের অর্থ আরো কিছু তত্ত্বমূলক আছে এবং বিশেষ কিছু স্বরবিন্যাস পদ্ধতি, অলঙ্কারের মধ্যে পড়ে। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের পাল্টা সাধনার দ্বারা কণ্ঠের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করান হয় এবং রাগ বিস্তারের ব্যাপারে সহায়তা হয়।

সঙ্গীত পারিজাত শাস্ত্রে অলঙ্কারের তিরানব্বইটি জাতির উল্লেখ আছে এবং রত্নাকরের গ্রন্থে চৌত্রিশ প্রকারের কথা বর্ণিত আছে। এই অলঙ্কারগুলি চারিটি বর্ণের অন্তর্গত এবং প্রত্যেকটি অলঙ্কারের পৃথক নামকরণ পাওয়া যায়। নিম্নে সঙ্গীত পারিজাত গ্রন্থের অলঙ্কারগুলির নাম ও স্বরবিন্যাস

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রদত্ত হল।—

স্থায়ী বর্ণ অলঙ্কার

১। ভদ্র—সারেসা, রেগরে, গমগ, মপম, পধপ, ধনিধ, নিসানি, সারেসা।

২। নন্দ—সাসারেরেসাসা, রেরেগগরেরে, গগমমগগ, মমপপমম, পপধধপপ, ধধনিনিধধ, নিনিসাসানিনি, সাসারেরেসাসা।

৩। জিত—সাগরেসা, রেমগরে, গপমগ,মধপম, পনিধপ, ধসানিধ, রেসানি, সাগরেসা।

৪। সোম—সাসাগগরেরেসাসা, রেরেমমগগরেরে, গগপপমমগগ, মমধধপপমম, পপনিনিধধপপ, ধধসাসানিনিধধ, নিরেরেসাসানিনি, সাসাগগরেরেসাসা।

৫। গ্রীবা—সাগরেগমগরেসা, রেমগমপমগরে, গপমপধপমগ, নিমধপধনিধপম, পনিধমিসানিধপ, ধসানিসারেসানিধ, নিরেসারেগরেসানি, সাগরেগমগরেসা।

৬। ভাল—সাগরেম, মগরেসা, রেমগপ, পমগরে, গপমধ, ধপমগ, মধপনি, নিধপম, পনিধসা, সানিধপ, ধসানিরে, রেসানিধ, নিরেসাগ, গরেসানি, সাগরেম, মগরেসা।

৭। প্রকাশ—সাসারেরেগগ, মগরেগরেসা, রেরেগগমম, পমগমগরে গগমমপপ, ধপমপমগ, মমপপধধ, নিধপ ধপম, নিপপধধনিনি, সানিধনিধপ, ধধনিনিসাসা, রেসামিসানিধি, নিনিসাসারেরে, গরেসারেসানি, সাসারেরগগ মগরেগরেসা।

আরোহী বর্ণ অলঙ্কার

১। বিস্তীর্ণ—সারেগমপধনিসা।

২। নিষ্কর্ষ—সাসা, রেরে, গগ, মম, পপ, ধধ, নিনি, সাসা।

৩। গাত্রবর্ণ—সাসাসা, রেরেরে, গগগ, মমম, পপপ, ধধধ, নিনিনি সাসাসা।

৪। বিন্দু—সাসাসারে, রেরেরেগ, গগগম, মমমপ, পপপধ, ধধধনি, নিনিনিসা।

৫। অভিউচ্চয়—সাগ, রেম, গপ, মধ, পনি, ধসা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৬। হসিত—সা, সারে, সারেগ, সারেগম, সারেগমপ, সারেগমপধ, সারেগমপধনি, সারেগমপধনিসা।

৭। প্রেঙ্খিত—সারে, রেগ, গম, মপ, পধ, ধনি, নিসা।

৮। প্রচ্ছাদন—সারেগ, রেগম, গমপ মপধ, পধনি, ধনিসা।

৯। উদ্গীত—সাসারেগ, রেরেগম, গগমপ, মমপধ, পপধনি, ধধনিসা।

১০। উদ্বাহিত—সাসাসাসারেগম রেরেরেরেগমপ, গগগগমপধ, মমমমপধনি, পপপপধনিসা।

১১। ত্রিবর্ণ—সারেগগগ, রেগমমম, গমপপপ, মপধধধ, পধনিনিনি, ধনিসাসাসা।

১২। প্রথখেনি—সাসাসারেরেরেগগগ, রেরেরেগগগমমম, গগগমমমপপপ, মমমপপপধধধ, পপপধধধনিনিনি, ধধধনিনিনিসাসাসা।

উপরিউক্ত অলঙ্কারগুলির অবরোহণ রূপ করলেই অবরোহী বর্ণের অলঙ্কারগুলির উৎপত্তি হবে। তাই পৃথক ভাবে অবরোহী বর্ণের অলঙ্কারগুলি লেখার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ উপরিউক্তগুলি হতে আরোহী ও অবরোহী উভয় বর্ণের অলঙ্কারগুলি পাওয়া যায়। এবার সঞ্চারী বর্ণের অলঙ্কারগুলির বর্ণনা দেওয়া হল।

সঞ্চারী বর্ণের অলঙ্কার

১। মন্দ্রাদি—সারেগম, মগরেসা, সারেগরে, সারেগম, রেগমপ পমগরে রেগমগ রেগমপ, গমপধ ধপমগ গমপম গমপধ, মপধনি নিধপম, মপধপ, মপধনি, পধনিসা সানিধপ পধনিধ পধনিসা।

২। মন্দ্রমধ্য—সাগরেগ মগরেগ রেগরেসা সারেগম, রেমগম পমগম গমগরে রেগমপ, গপমপ ধপমপ মপমগ গমপধ, মধপধ নিধপধ পধপম মপধনি, পনিধনি সানিধনি ধনিধপ পধনিসা।

৩। মন্দ্রান্ত—সাসারেরে গগমগরে গরেসা, রেরেগগমমপমগমগরে, গগমমপপ ধপম পমগ, মমপপধধনিধপ ধপম, পপধধনিনিসানিধনিধপ, ধধনিনিসাসারেসানিসানিধ, সাসারেরেগগমগরেগরেসা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

৪। প্রস্তার—সমারেপ গধমনি পসা।

৫। প্রসাদ—সারেসারেসারেগরে, রেগরেগরেগমগ, গমগমগমপম, মপমপমপধপ, পধপধপধনিধ, ধনিধনিধনিসানি।

৬। ব্যবৃত—সাগরেমসারেগম, রেমগপরেগমপ, গপমধগমপধ, মধপনিমপধনি, পনিধসাপধনিসা।

৭। চলিত—সাগরেম মগরেসা সারেগম, রেমগপ পমগরে রেগমপ, গপমধ ধপমগ গমপধ, মধপনি নিধপম মপধনি, পনিধসা সানিধপ পধনিসা।

৮। পরিবর্ত্ত—সাগমরে, রেমপগ, গধপম মধনিপ পনিসাধ ধসারেনি।

৯। আক্ষেপ—সারেগ, রেগম, গমপ, মপধ, পধনি ধনিসা।

১০। বিন্দু—সাসাসারেসাগ, রেরেরেগরেম, গগগমগপ, মমমপমধ, পপপধপনি, ধধধনিধসা।

১১। উদ্বাহিত—সারেগরে, রেগমগ, গমপম, মপধপ, পধনিধ, ধনিসানি নিসারেসা।

১২। ঊর্ম্মি—সামমমসাম, রেপপপরেপ, গধধধগধ, মনিনিনিমনি, পসাসাসাপসা।

১৩। সম—সারেগম মগরেসা সারেগম, রেগমপ পমগরে রেগমপ, গমপধ ধপমগ গমপধ, মপধনি নিধপম মপধনি, পধনিসা সানিধপ পধনিসা।

১৪। প্রেংখ—সাসামম, রেরেপপ, গগধধ, মমনিনি, পপসাসা।

১৫। নিষ্কুজিত—সামসামসারেগম, রেপরেপরেগমপ, গধগধগমপধ, মনিমনিমপধনি, পসাপসাপধনিসা।

১৬। শ্যেন—সারেসাগসামসাপসাধসানিসাসা; রেগরেমরেপরেধরেনিরেসা, গমগপগধগনিগসা, মপমধমনিমসা, পধপনিপসা, ধনিধসা, নিসা।

১৭। ক্রম—সারেরেগগম, রেগগমমপ, গমমপপধ, মপপধধনি, পধধনিনিসা।

১৮। উদ্ঘাটিত—সাগসাগসারেগম, রেমরেমরেগমপ, গপগপগমপধ, মধমধমপধনি, পনিপনিপধনিসা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

১৯। রঞ্জিত—সাগরেগসারেগম, রেমগমরেগমপ, গপমপগমপধ, মধপধমপধনি, পনিধনিপধনিসা।

২০। সংনিবৃত্ত—সারেগরেগমগরেসারেগম, রেগমগমপমগরেগমপ, গমপমপধপমগমপধ, মপধপধনিধপমপধনি, পধনিধনিসানিধপধনিসা।

২১। প্রবৃত্তক—সাসারেরেগগরেরেগগমমগগরেরেসাসারেরেগগমম, রেরে-গগমমগগমমপপমমগগরেরেগগমমপপ, গগমমপপমমপপধধপপ-মমগগমমপপধধ, মমপপধধপপধধনিনিধধপপমমপপধধনিনি, পপধধনিনিধধনিনিসাসানিনিধধপপধধনিনিসাসা।

২২। বেণু—সাসাগমসারেগম, রেরেমপরেগমপ, গগপধগমপধ, মমধনিমপধনি, পপনিসাপধনিসা।

২৩। ললিত—সাসামমগগরেসাসারেগরেসারেগম, রেরেপপমমগরেরেগমগ-রেগমপ, গগধধপপমগগমপমগমপধ, মমনিনিধধপমমপধপ-মপধনি, পপসাসানিনিধপপধনিধপধনিসা।

২৪। হুঙ্কার—সাসাপপ, রেরেধধ, গগনিনি, মমসাসা।

২৫। হ্লাদমান—সামগরে, রেপমগ, গধপম, মনিধপ, পসানিধ, ধরেসানি, নিগরেসা।

২৬। অবলোকিত—সাসাসামমম, রেরেরেপপপ, গগগধধধ, মমমনিনিনি, পপপসাসাসা।

সপ্ততাল অলঙ্কার

১। ইন্দ্রনীল—সারেগমগরেসারেগরেসারেগম, রেগমপমগরেগমগরেগমপ, গমপধপমগমপমগমপধ, মপধনিধপমপধপমপধনি, পধনিসানি-ধপধনিধপধনিসা।

২। মহাব্রজ—সারেগরেসারেগম, রেগমগরেগমপ, গমপমগমপধ, মপধপমপধনি, পধনিধপধনিসা।

৩। নির্দোষ—সারেসারেগম, রেগরেগমপ, গমগমপধ, মপমপধনি, পধপধনিসা।

৪। সীর—সারেসারেগসারেগম, রেগরেগমরেগমপ, গমগমপগমপধ,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মপমপধমপধনি, পধপধনিপধনিসা।

৫। কোকিল—সারেগসারেগম, রেগমরেগমপ, গমপগমপধ, মপধমপধনি, পধনিপধনিসা।

৬। আবর্তক—সারেগরেসারেসারেসারেগম, রেগমগরেগরেগরেগমপ, গমপমগমগমগমপধ, মপধপমপমপমপধনি পধনিধপধপধ-পধনিসা।

৭। সদানন্দ—সারেগম, রেগমপ গমপধ, মপধনি, পধনিসা।

৮। চক্রাকার—রেরেরেসারেরেরে,গগগরেগগগ;মমমগমমম, পপপমপপপ, ধধধপধধধ, নিনিনিধনিনিনি, সাসাসানিসাসাসা।

৯। জব—সারেগমপধনিসানিধপমগরেসা, সারেগমপধনিধপমগরেসা, সারেগমপধপমগরেসা, সারেগমপমগরেসা, সারেগমগরেসা, সারেগরেসা, সারেসা।

১০। শংখ—সাসানিধ, নিনিধপ, ধধপম, পপমগ, মমগরে, গগরেসা।

১১। পদ্মাকার—সারেসাসাসারেগগ, রেগরেরেরেগমম, গমগগগমপপ, মপমমমপধধ, পধপপপধনিনি, ধনিধধধনিসাসা।

১২। বারিদ—সানিনিনি, সাধধধ, সাপপপ, সামমম, সাগগগ, সারেরেরে, সাসাসাসা।

উপরিলিখিত অলঙ্কারগুলি অভ্যাসের দ্বারা কণ্ঠস্থ হলে পর রাগের বঢ়তে, স্বরবিস্তারে বা আলাপে বিশেষ সহায়তা পাওয়া যায়।

তান—সংস্কৃত "তন" শব্দ হতে তান শব্দের উৎপত্তি। সংস্কৃত "তন" শব্দের অর্থ হল টানা। সঙ্গীতেও তান শব্দের অর্থ, স্বরের সংযোগে সুরকে টানা। সঙ্গীতে রাগ বিস্তার করার সময় তানের সাহায্য একান্ত দরকার হয়। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে স্বরের দ্রুতগতির স্বরবিন্যাসকে সাধারণতঃ তান আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। বিলম্বিত লয়ে বা গতিতে স্বরবিন্যাস করাকে আলাপ বলা হয়ে থাকে। আলাপ, ধ্রুপদ ও খেয়াল উভয় পদ্ধতির সঙ্গীত ধারায় হয়। তবে ধ্রুপদ গান গাওয়ার পূর্বে আলাপ করা হয়। কিন্তু খেয়াল গানের মধ্যবর্তি স্থানে আলাপ করা হয়ে থাকে, তখন তাকে 'বিস্তার' বলা হয়। ধ্রুপদের আলাপে বাণীযুক্ত হয়, যেমন—"ওঁ অনন্তহরি নারায়ণম্," প্রভৃতি বা রী, রে, তা, না, নোম প্রভৃতি। আর খেয়াল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গানের বিস্তারে আকারের বিস্তার বা গানের বাণীযুক্ত বিস্তার হয়ে থাকে। বিস্তার বা আলাপ যখন দ্রুতগতি সম্পন্ন হয় এবং বিভিন্ন ছন্দযুক্ত থাকে তখন তা তানে পরিণত হয়। এই তান বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। আকার যুক্ত তানের মধ্যে শুদ্ধতান, কুটতান, অলঙ্কারিক তান, দানেদার তান, পেঁচদার তান, ফিরৎ তান, গমকতান ও বোলতান প্রভৃতি। আলাপ, বিস্তার ও তান প্রভৃতি সংযুক্ত হয়েই সঙ্গীতে বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয় এবং এক একটি গান বা গৎ ঘণ্টাধিককাল ধরে স্বরবৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের অবতারণা করে থাকে।

উপরিউক্ত তানগুলির কিছু নমুনা নিম্নে দেওয়া হল।

যেমন—

১। শুদ্ধতান—সারেগমপধনিসা নিধপমগরেসা।

২। কুটতান—সারেগম গমপধ মগরে গমপধ নিধপম পধনি ধধ মগমপধপ মগরেগমপ ধপ মগরে সা।

৩। মিশ্রতান—সারেগম পধপম পমপধ পধনিসা রেগরেসা নিধপম গরেনিধ পম গধ পম গরেসা।

৪। সাপাট বা ঢালতান—সারেগমপধনিসা রেগমপমগরেসা নিধপম-গরেসা। (বক্র প্রকৃতির রাগের তান বক্রগতিতেই চলে। তাই বক্র গতির রাগে সাপাট বা ঢালতান হয় না।)

৫। ছুটতান—গ-গরেসানিধপমগরেসা। অর্থাৎ উপরের কোন স্বর হতে দ্রুতগতিতে হঠাৎ অবরোহন করা।

৬। অলঙ্কারিক তান—সারেগগ, রেগমম, গমপপ, মপধধ, পধনিনি, ধনিসাসা প্রভৃতি অলঙ্কার যুক্ত হয়ে যে-সব তান রচিত।

৭। দানেদার তান—যে তানের মধ্যে কণ-স্বরের প্রয়োগ অধিক মাত্রায় হয়। এই তান অনেক প্রকারের হয়। এইরূপ সরল প্রকৃতির তানকে "কণযুক্ত তান" বলা হয়ে থাকে। এখানে কিছু মুখ্য দানেদার তানের টুকরো দেওয়া হল। এই তানের টুকরোগুলি সর্বদাই দ্রুতলয়ে গীত হয়ে থাকে।

ম রে রে
(ক) একটি দানাযুক্ত তান—সারেম রে, নিসারে সা, পধগরে সা প্রভৃতি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রে ম সা রে
(খ) দুটি দানাযুক্ত তান—সারেম ম রে, নিসারে রে সা, ধা

ম সা
রে রেসাসানি প্রভৃতি।

রে রে ম সা
(গ) তিনটি দানাযুক্ত তান—সারেম ম ম রে, নিসারে রে
সা রে ম রে সা
রে সা বা ম রে সা নি প্রভৃতি

সা
(ঘ) একদানার পেঁচদার একহারার টুকরো—নিসারেমরে রে প্রভৃতি।

সা সা
(ঙ) একদানার পেঁচদার দোহারার টুকরো—নিসারেমরে রেমরে রে

প্রভৃতি। এইসব দানেদার তানের বিবিধ প্রকার বিস্তার করে অনেক সুন্দর সুন্দর অলঙ্কারযুক্ত তান করা যেতে পারে। যেমন—

ম রে রে সা প ম রে
(চ) নিসারেম রে সা, রেরে সা নি, সারেপ ম রে স

রে সা সা
রেমরে সা, রেম সারেম, রেমরে রে মরে রে সা
প্রভৃতি।

সা রে রে ম ম নি ধ প
(ছ) সারে রে ম ম ম প প প ধ নি ধ প ম
প্রভৃতি।

. ধ ম গ সা
(জ) সা নি নি ধপ প ম ম গ রে সা প্রভৃতি।

এইসব তানের দানাগুলি ঝটকা দিয়ে উচ্চারণ না করে যদি ভাবযুক্ত মীড়ের সাহায্যে গাওয়া হয় তাহলে আরো সৌন্দর্যপূর্ণ হবে। কিন্তু এই দানেদার তানগুলির ঠিক উচ্চারণ কেমন হবে তা একমাত্র উপযুক্ত গুরুর নিকট হতে গুরুকণ্ঠস্বরে শুনে শিক্ষা করলে সঠিক শিক্ষালাভ সম্ভব হবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কারণ পুস্তক কেবলমাত্র সাহায্য করতে পারে। সঙ্গীতের প্রকৃত শিক্ষা একমাত্র উপযুক্ত গুরুর নিকট হতেই লাভ হয়।

৮। ফিরৎ তান—সা রে মপ নিনি, পমপ নিনি, মম পপ নিনি, রেরেরে
মমম পপ মমম পপপ নিনি মমম নিনিনি মম নিনি পমপ
নিনি, মপপ মরেমম রেসা রেমপনি, মপনিনি, সাঁসা রেঁরে
সাঁসা সাসা রেরে সাসা পনিনি পম রেসা নিসা।

৯। গমক তান—এই প্রকার তান সাধারণতঃ অনেকেই বরাবর লয়ে করার পক্ষপাতি, কিন্তু ইহা তখনই সম্ভব হবে যদি গান মধ্যলয়ে গীত হয়। গান যদি অতি বিলম্বিত লয়ে গীত হয় তবে গমকতান অন্ততঃ দ্বিগুণ অথবা চৌগুণ লয়ে গাইতে হবে। গমক তানের সাথে গানের বাণী বা বোল যুক্ত হয়ে 'বোলযুক্ত গমক তান' লয়কারীর সাথে গীত হয়। গমকতান আকারেও গাওয়া হয়ে থাকে।

১০। বোলতান—গীতের বাণী বা বোল, আকারের পরিবর্তে যুক্ত হয়ে যে পদ্ধতির তান গাওয়া হয়ে থাকে তাকে "বোল তান" বলে।

রাগ—য়ো সো ধ্বনিবিশেষস্তু স্বরবর্ণ বিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ কথিতো বুধৈঃ ॥
("সঙ্গীত রত্নাকর")

শার্ঙ্গদেবের, "সঙ্গীত রত্নাকর" গ্রন্থ হতে রাগ সম্বন্ধে উপরিউক্ত সংস্কৃত শ্লোকটি পাওয়া যায়। এর অর্থ হল স্বর এবং বর্ণ উভয় মিলে যে সুন্দর স্বররচনা শ্রবণমাত্রই শ্রোতার মনকে রঞ্জিত করতে পারে, এমনই স্বররচনাকে ভারতীয় সঙ্গীতে "রাগ" নামে অভিহিত করা হয়েছে। রাগের উৎপত্তি ঠাট হতে হয়ে থাকে। ঠাটে অবশ্য সাত স্বরের সমাবেশ থাকে। কিন্তু রাগ সাতস্বরযুক্ত, ছয়স্বরযুক্ত ও পাঁচস্বরযুক্ত হতে পারে। রাগ গীত হয় সুতরাং রাগে রঞ্জকতা অবশ্যই থাকবে। রাগলক্ষণ নিয়মগুলি নিম্নরূপ :—

(১) রাগে রঞ্জকতা অবশ্যই থাকবে এবং স্বররচনাগুলি আকর্ষনীয় হতে হবে। (২) রাগে স্বর এবং বর্ণ এমন নিয়মে সজ্জিত হবে, যার দ্বারা রাগের স্বরূপ বিকাশের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হবার অবকাশ এবং রাগে বৈচিত্র্য আনার সুযোগ থাকে। (৩) রাগে কমপক্ষে সপ্তকের অন্ততঃ পাঁচটি স্বরের সমন্বয় অবশ্য থাকবে। (৪) রাগে বাদী, সম্বাদী, আরোহ, অবরোহ, পকড়, সময় ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জাতি প্রভৃতি লক্ষণের নিয়মগুলি অতি অবশ্য বর্তমান থাকবে। (উপরিউক্ত বিষয়গুলির ব্যাখ্যা পরবর্তি অংশে দেওয়া হবে) (৫) ষড়জ ভিন্ন, রাগে অন্য যে কোন স্বর বর্জিত হতে পারে। তবে কোনো কোনো মতে রাগে ষড়জ ছাড়াও মধ্যম ও পঞ্চম একত্রে বর্জিত হবে না। অর্থাৎ যদি মধ্যম স্বরটি বর্জিত থাকে, তবে পঞ্চম স্বরটি অবশ্যই বর্তমান থাকবে। আবার পঞ্চম স্বরটি যদি বর্জিত হয় তবে মধ্যম স্বরটি অবশ্যই বর্জিত হবে না।

রাগলক্ষণ—আধুনিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে রাগের মধ্যে নিম্নলিখিত দশটি লক্ষণ মানা হয়ে থাকে।

ঠাটের আধার—প্রত্যেকটি রাগ কোনো না কোনো ঠাটের আধার হবে। ঠাটের দ্বারা রাগের সাধারণ স্বরূপও কিছুটা স্পষ্ট হয়ে যায় এবং এই আধারের উপর নির্ভর করেই ওই ঠাটের অন্য রাগের সাথে তুলনামূলক মিলের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোনো কোনো সময় এমন রাগও দেখা যায়, যা এই দশ ঠাটের মধ্যে নাও পড়তে পাবে। তখন সেই রাগের জন্য উপযুক্ত ঠাটের আধারের প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং এরূপ রাগের জন্য প্রয়োজনানুসারে কয়েকটি নূতন বা অন্য ঠাটের অস্তিত্ব মানা যেতে পারে। কিন্তু ইহা সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে যে সেই রাগের মধ্যে রাগলক্ষণ নিয়মগুলি যেন বর্তমান থাকে এবং প্রচলিত রাগের স্বরূপ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয় এবং এক সূক্ষ্ম নিজস্ব স্বরূপ যুক্ত হয়।

ঠাটের নাম বলা থাকলে রাগ ব্যবহৃত স্বরগুলির মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায়। আর যদি ঠাট নির্দেশের পরও ঠাটের বহির্ভূত কোন স্বরের ব্যবহার রাগের মধ্যে থাকে, তবে তার পরিষ্কার উল্লেখ বাঞ্ছনীয়। তা না হলে ব্যবহৃত স্বরসমষ্টির ভ্রান্ত ধারণা হতে পারে।

রাগের আরোহ—অবরোহ—প্রত্যেক রাগের মধ্যে স্বরের নির্দিষ্ট আরোহণ ও অবরোহন অবশ্যই থাকবে। মধ্যসপ্তকের ষড়জ হতে ক্রমানুসারে তার সপ্তকের ষড়জ পর্যন্ত ওঠার নাম স্বরের আরোহণ ও তার সপ্তকের ষড়জ হতে মধ্যসপ্তকের ষড়জ পর্যন্ত নামাকে অবরোহণ বলা হয়। যেমন, ভূপালী রাগের আরোহণ—সা রে গ প ধ র্সা এবং অবরোহণ—র্সা ধ প গ রে সা।

যে স্বরটি রাগে ব্যবহৃত হয় না, তাকে "বর্জস্বর" বলা হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপরিউক্ত ভূপালী রাগে মধ্যম এবং নিষাদ স্বর দুটিকে "বর্জস্বর" বা "বর্জিত স্বর" বলা হবে। কোনো কোনো রাগের রূপ প্রকাশ করা বিশেষ কঠিন এবং সেই সব ক্ষেত্রে রাগের গতি, অর্থাৎ আরোহণ, অবরোহণ ও বক্র থাকে। বক্র অর্থে স্বরের ক্রম অনুসরণ না করে অর্থাৎ একটি স্বরের ঠিক পরে যে স্বরটি থাকে, তার ব্যবহার না করে অন্য আর একটি স্বর সেই স্থানে আসে। তাকেই স্বরের "বক্রগতি" বলা হয়। যেমন—শংকড়া রাগে সা, গ, প, নিধ, সা। পঞ্চম স্বরের পর সাধারণতঃ ধৈবৎ স্বরটি আসা উচিত ছিল। কিন্তু সেই ক্রম ভঙ্গ করে নিষাদ স্বরটি ব্যবহৃত হয়ে তারপর ধৈবৎ স্বরটি বলা হবে। এইভাবে বিশিষ্ট রাগের রূপ পরিস্ফুট হতে সহায়তা করে।

রাগের জাতি—রাগের আরোহণ ও অবরোহণ ব্যবহৃত স্বরসংখ্যার রীতি অনুযায়ী রাগের জাতির নামকরণ করা হয়। রাগের মুখ্যজাতি তিন প্রকারের। (ক) সম্পূর্ণ, (খ) যাড়ব, (গ) ঔড়ব। যে রাগে সপ্তকের সাতটি স্বরই ব্যবহৃত হয় তাকে "সম্পূর্ণ জাতির" রাগ বলা হয়। যেমন, "ভৈরব" রাগ। যে রাগে সপ্তকের সাতটি স্বরের মধ্যে যে কোনো ছয়টি স্বর ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ একটি স্বর কম থাকে তাকে 'যাড়ব জাতির' রাগ বলা হয়ে থাকে। যেমন—"হংস নারায়ণী"। যে রাগে সপ্তকের সাতটি স্বরের মধ্যে যে কোনো পাঁচটি স্বরের ব্যবহার থাকে অর্থাৎ সপ্তকের যে কোনো দুটি স্বর বাদ থাকে তাকে "ঔড়ব জাতির" রাগ বলা হয়। যেমন—"মালকোষ"। উপরি লিখিত ভৈরব রাগের আরোহণ ও অবরোহণ যেমন—সা রে গ ম প ধ নি সা। সা নি ধ প ম গ রে সা সপ্তকের সম্পূর্ণ সাতটি স্বরই ব্যবহৃত দেখা যাচ্ছে। হংসনারায়ণী—যেমন—সা রে গ ম প নি সা। সা নি প ম গ রে সা। এই রাগে ধৈবৎ স্বরটি উভয় রোহনেই বাদ অর্থাৎ মোট ছটি স্বরের ব্যবহার। মালকোষ—যেমন—সা গ ম ধ নি সা। সা নি ধ ম গ সা। এখানে ঋষভ ও পঞ্চম দুটি স্বরই বর্জিত। অর্থাৎ মোট পাঁচটি স্বরের ব্যবহার। রাগের এই তিন প্রকার জাতি হতে মোট নয় প্রকারের জাতির উদ্ভব হয় এবং এর দ্বারা রাগের আরোহণ ও অবরোহণ এই দুটির বিভেদ স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়। নিম্নে এই নয়প্রকার রাগের জাতির বর্ণনা দেওয়া হল।—

(১) "সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ"।—যে রাগের আরোহণ সম্পূর্ণ এবং অবরোহণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও সম্পূর্ণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাতটি স্বরের ব্যবহার পাওয়া যায়।

(২) "সম্পূর্ণ—ষাড়ব"।—যে রাগের আরোহণ সম্পূর্ণ এবং অবরোহণ ষাড়ব অর্থাৎ আরোহণে সাতটি এবং অবরোহণে ছয়টি স্বর আছে।

(৩) সম্পূর্ণ—ঔড়ব।—যে রাগের আরোহণে সাতটি স্বর অর্থাৎ সম্পূর্ণ এবং অবরোহণে পাঁচটি স্বর ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ ঔড়ব।

(৪) "ষাড়ব—সম্পূর্ণ।—যে রাগের আরোহণ ষাড়ব অর্থাৎ ছটি স্বরের ব্যবহার এবং অবরোহণে সম্পূর্ণ অর্থাৎ সাতটি স্বর থাকে।

(৫) "ষাড়ব—ষাড়ব"।—যে রাগে আরোহণ ও অবরোহণ উভয়দিকেই "ষাড়ব"—অর্থাৎ ছয়টি স্বর থাকে।

(৬) ষাড়ব—ঔড়ব"।—যে রাগের আরোহণে ষাড়ব অর্থাৎ ছয়টি স্বর ও অবরোহণে ঔড়ব অর্থাৎ পাঁচটি স্বর থাকে।

(৭) ঔড়ব সম্পূর্ণ—যে রাগের আরোহণে উড়ব অর্থাৎ পাঁচটি স্বরের এবং অবরোহণে সম্পূর্ণ বা সাতটি স্বরের ব্যবহার থাকে।

(৮) ঔড়ব-ষাড়ব—যে রাগের আরোহণে ঔড়ব অর্থাৎ পাঁচটি স্বর এবং অবরোহণে ষাড়ব অর্থাৎ ছয়টি স্বরের বর্তমান।

(৯) ঔড়ব-ঔড়ব—যে রাগের আরোহণ ও অবরোহণ উভয় দিকেই ঔড়ব অর্থাৎ পাঁচটি স্বরের ব্যবহার পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত জাতিগুলির মধ্যে কয়েকটির সরল উদাহরণ দেওয়া হল। যেমন—খাম্বাজ। ষাড়ব সম্পূর্ণ জাতি। অর্থাৎ আরোহণে ছয়টি স্বর ও অবরোহণে সাতটি স্বরের ব্যবহার।

সা গ ম প ধ নি র্সা। র্সা নি ধ প ম গ রে গ সা। খাম্বাজ রাগের এই আরোহণ ও অবরোহণে উপরিউক্ত ষাড়রসম্পূর্ণ জাতি প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, আরোহণে ঋষভ বর্জিত ও অবরোহণে সাতটি স্বর।

দেশরাগ ঔড়ব সম্পূর্ণ জাতি। কারণ আরোহণে ঋষভ ও ধৈবৎ স্বরদুটি বর্জিত অথবা মোট পাঁচটি স্বর ব্যবহৃত এবং অবরোহণে সম্পূর্ণ সাতটি স্বরের বর্তমান। যেমন—

সা রে ম প নি র্সা। র্সা নি ধ প ম গ রে সা।

রাগে বাদী, সম্বাদীস্বর—রাগে যে স্বরটি মুখ্যরূপে ব্যবহৃত হয়,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ যে স্বরটি অন্যান্য স্বর হতে অধিক ব্যবহৃত হয় এবং স্থায়ীত্ব বেশী হয়, তাকে "বাদী স্বর" বলা হয়। রাগে বাদী স্বরের বিশেষ মহত্ত্ব থাকে। কোনো কোনো সময় সমপ্রকৃতির স্বরযুক্ত রাগের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে হলে বাদী স্বরের মহত্ত্বের উপর নির্ভর করতে হয়। অর্থাৎ একই ধরণের স্বরসমষ্টির রাগ যা অন্য আর একটি রাগের স্বরসমষ্টির প্রকৃতির সঙ্গে এক কিন্তু বাদী স্বর ভিন্ন। এরূপ অবস্থায় বাদী স্বর ভিন্ন থাকায় রাগের রূপ ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন—ভূপালী ও দেশকার রাগ। পুরিয়া ও মারবা রাগ প্রভৃতি। ভূপালী ও দেশকার উভয় রাগের মধ্যে সা রে গ প ধ সা এই স্বরগুলি সাধারণভাবে একই রূপে বর্তমান, কিন্তু ভূপালী রাগের বাদীস্বর গান্ধার, এবং দেশকারের বাদীস্বর ধৈবৎ হওয়ায় দুই রাগের স্বরূপ ভিন্ন হয়ে গেছে এবং রাগ দুটি সর্বদিক হতে সম্পূর্ণ আলাদা। বাদীস্বরকে রাজার সাথে তুলনা করা হয়েছে। পুরাতন সঙ্গীতশাস্ত্রে "গ্রহ স্বরের" সাথেও তুলনা করা যেতে পারে।

সম্বাদীস্বর—বাদীস্বর হতে কম ব্যবহৃত হয় এবং তার মহত্ত্বও বাদীস্বর হতে কম দেখা যায়। কিন্তু রাগে ব্যবহৃত অন্যান্য স্বর হতে অধিক ব্যবহৃত হয় এবং তুলনায় মহত্ত্বও অধিক। অর্থাৎ বাদীস্বরের ঠিক পরেই সম্বাদীস্বরের স্থান এবং বাদী ও সম্বাদী স্বরের মধ্যে একটা সুসম্বন্ধ বর্তমান থাকে। যেমন, বাগেশ্রী ও ভীমপলশ্রী রাগে মধ্যমস্বরটি বাদীস্বর ও ষড়জটি সম্বাদী স্বর। এই বাদী ও সম্বাদী স্বরের মধ্যে চারিটি স্বরের পার্থক্য দেখা যায়। ইমন রাগের বাদীস্বর গান্ধার এবং সম্বাদীস্বর নিষাদ। এই রাগের বাদী সম্বাদী স্বরে পাঁচটি স্বরের পার্থক্য বর্তমান। তাই সাধারণতঃ প্রায় সমস্ত রাগগুলির (উত্তরভারতীয়) বাদী সম্বাদীস্বরের মধ্যে পার্থক্য চার হতে পাঁচ স্বরের বা নয় শ্রুতি হতে ত্রয়োদশ শ্রুতির পাওয়া যায়। সম্বাদী স্বরকে মন্ত্রীর উপমা দেওয়া হয়ে থাকে।

বাদী সম্বাদী স্বর ছাড়া রাগে ব্যবহৃত অন্যান্য স্বরগুলিকে অনুবাদীস্বর বলা হয়। অনুবাদী স্বরকে অনুচরের সাথে তুলনা করা হয়। ইমন রাগে বাদীস্বর গান্ধার, সম্বাদীস্বর নিষাদ এবং বাকী ষড়জ, ঋষভ মধ্যম পঞ্চম ও ধৈবৎ স্বরগুলি অনুবাদী স্বর। বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী ছাড়া, বিবাদী নামে এক প্রকার স্বরনাম আছে। বিবাদীস্বর যেগুলি সাধারণভাবে রাগে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু কুশলী শিল্পী রাগের সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য খুব অল্প এবং চাতুর্যের সাথে বিবাদী স্বরের ব্যবহার করে থাকেন। বিবাদী স্বরকে শত্রুর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। রাজা যেমন শত্রুর সাথে লড়াইয়ে বিজয়ী হয়ে তার নিজের সম্মান বৃদ্ধি করে এবং শত্রুকে তাঁর অধিকারে আনে, তেমনি বিবাদী স্বরকে কুশলতার দ্বারা ব্যবহার করে, রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক করে তোলে। বর্জস্বর এবং বিবাদী স্বরের মধ্যে প্রধানতঃ এই পার্থক্য যে, বর্জস্বর আদৌ ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিবাদী স্বর কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত শিল্পীর দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিবাদীস্বর রাগের নিয়মিত ব্যবহৃত স্বর নয়। কারণ বিবাদী স্বর ব্যবহার না করলে রাগরূপ বিকৃত হয় না। কিন্তু বিবাদী স্বরের যথাযথ প্রয়োগ হলে রাগের রূপ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিলাভ করে থাকে।

যেমন—রাগ হাম্বীর। এই রাগে বিবাদী স্বর ব্যবহৃত হয়। কোমল নিষাদ হল এই রাগের বিবাদী স্বর। এই স্বরটি অবরোহণে কোনো কোনো সময়ে অত্যন্ত কুশলতার সাথে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন—সা, ধ, নি প। বিবাদীস্বরের নমুনা একমাত্র প্রকৃত শিল্পীর কণ্ঠে পাওয়া যায়। স্বরলিপির সাহায্যে বোঝা খুবই মুস্কিল।

পকড়—সর্বাপেক্ষা অল্পসংখ্যক স্বরের সমষ্টি যার প্রয়োগে রাগের প্রাথমিক রূপ প্রকাশ পেয়ে থাকে; তাকে "পকড়" বা 'রাগবাচক মুখ্য অঙ্গ" বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ স্বরসমষ্টির দ্বারা রাগের পরিচয় হয়। যেমন—"সা, রেসা, গ ম ধ প"। এই কয়টি স্বরের ব্যবহারে ভৈরব রাগের রূপটি প্রকাশ পেয়েছে অতি সহজেই। অবশ্য পকড় বা রাগবাচক মুখ্য অঙ্গ সম্বন্ধে একই স্বরসমষ্টি সব সঙ্গীতজ্ঞেরা ব্যবহার করেন না। তবে স্বর বিন্যাসের সামান্য পরিবর্তন সূচিত হলেও রাগ রূপটির মধ্যে কোনো বিভেদ থাকে না। যেমন, উপরিউক্ত ভৈরব রাগের স্বর বিন্যাসে কিছু পরিবর্তন, যেমন—গ ম ধ ধ ন ধপ ম গ রে করলেও ভৈরব রাগের রূপ অপরিবর্তিত থাকবে এবং ভাবরসের দিকটাও সমান থাকে। শিল্পী গান করা বা যন্ত্র বাজাবার সময় রাগরূপ পরিস্ফুট করার জন্য রাগবাচক মুখ্য অঙ্গের বা পকড়ের স্বর বিন্যাসগুলি বিভিন্ন ঢংগে প্রায়শই ব্যবহার করে থাকেন। কারণ ইহার দ্বারা বা এরূপ ক্রিয়ার দ্বারা রাগেব রূপ ও ভাব অবিকৃত থাকায় সহায়তা করে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ন্যাসস্বর—গানে অথবা আলাপের শেষ অংশ, অর্থাৎ যে স্বরের উপর সমাপ্ত করা হয়ে থাকে, সেই সমাপ্তি স্বরটিকে রাগের "ন্যাস স্বর" বলা হয়ে থাকে। "ন্যাস" শব্দটির পরিভাষা প্রাচীন সঙ্গীতের ন্যাস শব্দ হতে আনয়ন করা হয়েছে। প্রাচীন সঙ্গীতে রাগে নির্দিষ্ট গ্রহ, অংশ, ন্যাস প্রভৃতি স্বর থাকত। কিন্তু ন্যাস শব্দটি প্রাচীন হলেও প্রাচীন রাগে যেমন নির্দিষ্ট ন্যাসস্বর থাকত, বর্তমান সঙ্গীতে সেরূপ নির্দিষ্ট ন্যাসস্বর থাকে না। বিভিন্ন গানে ও আলাপ বিস্তারের সমাপ্তি স্বরটিকে "ন্যাস স্বর" বলে ধরা হয়।

অপন্যাস—প্রাচীনকালে কণ্ঠসঙ্গীত বা যন্ত্র সঙ্গীতের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট স্বর সমরষ্টি, অন্তিম স্বরকে অপন্যাস বলা হত এবং সেকালের সঙ্গীতে ন্যাস, অপন্যাসে প্রভৃতি স্বরের বিশেষ মহত্ব থাকত। কিন্তু বর্তমান সঙ্গীতে উক্তরূপ ন্যাস, স্বরের ব্যবহারের কোনো মূল্যই দেওয়া হয় না এবং রাগে ব্যবহৃত ন্যাস বা অপন্যাস স্বরের কোনো মহত্ব স্বীকার করা হয় না। আজকাল যে কোনো রাগে যে কোনো স্বরের উপর ন্যাস করা হয়ে থাকে। রাগে ন্যাস স্বর ব্যবহারের রীতি বলে কিছু নেই। আলাপ বা বিস্তার সমাপ্ত করার সময় শিল্পীরা সাধারণতঃ ষড়জের উপরই সমাপ্ত করেন। গীতের বা কোনো গতের ক্ষেত্রে ও ন্যাস বা অপন্যাস স্বরের ব্যবহারের কোনো বিধিবদ্ধ নিয়ম রচিত হয়নি।

বর্তমানে স্বর বিস্তার বা আলাপ করার সময় কোনো কোনো রাগে কোনো কোনো বিশেষ স্বরের স্থায়িত্ব বা গুরুত্ব আরোপ করার প্রথা আছে এবং তার দ্বারা রাগের রূপ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক হয়। আধুনিক সঙ্গীতে এই স্বরগুলির ব্যবহারের নামকরণ 'ন্যাসস্বর' বলা হয়েছে। যেমন,—ভূপালী রাগের ন্যাস স্বর হল ষড়জ, গান্ধার ও পঞ্চম স্বর। ছোট ছোট আলাপের অংশ-বিশেষ, এই সব স্বরগুলির উপর সমাপ্ত করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক রাগে ষড়জ স্বরের উপর ন্যাস হয়। কিন্তু এ ছাড়া আরো কয়েকটি স্বরের উপর বিশেষভাবে ছোট ছোট আলাপ সংযুক্ত হয়ে, মাঝে মাঝে কোনো কোনো স্বরের উপর স্থায়ী হয় এবং এই প্রথায় রাগের স্বরবিন্যাস একটি পদ্ধতিসূচক ঢংগের অন্তর্গত করা হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কোনো কোনো রাগের স্বরবিন্যাসের পরিবর্তনে রাগের রূপও বদল হয়ে যেতে পারে। যেমন—"বসন্ত রাগে" যদি নিষাদ স্বরের উপর বার বার ন্যাস করা হয়, তাহলে রূপটি পরিবর্তিত হয়ে রাগটিতে 'পরজ' রাগের রূপের ছায়া এসে পড়বে। 'ভীমপলশ্রী' রাগে মধ্যম স্বরটির উপরই বেশী ন্যাস করা হয়ে থাকে। যদি তা না করে পঞ্চম স্বরের উপর বার বার ন্যাস করা হয় তবে ভীমপলশ্রী রাগে ভীমপলশ্রীর পরিবর্তে ধনাশ্রী রাগের ছায়া এসে যাবার আশংকা থাকবে। তাই পুরাতন প্রথায় ন্যাস স্বরের ব্যবহার না থাকলেও বর্তমানে রাগের স্বরবিন্যাসের ক্ষেত্রেও ন্যাস স্বরের যে প্রচলন দেখা যায়, তা অবজ্ঞা করলে রাগের স্বরূপ ও ভাব পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকবে।

পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ—সপ্তকের মধ্যে দুটি ভাগ আছে অর্থাৎ সপ্তকটি দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি হল ষড়জ হতে মধ্যম স্বরটি পর্যন্ত অংশ এবং এই অংশকে "পূর্বাঙ্গ" বলা হয়। বাকী অংশ পঞ্চম স্বর হতে তার ষড়জ পর্যন্ত এবং এই অংশকে 'উত্তরাঙ্গ' বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কার্যতঃ পূর্বাঙ্গের পরিধি ষড়জ হতে পঞ্চম স্বর পর্যন্ত এবং উত্তরাঙ্গের ক্ষেত্র মধ্যম হতে তার ষড়জ পর্যন্ত ধরা হয়। ইহার কারণ পরবর্তি অংশে বর্ণিত হবে।

যে রাগের প্রাধান্য বা প্রচলিত রূপ পূর্বাঙ্গে বা সপ্তকের পূর্বভাগে সীমাবদ্ধ থাকে, তাকে পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ বলা হয়ে থাকে। এই অঙ্গের রাগের বাদীস্বর সপ্তকের পূর্বাঙ্গের অংশেই থাকে। যেমন—ইমন রাগের বাদীস্বর গান্ধার অর্থাৎ পূর্বাঙ্গে এবং রাগের প্রাধান্য ও চলন প্রধানতঃ সপ্তকের পূর্বভাগে ও মন্দ্র সপ্তকের মধ্যে বিস্তৃত পাওয়া যায়। তবে সপ্তকের বাকী অংশেও এর প্রস্তার প্রয়োজনানুসারে হয়ে থাকে। এজন্য ইমন পূর্বাঙ্গ প্রধান রাগ বলা হয়ে থাকে।

যে রাগের বিস্তার সপ্তকের উত্তর ভাগে বা উত্তরাঙ্গে অধিক প্রসারিত হয় তাকে 'উত্তরাঙ্গপ্রধান রাগ' বলা হয়ে থাকে। এইরূপ রাগের বাদীস্বর সপ্তকের উত্তরভাগে বা উত্তরাঙ্গে অবস্থিত। ইহাকে 'উত্তরাঙ্গ' প্রধান রাগ বা "উত্তর রাগ" বলা হয়। ভৈরব উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ বলে সঙ্গীত শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এই রাগের বাদীস্বর ধৈবৎ অর্থাৎ সপ্তকের উত্তরভাগে বা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উত্তরাঙ্গে এবং রাগের বিস্তারে উত্তরাঙ্গেই থাকে ও রূপ পরিস্ফুট হয়। কোনো রাগ বিস্তার করার পূর্বে রাগটি পূর্বাঙ্গের না উত্তরাঙ্গের রাগ এ বিষয়ে অবশ্য দৃষ্টি রাখা উচিত এবং তাতে রাগের স্বরূপ ও ভাব বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকেনা বরং সেই রাগের রূপ ও ভাব প্রকাশে বিশেষ সহায়তা দিয়ে থাকে। যেমন—ভূপালী রাগে যদি ভুলক্রমে উত্তরাঙ্গে বা সপ্তকের উত্তরভাগে অধিক পরিমাণে বিস্তার করা হয় অথবা উত্তরাঙ্গে প্রাধান্য বেড়ে যায় তবে ভূপালীতে, ভূপালী রাগের রূপ পরিস্ফুট হবে না। তখন ভূপালী রাগ, দেশকার নামে ভূপালীর সমপ্রকৃতির রাগে পরিণত হবে। সুতরাং এই অবস্থা হতে বোঝা যায় যে, রাগে পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গের প্রাধান্যের দিকে বিশেষভাবে সাবধান হওয়া উচিত এবং ইহা প্রচলিত রাগলক্ষণগুলির মধ্যে একটি প্রধান লক্ষণ বলা যেতে পারে।

রাগের সময়—ভারতীয় রাগরাগিনীগুলির জন্য একটি করে বিশেষ সময় নিদিষ্ট করা আছে। এই নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট রাগগুলি গীত হলে, রাগগুলির স্বরূপ, ভাব ও সৌন্দর্য সুন্দর রূপে প্রকাশিত হয়। কতকগুলি রাগ সকালের দিকে গীত হলে, অতীব সুন্দর রূপে উপভোগ্য হয়। আবার অন্য কতকগুলি রাগ, রাত্রে পরিবেশিত হলে, অধিক মনোরম প্রতীয়মান হয়। আবার কিছু রাগ আছে যেগুলি ভারতীয় নির্দিষ্ট ঋতুতে গীত হবার জন্য নির্দিষ্ট আছে। যেমন—বর্ষা ঋতুতে মল্লার, মেঘ প্রভৃতি মৌসুমী রাগের প্রচলন, আবার বসন্ত, ঋতুতে, বসন্ত, হিণ্ডোল ও বাহার প্রভৃতি বসন্ত ঋতুর রাগের প্রচলন দেখা যায়। এগুলি নির্দিষ্ট ঋতুতে অতিশয় মনোরঞ্জক লাগে এবং ঋতু রাগের গীতের বাণীগুলিও সেই ঋতুর বর্ণনা যুক্ত হয়। যেমন—মল্লারের গান, "অয়ি হৈ ঘটা ঘনঘোর" বা "জলধর আবত, জল ভরে কারে" প্রভৃতি। বসন্ত রাগের গান—"ঋতু বসন্ত আয়ি, সব বনফুলে" বা "ফাগুয়া বৃজ দেখন কো চলোরি" প্রভৃতি। ঋতু রাগগুলি নির্দিষ্ট ঋতুতে সর্বসময়ে গীত হলে পর রাগরূপ বিকৃত হয় না।

রাগের সময় নির্বাচনের ব্যাপারে একটি সাধারণ নিয়ম আছে যে, যে রাগের বাদীস্বর সপ্তকের পূর্বাঙ্গে থাকে অর্থাৎ যে রাগ পূর্বাঙ্গ রাগ বা পূর্বরাগ, সেই সমস্ত রাগ দিনের বেলা বারটা হতে রাত্রি বারটা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গীত হবার প্রথা আছে। যেমন—ইমন রাগ। এই রাগের বাদীস্বর গান্ধার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এবং ইহা পূর্বাঙ্গ রাগ। এজন্য এই রাগ গীত হবার সময় নির্দিষ্ট হয়েছে রাত্রি প্রথম প্রহর। বিপরীত ভাবে যে রাগ উত্তরাঙ্গ প্রধান অর্থাৎ যে রাগের বাদীস্বর সপ্তকের উত্তরাঙ্গে বা যে রাগগুলিকে 'উত্তর রাগ' বলা হয়, সেই সব রাগগুলি, রাত্রি বারটা হতে দিবা বারটা, এই সময়ের মধ্যে গীত হবার সময় নির্দিষ্ট আছে। যেমন, ভৈরব রাগ, ইহা উত্তরাঙ্গ প্রধান রাগ, কারণ ইহার বাদীস্বর ধৈবৎ এবং এই স্বরটি সপ্তকের উত্তরাঙ্গে স্থাপিত এবং সেজন্য এই রাগ গীত হবার নির্দেশ প্রাতঃকাল প্রথম প্রহরে পাওয়া যায়।

ব্যতিক্রম হিসাবে এমন কিছু রাগ আছে, যা প্রাতঃকালে গাওয়ার নির্দেশ পাওয়া যায় এবং নিয়মানুযায়ী সেই রাগ উত্তরাঙ্গ প্রধান বা উত্তর রাগ। কিন্তু সেই রাগের বাদীস্বর—মধ্যম স্বরটি। বাস্তব ক্ষেত্রে এই মধ্যম স্বরটি পূর্বাঙ্গের স্বর। আবার এমন কতকগুলি রাগ আছে, যেগুলি গাইবার সময় রাত্রিকাল নির্দিষ্ট আছে কিন্তু সেই রাগের বাদ স্বরটি পঞ্চম। এই পঞ্চম স্বরটি কিন্তু সপ্তকের উত্তর-ভাগের বা উত্তরাঙ্গের স্বরসমষ্টির মধ্যে পড়ে। এই সব ব্যতিক্রমকে নিয়মের মধ্যে অনার জন্য পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গের পরিধিকে কিছুটা বর্দ্ধিত করা হয়েছে। যথা পূর্বাঙ্গের ব্যপ্তি ষড়জ হতে পঞ্চম স্বরটি পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং উত্তরাঙ্গের সীমা মধ্যম স্বর হতে তার ষড়জ পর্যন্ত রাখা হয়েছে। সুতরাং মধ্যম এবং পঞ্চম স্বরদুটি উভয় অঙ্গের স্বর রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ মধ্যম ও পঞ্চম স্বরদুটি উভয় অঙ্গেরই সাধারণ স্বর। মধ্যম বাদীস্বর—যুক্ত উত্তরাঙ্গ রাগ হল—"ললিত"। পঞ্চম স্বরটি, বাদীস্বর যুক্ত পূর্বাঙ্গ রাগ হল—"কামোদ"। ললিত রাগ গীত হবার সময় প্রাতঃকাল এবং কামোদ রাগ, রাত্রিতে গেয় রাগ।

স্বর এবং সময়ের দৃষ্টিকোণ হতে রাগের তিনটি বর্গ:—স্বর এবং সময় অনুসারে সমস্ত রাগগুলিকে মুখ্যতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—

(১) কোমল ঋষভ এবং কোমল ধৈবৎযুক্ত রাগ অর্থাৎ 'সন্ধিপ্রকাশ রাগ'।

(২) শুদ্ধ ঋষভ এবং শুদ্ধ ধৈবৎ যুক্ত রাগ।

(৩) কোমল গান্ধার এবং কোমল নিষাদ যুক্ত রাগ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(১) সন্ধিপ্রকাশ রাগ—উপরে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কোমল ধৈবৎ ও কোমল ঋষভ যুক্ত রাগগুলিকে "সন্ধিপ্রকাশ রাগ" বলা হয়। কারণ এই জাতীয় রাগগুলি সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় গীত হয়, অর্থাৎ দিন এবং রাত্রির সন্ধি অথবা মিলন মুহূর্ত। এই জাতীয় রাগগুলি সকালে, ভোর চারটা হতে সাতটা পর্যন্ত অথবা বিকাল চারটা হতে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত গীত হবার নিয়ম আছে। এই রাগগুলিতে যেমন ঋষভ ও ধৈবৎ কোমল হবে, তেমনি গান্ধার স্বরটি অবশ্যই শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কারণ, গান্ধার যদি কোমল রূপ প্রাপ্ত হয় এবং ঋষভও কোমল রূপ প্রাপ্ত হয়, তবে সেই রাগটি তৃতীয় বর্গের অন্তর্গত হয়ে যাবে।

এই 'সন্ধি প্রকাশ' রাগের অন্তর্গত রাগগুলির মধ্যে একটি ব্যতিক্রম পাওয়া যায় 'মারবা' রাগে। এই রাগটি সন্ধি প্রকাশ রাগের অন্তর্গত এবং গীত হয় সন্ধি প্রকাশ সময়ে বা সূর্যাস্তের সময়। কিন্তু এই রাগের ঋষভ স্বরটি কোমল রূপ প্রাপ্ত হলেও ধৈবৎ স্বরটি শুদ্ধ রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রাতঃকালের সন্ধি প্রকাশ রাগে শুদ্ধ মধ্যমের প্রভাব অধিক পাওয়া যায়। যেমন—ভৈরব, কালেংড়া, প্রভৃতি সকালের সন্ধি প্রকাশ রাগ। সন্ধ্যার সন্ধি প্রকাশ রাগে তীব্র মধ্যমের প্রভাব বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। যেমন, মারবা, পূরবী, শ্রী প্রভৃতি রাগ। প্রাতঃকালের যে সব সন্ধি প্রকাশ রাগে দুই মধ্যমের ব্যবহার পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রেও তীব্রমধ্যম অপেক্ষা শুদ্ধমধ্যমের প্রভাব অধিক থাকে। অর্থাৎ শুদ্ধ মধ্যম অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। যেমন—সন্ধি প্রকাশ প্রাতর্গেয় রাগ, রামকেলী ও ললিত রাগ দুটিতে উভয় মধ্যম ব্যবহৃত হলেও শুদ্ধ মধ্যমের প্রাধান্য, তুলনায় অধিক। আবার সায়ংকালে গেয় যে সমস্ত সন্ধি প্রকাশ রাগে দুই মধ্যমের ব্যবহার আছে, সেক্ষেত্রেও দেখা যায় শুদ্ধ মধ্যম অপেক্ষা তীব্র মধ্যম অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। যেমন পূরবী-রাগ প্রভৃতি। উভয় মধ্যম ব্যবহৃত হলেও শুদ্ধ মধ্যম অপেক্ষা তীব্র মধ্যমের ব্যবহার অধিক। সন্ধি প্রকাশ রাগ অধিকতর ভৈরব, পূরবী ও মারবা প্রভৃতি ঠাটের অন্তর্গত হয়। প্রথম বর্গের রাগগুলিকে ঋষভ কোমল ও ধৈবৎ কোমল স্বরযুক্ত রাগ না বলে, ঋষভ কোমল ও গান্ধার শুদ্ধ স্বরযুক্ত রাগ বলা হলে অধিক সমীচীন হবে বলে মনে হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহার দুটি প্রধান কারণ আছে। যেমন—

প্রথমতঃ কেবলমাত্র ঋষভ ও ধৈবৎ স্বর দুটি কোমল হলেই এই বর্গের রাগ হবে না, যতক্ষণ না গান্ধার স্বরটির শুদ্ধ রূপ বর্তমান থাকবে। অতএব এই বর্গের অন্তর্গত রাগে শুদ্ধ গান্ধারের অবশ্য প্রয়োগ ও উল্লেখ অতি অবশ্য থাকা উচিত।

দ্বিতীয় কারণ হল এই যে, "মারবা" রাগটি "সন্ধিপ্রকাশ রাগ"। কিন্তু এই রাগের ধৈবৎ স্বরটি কোমল নয়, শুদ্ধ রূপ প্রাপ্ত। কিন্তু ঋষভ স্বরটি কোমল ও গান্ধার স্বরটি শুদ্ধ। তাই যদি, প্রথম বর্গের রাগের নিয়মে যদি ঋষভ কোমল এবং গান্ধার শুদ্ধ স্বর হবে, এরূপ নিয়মের উক্তি থাকে, তাহলে "মারবা" রাগের ক্ষেত্রে ধৈবৎ, শুদ্ধ স্বর হওয়া সত্বেও কোন নিয়মের ব্যতিক্রম হল না, উপরন্তু বিষয়টি আরো পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত হল।

(২) ঋষভ ও ধৈবৎ শুদ্ধ স্বরযুক্ত রাগ, প্রধানতঃ বিলাবল, কল্যাণ ও খাম্বাজ প্রভৃতি ঠাটের অন্তর্গত রাগগুলি হয়। এই রাগগুলি গাইবার সময় হল সন্ধি প্রকাশ রাগগুলি গীত হবার ঠিক পরবর্তি সময়ে অর্থাৎ সকাল সাতটা হতে বেলা দশটা এবং সন্ধ্যা সাতটা হতে রাত দশটার মধ্যে নির্ধারিত। কোনো কোনো পণ্ডিত সঙ্গীতজ্ঞ এই সময়কে সন্ধ্যা সাতটা হতে রাত বারটা পর্যন্ত বর্দ্ধিত করার পক্ষপাতী। এই বর্গের রাগগুলিও অতি অবশ্যই গান্ধার শুদ্ধ হবে। এজন্য এই বর্গের রাগগুলিকেও কেবল ঋষভ, ধৈবৎ শুদ্ধ স্বরযুক্ত না বলে, ঋষভ, গান্ধার শুদ্ধ স্বরযুক্ত 'বর্গ' বললে পর অধিক উপযুক্ত হবে। এর দ্বারা শুদ্ধ গান্ধারের প্রয়োগ যে অনিবার্য, তা স্পষ্টভাবেই বোঝা যাবে এবং প্রথমবর্গের নিয়ম ঋষভ কোমল এবং গান্ধার শুদ্ধ, এই নিয়মের সাথে একটা সমতা বজায় থাকবে। অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গের রাগের বর্গীকরণ নিয়মে ঋষভ ও গান্ধারের প্রতি দৃষ্টি দিলেই, রাগবর্গীকরণ বিচার করার সমস্যা মিটে যাবে বা সহজ হবে। প্রথম বর্গে ঋষভ কোমল ও গান্ধার শুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বর্গে ঋষভ শুদ্ধ ও গান্ধার শুদ্ধ।

ঋষভ, ধৈবৎ শুদ্ধ স্বর যুক্ত বর্গের রাগেও মধ্যম স্বরেরও যথেষ্ট মহত্ব আছে। এই বর্গের রাগে, সকাল সাতটা হতে বেলা দশটা পর্যন্ত সময়ে গীত রাগগুলিতেও শুদ্ধ মধ্যমের প্রাধান্য অধিক পরিমাণে থাকে। আর এই বর্গের, সন্ধ্যা সাতটা হতে রাত দশটা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গীত রাগগুলিতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তীব্র মধ্যমের প্রাধান্য অধিক মাত্রায় থাকে। সকালের রাগের নমুনাস্বরূপ বিলাবল, গৌড়সারং, প্রভৃতি এবং এই রাগগুলিতে শুদ্ধ মধ্যম স্বরটি অধিক রূপে ব্যবহৃত হয়। এই বর্গের রাত্রের রাগ যেমন—ইমন, ভূপালী, শুদ্ধ কল্যাণ প্রভৃতি রাগগুলিতে তীব্র মধ্যমের ব্যবহার ও মহত্ত্ব, শুদ্ধ মধ্যম অপেক্ষা অধিক। কিন্তু এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম খাম্বাজ ঠাটের রাগগুলিতে অধিক মাত্রায় পাওয়া যায়। যেমন—খাম্বাজ ঠাটের রাগগুলিতে শুদ্ধ মধ্যম স্বরটি প্রবলভাবে ব্যবহৃত হয় এবং তীব্র মধ্যম আদৌ ব্যবহৃত হয় না। অনুরূপ ভাবে সকালের তৃতীয় বর্গের তোড়ী ঠাটের রাগে শুদ্ধ মধ্যম অধিক ব্যবহৃত হয় না এবং তীব্র মধ্যম স্বরটিই বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এই সব মধ্যম স্বরের ব্যতিক্রমের নিয়ম অত্যন্ত সঙ্গতভাবে নিবদ্ধ হয়েছে, যার বর্ণনা পরবর্তি অংশে (অধ্ব দর্শক স্বর) দেওয়া হয়েছে।

গান্ধার ও নিষাদ কোমল স্বরযুক্ত রাগবর্গ—গান্ধার ও নিষাদ কোমল স্বরযুক্ত রাগ গীত হবার সময় হল, ঋষভ ও ধৈবৎ শুদ্ধ স্বরযুক্ত বর্গের রাগের ঠিক পরবর্তি সময়ে, অর্থাৎ সকাল দশটা হতে বিকাল চারটা এবং রাত্র দশটা হতে ভোর চারটা পর্যন্ত সময়। দ্বিতীয় মতানুসারে গান্ধার ও নিষাদ কোমল স্বরযুক্ত রাগ বেলা বারটা হতে বৈকাল চারটা পর্যন্ত এবং রাত্রি বারটা হতে ভোর চারটা পর্যন্ত সময় গীত হবার নির্দেশ পাওয়া যায়। কারণ এই মতানুসারে ঋষভ ও ধৈবৎ শুদ্ধ স্বরযুক্ত রাগগুলি, দিন ও রাত্রির সাতটা হতে বারটা পর্যন্ত সময় গীত হয়ে থাকে। এই বর্গের রাগগুলি, ভৈরবী, আশাবরী, তোড়ী ও কাফী প্রভৃতি ঠাটের অন্তর্গত হয়। এই বর্গের রাগ নির্ধারিত হয়, প্রধানতঃ গান্ধার স্বরকে লক্ষ্য করে। নিষাদ স্বরটি কেনো কোনো সময় শুদ্ধ রূপেও থাকে। যেমন—"পটদীপ" রাগ। এই রাগে গান্ধার স্বরটি কোমল হলেও নিষাদ স্বরটি শুদ্ধ। এই কারণে এই বর্গের রাগকে কেবল কোমল গান্ধার স্বরযুক্ত বর্গ বলা যেতে পারে। ইহার মুখ্য বৈশিষ্ট্য এই হবে যে, পটদীপ রাগের ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম হয়েছে, তার কোনো প্রয়োজন হবে না। আর প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গীকরণে যে দুটি স্বর ঋষভ ও গান্ধারের দ্বারা বর্গীকরণ করা হয়েছে, তার বাইরে নিষাদ স্বরটিকে নিয়ে টানাটানির প্রয়োজন থাকবে না।

গান্ধার ও নিষাদ কোমল স্বরযুক্ত রাগগুলি দশটা হতে চারটা পর্যন্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গীত হবার সময় নির্দেশই অধিক প্রশস্ত। কারণ (১) ভৈরবী, তোড়ী এবং দেশী প্রভৃতি রাগগুলি গীত হবার সময় সাধারণতঃ সকাল বারটা হওয়া উচিত হবে না। বেলা একটা পর্যন্ত এই সব রাগ গাওয়া হলেও ইহা বেলা এগারোটার পর সময় হতে সাধারণত গীত হতে দেখা যায়। (২) রাত্রির অনেকগুলি রাগ, যার গান্ধার স্বরটি কোমল, যেমন—বাগেশ্রী, কাফী প্রভৃতি রাগগুলি তো রাত্রি দশটার সময় অথবা তার পূর্বে গাওয়া হয়ে থাকে। তাই রাত্রি বারটার পর এই রাগের সময় নির্ধারণ উচিত নয়। এই বর্গের চারটি ঠাটের রাগ পাওয়া যায় এবং তার রাগ সংখ্যাও অধিক। রাগের সখ্যা অধিক হওয়ায় রাত্রি দশটা হতে ভোর চারটা পর্যন্ত, লম্বা সময় এই বর্গের রাগের পক্ষে উপযুক্ত হয়েছে।

অতএব স্বর বা সময়ের আধারের উপর নির্ভর করে, সংক্ষেপে নিম্নলিখিত প্রকারের রাগ বর্গীকরণ অধিক সঙ্গত ও সিদ্ধ প্রতীয়মান হবে—

(ক) ঋষভ কোমল ও গান্ধার শুদ্ধ স্বর যুক্ত বর্গ (সন্ধি প্রকাশ রাগ)
সময় চারটা হতে সাতটা পর্যন্ত।

(খ) ঋষভ শুদ্ধ ও গান্ধার শুদ্ধ স্বরযুক্ত বর্গ।
সময় সাতটা হতে দশটা পর্যন্ত।

(গ) কোমল স্বরযুক্ত বর্গ।
সময় দশটা হতে চারটা পর্যন্ত।

সময় চক্র—উত্তর ভারতীয় রাগের গাওয়ার সময় চক্র, সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চক্রাকারে আবদ্ধ। যেমন—ঋষভ ও ধৈবৎ কোমল স্বরযুক্ত সন্ধি প্রকাশ রাগ, তারপর ধৈবৎ শুদ্ধ স্বরযুক্ত রাগ, এবং শেষে গান্ধার ও নিষাদ কোমল স্বরযুক্ত রাগ; এই ক্রমানুসারে গীত হবার রীতি উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে গ্রথিত আছে। আবার সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত উপরিউক্ত ক্রম অনুসারেই রাগ গীত হবার সময়ের নির্দেশ আছে। যেমন, প্রথমে ঋষভ ও ধৈবৎ কোমল স্বরযুক্ত রাগ, তারপর ঋষভ ও গান্ধার শুদ্ধ স্বরযুক্ত রাগ এবং শেষে গান্ধার ও নিষাদ কোমল স্বরযুক্ত রাগ। দ্বিতীয় দিন আবার সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আবার পূর্ব চক্রানুসারে রাগ গীত হবার পদ্ধতিকে রাগের "সময়-চক্র" বলা হয়ে থাকে। এই 'সময়—চক্রকে' আরো

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিস্তৃত ও স্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য নিম্নলিখিত ভাবে দেখানো হল।

(ক) প্রাতঃকাল চারটা হতে সাতটা পর্যন্ত।—
ঋষভ কোমল ও গান্ধার শুদ্ধ স্বরযুক্ত। যেমন—ভৈরব, পূরবী, মারবা প্রভৃতি ঠাটের অন্তর্গত প্রাতঃগেয় সন্ধি প্রকাশ রাগ।

(খ) দিবা সাতটা হতে দশটা সময় পর্যন্ত—
ঋষভ ও গান্ধার শুদ্ধ স্বরযুক্ত রাগ। যেমন—বিলাবল, কল্যাণ খাম্বাজ প্রভৃতি ঠাটের অন্তর্গত দিনমানের গেয়রাগ।

(গ) দিনমানের দশটা হতে সায়ংকালের চারটা পর্যন্ত সময়—গান্ধার কোমল স্বরযুক্ত। যেমন—কাফী, আশাবরী, ভৈরবী, তোড়ী প্রভৃতি ঠাটের অন্তর্গত দিনমানের গেয়রাগ।

(ঘ) সায়ংকালে চারটা হতে সাতটা পর্যন্ত—
ঋষভ কোমল স্বরযুক্ত এবং গান্ধার শুদ্ধ স্বরযুক্ত। যেমন—ভৈরব, পূরবী, মারবা প্রভৃতি ঠাটের অন্তর্গত সায়ংগেয় সন্ধি প্রকাশ রাগ।

(ঙ) রাত্রি সাতটা হতে দশটা পর্যন্ত—
ঋষভ ও গান্ধার শুদ্ধ স্বরযুক্ত। যেমন—বিলাবল, কল্যাণ, খাম্বাজ প্রভৃতি ঠাটের অন্তর্গত রাত্রিকালের গেয় রাগ।

(চ) রাত্রি দশটা হতে ভোর চারটা পর্যন্ত—
গান্ধার কোমল স্বরযুক্ত কাফী, আশাবরী, ভৈরবী ও তোড়ী প্রভৃতি ঠাটের অন্তর্গত রাত্রিকালের গেয় রাগ।

ঠিক এই ভাবেই পরবর্তি দিবা হতে রাত্রি পর্যন্ত সময় উপরিউক্ত ক্রমানুসারে রাগগুলি গীত হয়। আবার রাত্রিকাল হতে দিবা পর্যন্ত ঠিক ওইভাবেই ক্রমানুসারে রাগগুলি গাওয়া হয়ে থাকে।

দিনরাত্রির চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আটটি প্রহরের ভাগ থাকে এবং এক একটি প্রহর তিন ঘণ্টাকাল যুক্ত হয়। সাধারণতঃ দিবা প্রথম প্রহর ভোর ছটা হতে শুরু হয়। কিন্তু উপরিউক্ত রাগ বর্গীকরণের সাথে সামঞ্জস্য রাখার ও সুবিধার জন্য দিবা প্রথম প্রহর সকাল সাতটা হতে গণনা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ দিবা প্রথম প্রহর সকাল সাতটা হতে দশটা পর্যন্ত ঋষভ ও ধৈবৎ শুদ্ধ স্বরযুক্ত রাগ, আবার দিবা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে অর্থাৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বেলা দশটা হতে একটা এবং একটা হতে বিকাল চারটা পর্যন্ত গান্ধার নিষাদ কোমল স্বরযুক্ত রাগ গাওয়া হবে। আবার দিবা চতুর্থ প্রহরে অর্থাৎ বেলা চারটা হতে সাতটা পর্যন্ত সময়ে, সায়ং গেয় ঋষভ ও ধৈবৎ কোমল স্বরযুক্ত সন্ধিপ্রকাশ রাগ গীত হবে। এই ভাবেই ক্রমানুসারে রাগগুলির সময় নির্দেশ পাওয়া যায়। রাত্রির প্রথম প্রহর সন্ধ্যা সাতটা হতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত ধরা হয়, দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি দশটা হতে রাত একটা পর্যন্ত, তৃতীয় প্রহরে রাত্রি একটা হতে ভোর চারটা পর্যন্ত এবং ভোর চারটা হতে সকাল সাতটা পর্যন্ত চতুর্থ প্রহর বলা হয়। কিন্তু দিনমানের শুরু কার্যতঃ ভোর ছটা হতে হয়।

অধ্ব দর্শক স্বর—সপ্তকের মধ্যম স্বরটিকে "পথ প্রদর্শক" বা "অধ্ব দর্শক" স্বর বলা হয়ে থাকে। কারণ এই স্বরটীর সাহায্যে রাগের সময় নির্ধারণ নিশ্চিতরূপে প্রদর্শন করে। উদাহরণার্থে—ঋষভ ও ধৈবৎ কোমল স্বরযুক্ত সন্ধিপ্রকাশ রাগে যদি শুদ্ধ মধ্যম অধিক প্রভাবান্বিত হয়, তাহলে সেই সন্ধিপ্রকাশ রাগ দিবালোকে গীত হবে, এরূপ অনুমান করা হয়। আর এই প্রকার ঋষভ ও ধৈবৎ কোমল স্বরযুক্ত সন্ধিপ্রকাশ রাগ, যার মধ্যে তীব্রমধ্যমের প্রভাব অধিক মাত্রায় থাকে, সেই সন্ধিপ্রকাশ রাগগুলি সায়ং গেয় বলে ধরা হয়।

ইহা ছাড়া দিন হতে রাত পর্যন্ত মধ্যম স্বরটি তার নিজের প্রকৃতি যেরূপ পরিবর্তন করেছে তাও বিশেষ অনুধাবন করার মত। দিবা সন্ধিপ্রকাশ রাগে প্রথমে শুদ্ধ মধ্যমের অধিক প্রাবল্য থাকে। যেমন—কেবল শুদ্ধ মধ্যম যুক্তরাগ, ভৈরব, কালেংড়া, প্রভৃতি রাগ। তারপর এমন কতকগুলি সন্ধি-প্রকাশ রাগ পাওয়া যায়, যাতে দুই মধ্যমের ব্যবহার আছে। কিন্তু তীব্র-মধ্যম হতে শুদ্ধ মধ্যমের প্রাবল্য অধিক অর্থাৎ শুদ্ধ মধ্যম স্বরটি অধিক ব্যবহৃত। যেমন—রামকেলী, ললিত প্রভৃতি রাগ। তারপর শুদ্ধ ঋষভ ও ধৈবৎ স্বরযুক্ত রাগ যখন গাওয়া হয়, তখনও এই সব বর্গের রাগে শুদ্ধমধ্যমের প্রভাব অধিক মাত্রায় পাওয়া যায়। তৃতীয় বর্গের রাগে অর্থাৎ গান্ধার ও নিষাদ কোমল স্বরযুক্ত রাগে দুই প্রকার মধ্যমের ব্যবহার পাওয়া যায়। প্রথমটি হল শুদ্ধ মধ্যমের অপূর্ব সুন্দর স্বর বিন্যাসযুক্ত রাগ। যেমন—ভৈরবী, আশাবরী, দেশী প্রভৃতি। দ্বিতীয় সারির রাগে তীব্রমধ্যমযুক্ত স্বরের সুন্দর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মিশ্রণ। যেমন—তোড়ী প্রভৃতি রাগ। তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত এই দুই প্রকারের তৃতীয় বর্গের অনেক রাগ পাওয়া যায়, যার মধ্যে গান্ধার কোমল। যেমন সায়ংগেয় সন্ধিপ্রকাশ রাগের পূর্বের রাগ মুলতানিতে তীব্রমধ্যম এবং রাগ ভীমপলশ্রীতে শুদ্ধমধ্যম স্বরের মহত্ত্ব আছে।

আবার সায়ংকালের সন্ধিপ্রকাশ রাগে কেবলমাত্র তীব্রমধ্যম স্বরের মহত্ত্ব বেশী প্রতীয়মান হয়। যেমন—মারবা, শ্রী, প্রভৃতি রাগ। পূরবী রাগে আবার দুই মধ্যম স্বরের ব্যবহার পাওয়া যায়। কিন্তু তীব্রমধ্যম স্বরের প্রাধান্যই অধিক মাত্রায় থাকে। এরপর দ্বিতীয় বর্গের রাগ, যথা কল্যাণ, হাম্বীর, কেদারা প্রভৃতি রাগে ও তীব্রমধ্যম স্বরের মহত্ত্ব আছে, যদিও কেদারা ও হাম্বীর রাগে তীব্রমধ্যম স্বর অপেক্ষা শুদ্ধমধ্যম স্বরটি অধিক মাত্রায় প্রভাবিত। তারপর, তৃতীয় বর্গের রাগে আসলে অর্থাৎ গান্ধার কোমল স্বরযুক্ত রাগে শুদ্ধমধ্যম স্বরের প্রাধান্য এসে পড়ে। যেমন—বাগেশ্রী, কাফী, মালকোষ প্রভৃতি রাগ।

এই ভাবে যদিও মধ্যম স্বরের রূপ পরিবর্তনের কোন নির্দিষ্ট রূপরেখা বিশেষভাব নেই, তবুও সময় নিধারণের ক্ষেত্রে এর মহত্ত্ব আছে। যেখানে কিছু গরমিল পাওয়া যায়, তাকে যদি ব্যতিক্রম বলে ধরা হয়, তবে সাধারণ ভাবে কিছু সূত্র নির্ণয় করা যায়।

আবির্ভাব ও তিরোভাব—কুশলী সঙ্গীত শিল্পীরা রাগালাপ বা রাগ বিস্তারের সময় কোন কোনো আলাপের মধ্যে, কখন কখন বৈচিত্র্য প্রদর্শনের জন্য সম-প্রকৃতির রাগের ছায়া, মূল রাগের আলাপ বা বিস্তারের মধ্যে আনয়ন করেন এবং পুনর্বার মূল রাগের রূপের সাথে মিশে যায়। এরূপ ক্রিয়াকে সঙ্গীতজ্ঞেরা রাগের "আবির্ভাব ও তিরোভাব" বলে থাকেন। যখন কোনো রাগ গাইবার সময় কিছু সময়ের জন্য মূল রাগের রূপ অন্তর্হিত করা হয়, তখন তাকে "তিরোভাব" বলা হয়। এই তিরোভাব করার সময় সাধারণতঃ কোনো সম-প্রকৃতির রাগের ছায়াই দেখানো হয়ে থাকে। অথবা অন্য স্বরসমষ্টির সহায়তার দ্বারা মূল রাগের তিরোভাব করা হয়। কিন্তু রাগের এই তিরোভাব অধিক সময় পর্যন্ত রাখা যায় না। শীঘ্রই মূলরাগের রূপের স্বরসমষ্টির মধ্যে আবার প্রত্যাগমন করতে হয়।

রাগের তিরোভাব করার পরই আবার মূল রাগের রূপে ফিরে আসাকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"আবির্ভাব" বলা হয়। রাগে আবির্ভাব করার সময় রাগবাচক মুখ্য অঙ্গ ব্যবহার করতে হয় এবং তাহলেই রাগের আবির্ভাব ঘটে থাকে। "তিরোভাব" দুই প্রকারে করা হয়। প্রথমতঃ একটি রাগ গাওয়ার সময়, সমপ্রকৃতির অন্য আর একটি রাগের ছায়া অবলম্বনে। যেমন—'বসন্ত' রাগ গান করার সময় যদি নিষাধের উপর অধিকমাত্রায় ন্যাস করা হয়, তাহলে "পরজ" রাগের রূপের ছায়া এসে পড়ে এবং এভাবে "বসন্ত" রাগের তিরোভাব হবে। আবার এরূপ স্বর-বিন্যাস পরিবর্তন করে যদি "বসন্ত" রাগের রাগবাচক মুখ্য অঙ্গের স্বরবিন্যাস ব্যবহার করা হয়, তাহলে "বসন্ত" রাগের আবির্ভাব পুনর্বার ঘটবে। তিরোভাব ও আবির্ভাব করার পূর্বে, প্রথমে মুখ্য রাগের স্বরূপ নিশ্চিত রূপে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। তারপর সেই রাগ রূপের তিরোভাব ও শেষে আবির্ভাব, করা উচিৎ।

"বসন্ত রাগে" তিরোভাবের কিছু নমুনা স্বরলিপির দ্বারা দেখানো হল। যেমন—

(১) বসন্ত—প, মগ, মগ, মধরে,সা

(২) পরজ রাগের ছায়ার দ্বারা "বসন্তের" তিরোভাব—

রেসা, নিধনি, ধপ, মগ, মধ, নি, ধপ।

(৩) "বসন্তে"র আবির্ভাব—

মধসা, নিধ, প, মগ, মগ, মগ, রেসা।

ভৈরবী রাগে তিরোভব ও আবির্ভাব—

(১) ভৈরবী—সা, গমপ, ধপ, ম গমপধপমগম,গরেসা, ধ নি সা।

(২) মালকোষের ছায়ার সাহায্যে ভৈরবীর তিরোভাব—

নি নি

গ ম ধ, নি সা, ম ধ নি সা নি গ সা।

(৩) ভৈরবীর আবির্ভাব—

ম

নি রে, সা নি ধ, প, গমগ, গরে সারেসা।

মারবা রাগে তিরোভাব ও আবির্ভাব—

(১) মারবা—ধ নি, রে, গ ম ধ, ধ ম গ ম ধ,

(২) পুরিয়া রাগের ছায়ার সাহায্যে তিরোভাব—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নি, ধনি, ধমগ, মগ, নি়রেসা… ।

(৩) ধনিধ, ধ নি রে, গরে, ধ নি ধ সা।। এই ভাবে মারবা রাগের আবির্ভাব ঘটলো।

ভৈরব রাগে তিরোভাব ও আবির্ভাব—

নি নি নি

(১) ভৈরব—সা রে গ ম ধ ধ প, মপগম, ধ,… ।

(২) রামকেলী রাগের ছায়া অবলম্বনে তিরোভাব—প, মপ, গমগপ, গমরেগ, মপ… ।

(৩) ভৈরবের আবির্ভাব—

নি নি গ

গম ধ, ধ, মপ গমরে গরে, রে সা।

মূল রাগ গাওয়ার সময় সেই রাগের তিরোভাব বিশেষ দক্ষতার সাথে করা দরকার। জোরকরে অন্য কোন প্রকৃতির রাগের ছায়া, তিরোভাব করার সময়, টানাটানি করা উচিত নয়। ঠিক অবস্থায় এবং যথাস্থানে, উচিত প্রথায় খুব অল্পক্ষণের জন্য তিরোভাব হওয়া উচিত এবং তা এমন ভাবে হবে যে, এই ক্রিয়ায় আদৌ কোন অস্বাভাবিকতার পরিবেশ সৃষ্টি হবে না। তিরোভাব করার ঠিক পর মুহূর্তেই অত্যন্ত কুশলতার সাথে মূল রাগের আবির্ভাব করা দরকার, নচেৎ মূল রাগের রূপ নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকবে।

দ্বিতীয় প্রথা—কখন কখন অন্য কোনো রাগের ছায়ার সাহায্য ছাড়াও "তিরোভাব" করা যেতে পারে। এই প্রকার প্রথায় কোনো বিশিষ্ট স্বরবিন্যাস দ্বারা মূল রাগের রূপ কিছু সময়ের জন্য চাপা থাকে।

কাফী রাগে মধ্যম স্বরটি অতিমাত্রায় ব্যবহার করে তিরোভাব করা হয়ে থাকে। যেমন—

(১) কাফী—রে গ মপ, ধনি ধপ, মপ গ রে… ।

নি

(২) তিরোভাব—রে গ ম, প ধ র্স, ধ প ম, রে গ, সা রে ম,…

(৩) আবির্ভাব—প, ধনিসা, নিধপমগ, রে, রেগমপ, মপ মগ রেসা।

তিরোভাব আলাপ, বিস্তার বা গানের শেষাংশে করা উচিত। কারণ প্রথম অবস্থায় রাগের স্বরূপ ও পরিবেশ ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নচেৎ আবির্ভাব, তিরোভাব ক্রিয়ায় বিপরীত ফল হতে পারে।

রাগের রস—ভারতীয় সঙ্গীতে, সাহিত্যের নবরসের সূচনা পাওয়া যায় এবং তার অতি মহত্বপূর্ণ স্থান আছে। নবরস মানুষের জীবনের সূক্ষ্মরস বা ভাব। সঙ্গীত মানুষের অন্তর-প্রবৃত্তি ও মনোভাবের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

প্রত্যেক রাগ এক একটি রসযুক্ত হয়ে থাকে। তবে এ বিষয়ে সঙ্গীত-বিদ্‌গণ এখনও নিশ্চিতরূপে কোন রাগ, কোন রসের অন্তর্গত এবং কেন, তা নিশ্চিতভাবে বলতে সক্ষম হননি। কেবল এক অনুমান দ্বারাই এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও আমরা কয়েকটি রাগের রস নির্ধারণের বিষয়ে, নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি। যেমন—যোগিয়ারাগ করুণ রসের অন্তর্গত, মালকোষ রাগের রস শান্ত, এবং শংকড়া রাগের রস বীররসের অন্তর্গত, প্রভৃতি। এ বিষয়ে মতভেদ অবশ্য আছে। সাধারণ সঙ্গীতে অধিক রসের বর্তমান স্বীকার করা হয় না। করুণ, শৃঙ্গার, শান্ত, বীর ও ভক্তি প্রভৃতি রস সাধারণতঃ সঙ্গীতের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে বলে জানা যায়। আজকাল ছায়াচিত্রের পার্শ্বসঙ্গীতে ও আনুষঙ্গিক সঙ্গীতে রাগের বিভিন্ন স্বরবিন্যাস প্রয়োগ করে অন্যান্য রস ও ভাবের অবতারণার সফলরূপ দেখা যায় বটে, কিন্তু এ বিষয়েও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সাহায্যে অতিশয় মনোযোগ সহকারে গবেষণা ও অধ্যয়ণ, বিশেষভাবে দরকার।

যদি আমরা রসের সাধারণ অর্থ গ্রহণ করি, তাহলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক রাগের নিজস্ব এক রূপও ভাব আছে এবং তা আমাদের মনের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই সব রাগের সরসতা কণ্ঠসঙ্গীত বা যন্ত্রসঙ্গীত উভয়ের মধ্যেই অবশ্য বিদ্যমান দেখা যায়। প্রত্যেক রাগের স্বরূপ ও ভাব ফুটিয়ে তোলা শিল্পীর দায়িত্ব। শিল্পী যদি এ বিষয়ে অক্ষম হন তাহলে নির্দিষ্ট রাগের রূপ ও রস প্রকাশিত হবে না। আর যদি শিল্পী যথার্থ পরিবেশনের দ্বারা শ্রোতার মনে রস সঞ্চার করতে পারেন, তবে শিল্পীরও কৃতিত্ব যেমন প্রকাশ পায়, রাগের রস সৃষ্টিও যথাযথ ভাবে ঘটে। এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা অন্য এক অধ্যায়ে করা হল।

স্বস্থান নিয়ম—প্রাচীন কালে অনিবদ্ধ গানে এক প্রকার স্বস্থান নিয়মের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আলাপ প্রচলিত ছিল। এই স্বস্থান আলাপ গানে, রাগের সব লক্ষণগুলি বর্তমান তো থাকতোই এবং ক্রমানুসারে এক বিশেষ ঢংগে আলাপ গাওয়া হত। স্বস্থান আলাপে মুখ্য চার স্বস্থান আলাপের প্রচলন ছিল এবং ক্রমানুসারে একটির পর একটি আলাপ, গীত হত। এই চার স্বস্থান আলাপ পদ্ধতি নিম্ন প্রকারের ছিল। যথা—প্রথম স্বস্থান আলাপে "দ্বয়র্ধ" স্বরের নীচের স্বরগুলির মধ্যে আলাপ গাওয়া হত। "দ্বয়র্ধ" স্বরের নীচের স্বর, স্থায়ী অথবা রাগের মুখ্য বা বাদীস্বর হতে চতুর্থ স্বরকে "দ্বয়র্ধ" স্বর বলা হত। দ্বিতীয়তঃ স্বস্থান আলাপ গানে "দ্বয়র্ধ" স্বর পর্যন্ত আলাপ গান করা হত। তৃতীয় স্বস্থান আলাপে "অর্ধস্থিত" স্বরগুলিতে আলাপ করা হত। "দ্বয়র্ধ" এবং স্থায়ী হতে অষ্টম স্বর অর্থাৎ দ্বিগুণ এর মধ্যবর্তি স্বরগুলিকে "অর্ধস্থিত" স্বর বলা হত। (৪) চতুর্থ স্বস্থান আলাপ গানে দ্বিগুণ" স্বরের ও প্রয়োগ হয়ে থাকত এবং উহার উপরের স্বরগুলির ব্যবহার করতে করতে শেষে স্থায়ীর স্বরে, ন্যাস করা হত। এই প্রকার ক্রমিক চার প্রকারের বিস্তার স্বস্থান আলাপ গানে করা হত। আজকাল স্বস্থান আলাপ গানের নিয়মের কথা মনে রেখে আলাপ গান করা হয় না। কেবল মাত্র এক একটি স্বর তারপর দুটি দুটি করে স্বর যোগ করে বর্তমান আলাপ গানের বিস্তার করা হয়ে থাকে।

প্রাচীন রাগ লক্ষণ—হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে প্রচলিত দশ রাগ লক্ষণের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করা হল যা বর্তমান হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে দেখা যায়। প্রাচীন কালেও, রাগে দশটি মুখ্য রাগ লক্ষণ পাওয়া যেত এবং এগুলি সঙ্গীতের গায়কীর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট রূপ প্রকাশ পেত। এই দশ রাগ লক্ষণ হল, যথা, গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, ষাড়বত্ব, ঔরবত্ব, অল্পত্ব, বহুত্ব, মন্দ্র, এবং তার। গ্রহস্বর কোনো গীতের বা আলাপের প্রারম্ভিক বা শুরু করার স্বরটিকে বলা হত। বর্তমানে যেমন রাগের বাদীস্বরের প্রচলন আছে। পূর্বে রাগের মুখ্য স্বর-সমষ্টিকে "অংশস্বর" বলা হত। গীত অথবা আলাপের অন্তিম বা শেষ স্বরটিকে "ন্যাস" স্বর বলা হত। গীতের বা আলাপের ছোট ছোট উপরিভাগের অংশের শেষ স্বরটিকে "অপন্যাস" স্বর বলা হত। ষাড়বত্ব এবং ঔড়বত্ব রাগের জাতির সাথে সম্বন্ধযুক্ত ছিল। অর্থাৎ কোন রাগে কটি স্বর বর্জিত হবে তা স্মরণ রাখার সুবিধার জন্য ষাড়বত্ব, ঔড়বত্বের ব্যবহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ছিল। মন্দ্র এবং তার অর্থে রাগের দুদিকের ব্যবহৃত স্বরের অন্তিম সীমানা নির্ধারণ করত অর্থাৎ রাগটি আলাপ বা গীত হবার সময় মন্দ্রস্থানের সর্বনিম্নে কতটা এবং তার স্থানে সর্ব উচ্চে স্বর কতটা প্রস্তার লাভ করবে, তার নির্দেশ বহন করত। অর্থাৎ প্রাচীন রাগ লক্ষণের, রাগালাপে ও গানে মন্দ্র সপ্তকের নিদিষ্ট কোন স্বরটি পর্যন্ত স্বর প্রসারিত হবে এবং তার সপ্তকের সর্বোচ্চ কোন বিশেষ স্বরটি পর্যন্ত স্বর বিস্তারিত হবে তা "মন্দ্র ও তার" নামক রাগ লক্ষণ হতে বোঝা যেত। "অল্পত্ব" অর্থে রাগে কোন কোন স্বরের অল্প ব্যবহার হবে। অর্থাৎ যে বিশিষ্ট রাগে, যে স্বরগুলি অল্প ব্যবহৃত হবে, এবং যে স্বরগুলি অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হবে, তার স্পষ্ট নির্দেশ "বহুত্ব" নামক রাগ লক্ষণ হতে জানা যেত।

আধুনিক কালের সঙ্গীতে উপরিউক্ত পুরাতন দশ লক্ষণের মধ্য হতে কোনো কোনোটির ব্যবহার গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু তা ঠিক সম্পূর্ণ রূপে নয়। গ্রহ, মন্দ্র এবং তার এই তিন রাগলক্ষণের মহত্ব ও ব্যবহার আধুনিক কালের সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয় না।

বক্রস্বর, কণস্বর ও মীড়—রাগ গাওয়া এবং বাজাবার সময় রাগে সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য বক্রস্বর, কণস্বর এবং মীড়ের প্রভৃতি প্রয়োগ হয়ে থাকে। আরোহণ বা অবরোহণ করার সময় কোনো একটি স্বরে থেমে তার পূর্ববর্তী স্বরে প্রত্যাবর্তন করে আবার পরবর্তী স্বরে গমন করা হলে, যে স্বরটির উপর থেমে আবার পরবর্তী স্বরে গমন করা হয়, সেই স্বরটিকে "বক্রস্বর" বলা হয়ে থাকে। বক্রস্বর আরোহণ বা অবরোহণ উভয় দিকেই হয়ে থাকে। যেমন—"প নি ধ সাঁ"। এই আরোহণের স্বরগুলির মধ্যে নিষাদ স্বরটিকে "বক্রস্বর" বলা হয়। এরূপ "বক্রত্ব" অবরোহণেও করা হয়ে থাকে। যেমন—ছায়ানট রাগে "প, ম গ ম রে," এই অংশে গান্ধার স্বরটি বক্র। রাগে যে সব স্বর বক্রভাবে ব্যবহৃত হয়, সেই সব রাগে, সেই বক্রত্ব বজায় না রাখলে রাগের শুদ্ধতা ও সৌন্দর্য বিনষ্ট হতে পারে। যেমন—'হাম্বীর' রাগে গান্ধার স্বরের বক্রত্ব এবং শংকড়া রাগে নিষাদ স্বরটি বক্রভাবে অবশ্য ব্যবহৃত হয়।

রাগ গীত হবার সময় বা বাজাবার সময় কোনো স্বর যদি অন্য কোনো স্বরের স্পর্শের সাহায্যে উচ্চারিত হয়, তবে যে স্বরটির স্পর্শ লাভ করে, তাকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"স্পর্শ স্বর" বলা হয়। কোনো কোনো মতে "স্পর্শস্বর"কে কণস্বর বলা হয়ে থাকে। যেমন—পঞ্চম স্বরটি উচ্চারিত হবার সময় যদি ধৈবৎ স্বরটি স্পর্শ করে পঞ্চম স্বরটি গীত হয়, তবে ধৈবৎ স্বরটিকে "স্পর্শস্বর" বা "কণস্বর" আখ্যা দেওয়া হয়। কণস্বর বা স্পর্শস্বর স্বরলিপিতে মূল স্বরের বাম দিকে একটু উপরে ছোট অক্ষরে লিখিত থাকে। যেমন "ধপ"।

রাগ গীত হবার বা বাজাবার সময় এক স্বর হতে অন্য স্বরে যখন গড়িয়ে এবং সংযোগ রক্ষা করে যায়, তখন তাকে "মীড়" বলা হয়ে থাকে। এক স্বর হতে অন্য স্বরে যাবার সময় মধ্যবর্তি স্বরগুলিতে স্পর্শ লেগে যায় বটে কিন্তু কোনো স্বরটিরই পৃথক রূপে পরিস্ফুট হয় না। কেবলমাত্র যে স্বরটি হতে অন্য স্বরটিতে যায় সেই দুটি স্বরই স্পষ্টরূপ দৃষ্ট হয়। যেমন—প হতে গ স্বরটিতে যদি মীড় দিয়ে আসা যায়, তবে মধ্যম স্বরের অবশ্যই স্পর্শ লাগবে, কিন্তু মধ্যম স্বরের রূপটি প্রচ্ছন্ন থাকবে। দুটি স্বরকে একটি বন্ধনীর দ্বারা যুক্ত করে, স্বরলিপিতে মীড়ের চিহ্নের ব্যবহার হয়ে থাকে।

আশ্রয় রাগ—"ঠাট" হতে "রাগ" উৎপন্ন হয়, তাই "ঠাটকে" "জনকঠাট" বলা হয়ে থাকে। এবং "রাগ" ঠাট হতে উৎপন্ন হয় বলে রাগকে "জন্যরাগ" বলা হয়। অর্থাৎ সব ঠাটই "জনক" এবং সব রাগই "জন্য"।

কোনো ঠাটের, সব থেকে নিকটতম সম্পর্কিত রাগের নামানুসারে ঠাটের নামকরণ করা হয়, পূর্বেই তার বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং যাকে আশ্রয় করে অন্যরাগ সৃষ্টি হয় তাকেই সেই ঠাটের "আশ্রয় রাগ" বলা হয়। প্রত্যেক ঠাটের একটি "আশ্রয় রাগ" নিশ্চয় থাকে। যেমন—"ভৈরব" ঠাটের "আশ্রয় রাগ" "ভৈরব"। 'ভৈরবী ঠাটের' 'আশ্রয় রাগ' 'ভৈরবী'। ভৈরব ঠাটের অন্যান্য রাগের মধ্যেও ভৈরব আশ্রয় রাগের কিছু না কিছু অংশ এবং আধার অবশ্যই থাকবে। যেমন—'কালেংড়া'। এর সব স্বরই ভৈরব রাগের মতন। জনকঠাটের সব জন্য-রাগের মধ্যেই মুখ্য 'জন্যরাগের' আশ্রয়ের উপরই প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অন্য সব জন্যরাগের মধ্যে ওই আশ্রয় রাগের ছায়া বর্তমান থাকবে।

শুদ্ধ, ছায়ালগ এবং সংকীর্ণ রাগ—যে সমস্ত রাগ, নিজের নির্দিষ্ট নিয়মগুলি পালন করে ও শুদ্ধতা বজায় রেখে গীত হতে পারে এবং দ্বিতীয় কোনো রাগের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ছায়া মূল রাগে পরিস্ফুট হয় না, এরূপ রাগগুলিকে "শুদ্ধ জাতির" রাগ বলে অভিহিত করা হয়। যে সমস্ত রাগ শুদ্ধ রাগের নিয়ম ব্যতিরেকে অর্থাৎ গীত হবার সময় মূল রাগের সাথে দ্বিতীয় কোনো একটি রাগের ছায়া অবলম্বন করে বা মিশ্রিত হয়, তখন তাগে "ছায়ালগ বা ছায়ালগী" রাগ বলা হয়ে থাকে। তৃতীয় পর্যায়ে, যে সব রাগ গীত হবার সময় তিন বা ততোধিক রাগের ছায়ায় প্রভাবিত বা রূপ প্রাপ্ত হয়, তাকে সঙ্গীতশাস্ত্রে "সংকীর্ণ রাগ" বা "সংকীর্ণ জাতির রাগ" বলা হয়ে থাকে। যেমন—ইমন, বিলাবল, তোড়ী, মালকোষ প্রভৃতি রাগগুলি শুদ্ধ জাতির রাগের পর্যায়ে পড়ে। কারণ এই রাগগুলি গীত হবার সময় সাধারণতঃ অন্য কোন রাগের ছায়ায় প্রভাবিত বা মিশ্রিত হয় না। এরা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত রূপেই পরিস্ফুট থাকে। জয়জয়ন্তী রাগকে "ছায়ালগ" জাতির শ্রেণীতে রাখা হয়েছে। কারণ জয়জয়ন্তী রাগ গীত হবার সময় 'দেশ' রাগের ছায়া বিশেষভাবে পাওয়া যায়। অবশ্য 'দেশ' অঙ্গের 'জয়জয়ন্তী' গাইবার সময় দেশ রাগের ছায়া পাওয়া যায়। পিলু, সিন্ধু, কাফি প্রভৃতি রাগগুলি সংকীর্ণ জাতির রাগ। কারণ এই সমস্ত রাগগুলি পরিবেশিত বা গীত হবার সময় এক, দুই, বা ততোধিক রাগের ছায়ায় প্রভাবিত হয়। কোনো কোনো বড় রাগ ও সংকীর্ণ জাতির রাগ পর্যায়ে পড়ে। যেমন "খট্" রাগ প্রভৃতি।

বেঙ্কটমখীর ৪৮৪টি রাগ—বেঙ্কটমখী বাহাত্তর মেলের সাথে প্রত্যেক ঠাটে বা মেল হতে কিভাবে চার শত চুড়াশীটি রাগ রচিত হতে পারে, তার নিয়ম ও নির্দেশ করেছেন, তাঁর "চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা" নামক সঙ্গীত-শাস্ত্রগ্রন্থে। এই রচনা, রাগের জাতির উপর নির্ভর ও গণনা করে পাওয়া যায়। রাগ মুখ্যতঃ তিন জাতির শ্রেণীভুক্ত করা হয়, তা আমরা জানি। যেমন—সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব। কিন্তু বিশদভাবে দেখলে বা আরোহণ অবরোহণ বৈচিত্র্যে হিসাব করলে মোট নয়টি জাতি উৎপন্ন হয়, দেখা যায়। যেমন—১। সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ, ২। সম্পূর্ণ-ষাড়ব, ৩। সম্পূর্ণ-ঔড়ব, ৪। ষাড়ব-সম্পূর্ণ, ৫। ষাড়ব-ষাড়ব, ৬। ষাড়ব-ঔড়ব, ৭। ঔড়ব-সম্পূর্ণ, ৮। ঔড়ব-ষাড়ব ও ৯। ঔড়ব-ঔড়ব।

এখন যদি একটি ঠাট বিলাবল নিয়ে আলোচনা করা যায়, এবং উপরিউক্ত সর্বপ্রকার জাতির কতগুলি আরোহ-অবরোহ অথবা রাগ রচিত হতে পারে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করি তাহলে প্রথমে আমরা দেখতে পাব যে, সাত স্বরের ঠাট হতে সম্পূর্ণ আরোহ এবং সম্পূর্ণ আরোহযুক্ত, কেবল মাত্র একটিই রাগ রচিত হতে পারে। এবং সেটি হবে সা রে গ ম প ধ নি র্সা আরোহ, এবং র্সা নি ধ প ম গ রে সা অবরোহ। কিন্তু এই সাত স্বর হতে ছয়টি স্বরের ছয়টি ষাড়ব আরোহ পাওয়া যাবে। যেমন—সা রে গ ম প ধ নি একটি ঠাট। ষড়জ স্বরটি প্রত্যেকটি আরোহণেই থাকবে। ইহা ছাড়া ষড়জের সাথে আরো পাঁচটি স্বরযুক্ত হয়ে, তবে ষাড়ব আরোহী পাওয়া যাবে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি আরোহণে প্রতি বারে একটি করে স্বর বাদ পড়ে। যেমন—প্রথম বারে ঋষভ স্বরটি বাদ পড়লে—সা গ ম প ধ নি। আবার দ্বিতীয়টিতে গান্ধার স্বরটি বাদ পড়লে—সা রে ম প ধ নি। তৃতীয় বারে আবার যদি মধ্যম স্বরটি বাদ দেওয়া হয়, তবে—সা রে গ প ধ নি। এই ভাবে চতুর্থবারে পঞ্চম স্বরটি বাদ পড়লে—সা রে গ ম ধ নি। পঞ্চম বারে যখন ধৈবৎ স্বরটি বর্জিত হবে—সা রে গ ম প নি। ষষ্ঠ বা শেষবারে যখন নিষাদ স্বরটিকে ছাড়া হবে তখন—সা রে গ ম প ধ। এইভাবে 'ষাড়ব জাতির' মোট ছয়টি বিভিন্ন প্রকারের আরোহণ পাওয়া যায়। এই ছয়টি স্বরের ষাড়ব আরোহে যেমন ছয়টি বিভিন্ন প্রকারের আরোহণ পাওয়া যায়, তেমনি ছয়টি স্বরের ষাড়ব অবরোহণেও ছয়টি পৃথক অবরোহণ রচিত হয়। এখন দেখতে হবে সাত স্বরের সম্পূর্ণ ঠাট হতে ঔড়ব আরোহণ যুক্ত এবং ঔড়ব আরোহণ যুক্ত কয়টি স্বরূপ পাওয়া যায়। ঔড়ব আরোহণে মোট পাঁচটি স্বর ব্যবহৃত হয় আমরা জানি। অতএব উপরিলিখিত ঠাট হতে এক একবারে দুটি করে স্বর বর্জন করতে হবে। যেমন—প্রথমে ঋষভ ও গান্ধার স্বর দুটি বর্জিত করে পাঁচটি স্বরের আরোহণ হল। যেমন—সা, ম প ধ নি। তারপর দ্বিতীয়টি হল ঋষভ ও মধ্যম স্বর দুটি বর্জিত করে। যেমন—সা গ প ধ নি। ঠিক এই ভাবে তৃতীয় বারে ঋষভ স্বরের সাথে পঞ্চম স্বরটি বাদ দিতে হবে। যেমন—সা গ ম ধ নি চতুর্থ বারে ঋষভ ও ধৈবৎ স্বরদুটি বাদ পড়লে—সা গ ম প নি। এবং পঞ্চম বা শেষবারে ঋষভ ও নিষাদ স্বর দুটি একত্রে বর্জিত হলে—সা গ ম প ধ। প্রভৃতি মোট ঔড়ব জাতির পাঁচটি স্বর পাওয়া যায়। অর্থাৎ ঋষভের সাথে প্রতিবারে অন্য আর একটি করে স্বর বর্জিত করলে পৃথক পৃথক পাঁচটি আরোহণ পাওয়া যাবে। এইভাবে প্রতিবারে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গান্ধার স্বরের সাথে একটি করে স্বর বর্জিত করলে অর্থাৎ গান্ধার মধ্যম, গান্ধার-পঞ্চম, গান্ধার ধৈবৎ ও শেষে গান্ধার-নিষাদ, মোট চারটি পৃথক ঔড়ব জাতির আরোহণ পাওয়া যায়। আবার মধ্যম স্বরের সাথে প্রতি বারে অন্য আর একটি করে স্বর বর্জিত করলে, যথা—মধ্যম পঞ্চম, মধ্যম ধৈবৎ ও মধ্যম নিষাদ প্রভৃতি মোট ঔড়ব জাতির তিনটি পৃথক আরোহণ পাওয়া যায়। এরপড় পঞ্চম স্বরের সাথে, পঞ্চম ধৈবৎ, পঞ্চম নিষাদ প্রভৃতি বর্জিত করলে ঐড়ব জাতির মোট দুটি পৃথক আরোহণ পাওয়া যাবে। শেষে ধৈবং স্বরের সাথে নিষাদ বর্জিত করলে আরো একটি ঔড়ব জাতির আরোহণ পাওয়া যাবে। এই ভাবে ঔড়ব জাতির আরোহণ একটি ঠাটের মধ্যে মোট পঞ্চদশটি আরোহণ বা স্বররূপ পাওয়া যায়। ঠিক এই প্রথায় হিসাব করলে একটি ঠাটের মধ্যে মোট আরো পঞ্চদশটি পৃথক স্বররূপের অবরোহণ পাওয়া যায়।

এখন একটি আরোহণের সাথে অন্য আর একটি অবরোহণ যুক্ত করলে অনেকগুলি স্বররূপ বা রাগের উৎপত্তি হয়। উদাহরণার্থে—যদি সম্পূর্ণ জাতির রাগের উৎপত্তির হিসাব করা যায়, তাহলে দেখা যায়, যে সম্পূর্ণ জাতির আরোহণ ও অবরোহণ একটি করে হয় এবং সম্পূর্ণ জাতির একটি আরোহণ ও অবরোহণ যুক্ত করলে একটি মাত্র রাগ পাওয়া যায়। এরপর সম্পূর্ণ ষাড়ব জাতির রাগ সংখ্যার হিসাব করলে পর দেখা যাবে যে, এই জাতিতে মোট ছয়টি রাগের উৎপত্তি হবে। কারণ সম্পূর্ণ আরোহণ কেবল মাত্র একটি এবং ষাড়ব অবরোহণ ছয়টি পাওয়া যায়, যা পূর্বের হিসাব অনুসারে প্রমাণিত, দেখা গেছে। এই ভাবে সম্পূর্ণ ঔড়ব জাতির আরোহণ অবরোহণ বা রাগের সংখ্যা পাওয়া যাবে মোট পঞ্চদশটি। কারণ সম্পূর্ণ আরোহণ মাত্র একটি এবং ঔড়ব জাতির অবরোহণ হতে পঞ্চদশটির নজির পূর্বেই দেখা গেছে। এই তিন জাতির পর, ষাড়ব-সম্পূর্ণ, ষাড়ব-ষাড়ব ও ষাড়ব-ঔড়ব জাতির রাগের উৎপত্তি হবে। তার সংখ্যা হবে হয় ছয়, ছত্রিশ ও নব্বই। ষাড়ব-ষাড়ব জাতির রাগের সংখ্যা এজন্য ছত্রিশ হবে যে, ছয়টি ষাড়ব আরোহণের সাথে প্রতিবারে মোট ছয়টি পৃথক পৃথক অবরোহণ যুক্ত হবে। এই ভাবে মোট (৬×৬=৩৬) ছত্রিশটি পাওয়া যায়।

ষাড়ব-ঔড়ব জাতির রাগের সংখ্যা মোট নব্বইটি হবে। কারণ ছয়টি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ষাড়ব আরোহনে প্রতিবারে ক্রমশঃ পঞ্চদশটি পৃথক পৃথক ঔড়ব অবরোহণ যুক্ত হলে (৬×১৫=৯০) মোট নব্বইটি। এরপর ঔড়ব-সম্পূর্ণ জাতির আরোহণ অবরোহণ বা রাগ সংখ্যা পঞ্চদশটি পাওয়া যাবে এবং ঔড়ব ষাড়ব জাতির আরোহণ অবরোহণ বা রাগ সংখ্যার উৎপত্তি হবে মোট (১৫×১৫=২২৫) দুই শত পঁচিশটি। নিম্নলিখিত তালিকায় একটি ঠাট হতে জাতিভেদ আধারের উপর মোট চার শত চুড়াশীটি (৪৮৪) রাগের উৎপত্তি আরো স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাবে।

তালিকা—

১।	সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ জাতির রাগ	…	…	১
২।	সম্পূর্ণ—ষাড়ব জাতির রাগ	…	…	৬
৩।	সম্পূর্ণ—ঔড়ব জাতির রাগ	…	…	১৫
৫।	ষাড়ব—সম্পূর্ণ জাতির রাগ	…	…	৬
৮।	ষাড়ব—ষাড়ব জাতির রাগ	…	…	৩৬
৬।	ষাড়ব—ঔড়ব জাতির রাগ	…	…	৯০
৬।	ঔড়ব—সম্পূর্ণ জাতির রাগ	…	…	১৫
৮।	ঔড়ব—ষাড়ব জাতির রাগ	…	…	৯০
৯।	ঔড়ব—ঔড়ব জাতির রাগ	…	…	২২৫

একটি ঠাট হতে উৎপন্ন মোট রাগ সংখ্যা হল=৪৮৪টি। অতএব বাহাত্তর মেল বা ঠাট হতে মোট উৎপাদিত রাগ সংখ্যা হবে (৭২×৪৮৪=৩৪৮৪৮) চৌত্রিশ হাজার আট শত আটচল্লিশটি। ভারতীয় রাগ সংখ্যা আরো বেশী হতে পারে, কারণ উপরিউক্ত রাগ সংখ্যা কেবল রাগের জাতিভেদের উপর বিচার ও গণনা করা হয়েছে। এরপর বাদীসম্বাদী, গ্রহ, অংশ স্বর প্রভৃতির পরিবর্তনে, পকড় চলন প্রভৃতি ভেদে আরো অসংখ্য নূতন রাগের রচনা হতে পারে। কিন্তু রাগ অসংখ্য হতে পারে না এজন্য যে, রাগ রচনার ক্ষেত্রে কয়েকটি অবশম্ভাবী নিয়ম রাগে নিশ্চয়ই বর্তমান থাকে বা রাখতে হবে। যেমন রাগে রঞ্জকতা না থাকলে আদৌ রাগ হবে না। হিসাবের দ্বারা নূতন নূতন বহু স্বরবিন্যাস রচিত হতে পারে, কিন্তু স্বর বিন্যাসের সেই রূপগুলি "রাগ" নামে গৃহীত হবে, যেগুলির স্বরবিন্যাস, রঞ্জকতা, মাধুর্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। এর মধ্যে অনেকগুলি স্বর রচনা বা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাগ কর্ণাটক পদ্ধতির অন্তর্গত হয় এবং সেগুলির মধ্যে উপরিউক্ত গুণগুলি না থাকায়, সেগুলি উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে রাগ পর্যায়ে গৃহীত হয় নি। রঞ্জকতা প্রভৃতি রাগের নিয়মগুলি পালন করে রাগের সংখ্যা বর্তমানে কি হতে পারে তা দেখা দরকার। যেহেতু বাহাত্তর ঠাট পদ্ধতি উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের ঠাট নয় সেজন্য উপরিউক্ত বাহাত্তর ঠাট হতে উদ্ভূত রাগগুলি কর্ণাটক সঙ্গীতেই উপযুক্ত হবে। তবে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত, দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটক সঙ্গীতের আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেজন্য দক্ষিণ ভারতীয় অন্যান্য উপযুক্ত রাগও উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে আজ অনুপ্রবেশ করতে দেখা যায়। রাগাধ্যায়ে এই রাগের সংখ্যার তালিকা, ঔপপত্তিক বিবরণ সহ আলোচিত হয়েছে।

সঙ্গীতে গমক—ভারতীয় সঙ্গীতে যত প্রকার গায়কীর অলঙ্কার আছে, তার মধ্যে "গমক" একটি প্রধান শৈলী। প্রাচীন অথবা মধ্যকালের "গমক", এক বিশেষ প্রকারের স্বরের উচ্চারণ, যার দ্বারা শ্রোতার চিত্তে মনোরঞ্জন হয়।

"স্বরস্য কম্পো গমকঃ শ্রোতৃ চিত্ত সুখাবহঃ।" (সঙ্গীত রত্নাকর)

আধুনিক দক্ষিণ ভারতীয় অথবা কর্ণাটকী সঙ্গীতে ও গমকের প্রভাব স্বীকৃত। শাস্ত্রে নিম্নলিখিত পঞ্চদশ প্রকার গমকের উল্লেখ পাওয়া পাওয়া যায়। যেমন :—

(১) কম্পিত, (২) আন্দোলিত, (৩) আহত, (৪) প্লাবিত, (৫) উল্লাসিত, (৬) স্ফুরিত, (৭) ত্রিভিন্ন, (৮) বলী, (৯) হুম্ফিত, (১০) লীন, (১১) তিরিপ, (১২) মুদ্রিত, (১৩) কুরূলা, (১৪) নামিত, (১৫) মিশ্রিত। কর্ণাটকী সঙ্গীতে উপরিউক্ত প্রকারের গমক হতে অনেকগুলি গমকের প্রয়োগ আজও দেখা যায় এবং সেগুলি গমকের নামকরণই করা হয়েছে। কিন্তু উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে অর্থাৎ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে গমক শব্দের প্রয়োগ এই অর্থে হয় না। যদিও উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে গমকগুলি অন্য কোনো না কোনো নামে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পার্থক্য শুধু এই যে, উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে এই সৌন্দর্য উৎপাদক বিশিষ্ট স্বর-কম্পনগুলিকে "গমক" বলে নামকরণ করা হয় না। বরং এগুলির পৃথক অন্য কোনো নাম রাখা হয়েছে। যেমন—খট্‌কা, মূর্কী, গিট্‌কিরি, জমজমা, মীড় প্রভৃতি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাথে সাথে আরো একটি কথা জানা যায় যে, আজকাল, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে "গমক" শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। হৃদয়ের মধ্যে জোড়ে শ্বাস গ্রহণ করে উচ্চৈস্বরে গাম্ভীর্য সহকারে তান বা স্বরের উচ্চারণকেই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে (কোনো কোনো মতে) গমকের নামকরণ করা হয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে গমকের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা তো নিশ্চয়ই গ্রহণ যোগ্য এবং ইহার বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে আধুনিক গমককেও একপ্রকার গ্রহণ করলে ভাল হয়।

প্রাচীন পঞ্চদশ প্রকার গমকের মধ্যে কয়েকটি মুখ্য গমকের স্বরূপ নিম্নে দেওয়া হল।

কম্পিত গমক—বীণা অথবা সেতারে একবারে আঙ্গুলের দ্বারা দুটি স্বরকে দ্রুত ভাবে বাজালে, যে প্রকার ধ্বনির উৎপাদন হয়, তাকে "কম্পিত গমক" বলা হয়। যেমন—বাঁ হাতের মধ্যমাঙ্গুলী যদি ঋষভ পর্দার উপর থাকে এবং তর্জনী ষড়জ পর্দার উপর রেখে দক্ষিণ হস্তের দ্বারা "দা" বাজানো হয় এবং বাজাবার ঠিক পর মুহূর্তেই তাড়াতাড়ি কেবলমাত্র মধ্যমাঙ্গুলিকে এক ঝটকায় তারের উপর হতে সরিয়ে লওয়া হয়, তাহলে 'মিজ্‌রাফের' এক আঘাতে যে দুটি স্বর, ঋষভ ও ষড়জ চকিত গতিতে উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রকৃত 'কম্পিত গমক' নামে অভিহিত হয়। আজকালকার সেতার বাদন

রে

পদ্ধতিতে ইহাকে "জমজমা" বলা হয়। যেমন— সা। সেতার বাজাবার সময় এই জমজমা ব্যতীত আজকাল সেতার বাজবেই না। উপরিউক্ত এই অলঙ্কারীক স্বর বিন্যাস বা স্পর্শস্বরকে গায়কীতে মূল স্বরের "খট্‌কা" বলা হয়। জমজমা অথবা খট্‌কার পূর্বে বা পরে, উভয় দিকেই স্বরের স্পর্শ, কণ

রে

অথবা অলঙ্কারিক স্বর রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন—সা

নি়

অথবা সা ।

কিন্তু আজকাল উত্তর ভারতে জমজমা বা খট্‌কা বলতে "কম্পিত গমক" নাম স্বীকার করা হয় না। কম্পিত গমক বলতে, কম্পনযুক্ত, অর্থাৎ একটি সুরের উপর স্থায়ী হয়ে সুরটির কম্পন সৃষ্টি করার নামই 'কম্পিত গমক' (Tremolo) বলা হয়। যেমন—সা ⌒⌒⌒ আ ⌒⌒⌒ আ ⌒⌒⌒ আ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

⌒⌒ আ ⌒⌒ আ ⌒⌒ ।

স্ফুরিত গমক—বীণা অথবা সেতারের তারের উপর তুবার তুটি স্বরের উপর কম্পিত গমকের ন্যায় বাজাইলে "স্ফুরিত গমকের" উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ কম্পিত গমককে একাধিকবার দ্রুত গতিতে বাজালে 'স্ফুরিত গমক'

রে রে,

পাওয়া যায়। যেমন— সা সা প্রভৃতি। কিন্তু ইহার অর্থও আজকাল পরিবর্তিত হয়েছে এবং স্ফুরিত গমকের ক্ষেত্র বর্দ্ধিত করে মূল স্বরের পূর্ববর্তি এবং পরবর্তি, উভয় স্বরকে, মূল স্বরের সাথে যুক্ত করে ঝটকার সাহায্যে মূল স্বরের মিশ্রিত রূপ সৃষ্টি করে 'স্ফুরিত গমক' উৎপন্ন করা হয়। ইহার অর্থ এই যে, মিজরাফের একটি আঘাতে বাঁহাতের আঙ্গুলের তুই, তিন, বা চারটি স্বর দ্রুততার সঙ্গে একত্রে বাজানো। এই মতের আধারের উপর 'স্ফুরিত গমক' তিন প্রকারের মানা হয়।

রে

(ক) জমজমা— সা, অর্থাৎ মিজরাফের একটি আঘাতে দ্রুতগতিতে

রেসা

তুটি স্বর বাজানো। (খ) মূর্কী— নি, অর্থাৎ মিজরাফের এক আঘাতে তিনটি স্বর দ্রুতগতিতে একত্রে বাজানো। মূর্কী বাজাবার সময় জমজমা বাজাবার পর বাম হস্তের তর্জনীকে ঘসে নিষাদ পর্দা পর্যন্ত দ্রুত টেনে নামানো হয়। (গ) গিট্‌কিরী—রে সা নি সা বা (সা) অর্থাৎ মিজরাফের এক আঘাতে চারটি স্বর দ্রুতগতিতে বাজানো। মূর্কী বাজার পর বামহস্তের মধ্যমাঙ্গুলিকে শীঘ্র ষড়জেরপর ঝট্‌কা দিয়ে টেনে আনা এবং এইভাবে শেষের ষড়জ স্বরটিতে শেষ হয় ও এক আঘাতেই 'রে সা নি সা' দ্রুতগতির সঙ্গে উৎপন্ন হয়।

কখন কখনও মূর্কী অথবা জমজমা ব্যাপক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, মিজরাফের এক আঘাতে যতগুলি স্বর দ্রুতগতিতে একত্রে ধ্বনিত হয়, তাকে "মূর্কী" বলা হয়। গায়কীতেও মূর্কীর ব্যবহার আছে এবং তাহাও ব্যাপক অর্থে। গায়কীতে তুটিস্বর ঝট্‌কার সাথে উচ্চারিত হলে, এবং একটি স্বর কণস্বর রূপে ব্যবহৃত হলে তাকে 'খট্‌কা বলা হয়। আর তুই স্বরের অধিক স্বর দ্রুত গতিতে একত্রে প্রয়োগ হলে তাকেও গায়কীতে "মূর্কী বলা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রেসা
হয়। যেমন— নি, রেসানিসা, (প৷ মপধপ প্রভৃতি।

আহত গমক—আহত গমক বলতে মূল স্বরের আগে ও পরের অলঙ্কারিক স্বরে ঝট্‌কা দিয়ে মূল স্বরের উচ্চারণ স্পষ্ট করে, তাকে গায়কীতে "খট্‌কা"

সা গ

বলা হয়। যেমন— রে, রে। ইহাই বাস্তবিক আহত গমকের মুখ্য রূপ। জমজমা, এই আহত গমকের আধারের উপরই রচিত, কিন্তু পার্থক্য এই যে, জমজমায় গাম্ভীর্যপূর্ণ ঝট্‌কায় হয় না। আহত গমকে ঝট্‌কা, জোরের সাথে দেওয়া হয় এবং এই ভাবে আহত গমক, জমজমা হতে পৃথক ভাব দেখা যায়। যদি সেতারের বা বীণার একটি পর্দার উপর গাম্ভীর্যপূর্ণ-

নি
ভাবে 'সা বাজানো হয়, যথা নিষাদ পর্দার উপর হাত রেখে তারটিকে টান দিয়ে ষড়জ সুর নির্গত করা হয়, তা হলে আহত গমক উৎপন্ন হবে। যদি নিষাদ এবং ষড়জ দুটি পর্দাকে একটি মিজরাফের আঘাতে বাজানো হয় এবং বীণার বা সেতারের তারটিকে টান না দিয়ে বাজানো হয় তাহলে 'জমজমা' উৎপন্ন হয়। শাস্ত্রে আহত গমকের ও কয়েকটি প্রকার আছে। যেমন—প্রত্যাহত, দ্বিরাহত, প্রভৃতি গমক।

আন্দোলিত গমক—কোনো মূল স্বরের পূর্বের অথবা পরবর্তি স্বরের সাহায্যে দোলার ন্যায় আন্দোলন করাকে 'আন্দোলিত গমক' বলা হয়। এই আন্দোলন করার সময় মূল স্বরের সাথে অন্যান্য স্বরগুলিতে মীড়ের প্রভাব থাকে। এই ভাবে মীড়ের প্রভাব থাকায় আন্দোলিত গমক

ম ম
জমজমা প্রভৃতি হতে পৃথক হয়। যেমন—ম গ গ গ ম।

প্লাবিত গমক—ধ্বনিকে খণ্ডিত না করে একটি স্বর হতে অন্য স্বরে গড়িয়ে যাওয়াকে "প্লাবিত গমক" বলা হয়। এই গমককে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে 'মীড়' বলা হয়। একটি স্বর হতে অন্য একটি স্বরে ঘর্ষণ করে অথবা মধ্যবর্তি স্বরগুলিকে স্পর্শ করে যাওয়াকে "মীড়" বলা হয়। গায়কীতেও ইহাকে মীড় বলা হয়ে থাকে এবং ইহাকে কখন কখন 'লচক্' বলা হয়ে থাকে। সেতার অথবা বীণার একটি পর্দার উপর আঙ্গুলের দ্বারা তারকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

টেনে মীড়ের সৃষ্টি করা হয় এবং এই সব বাদ্যযন্ত্রে মীড়ের মহত্ত্ব অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এসরাজ, দিলরুবা, বেহালা এবং সারেঙ্গী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে ছরির সাহায্যে বাজানো হয়। এই সব বাদ্যযন্ত্রে তারকে টেনে মীড় উৎপন্ন করা হয় না। তারের উপর আঙ্গুল রেখে এক পর্দা হতে অন্য পর্দায় আঙ্গুলটিকে ঘসে মীড়ের উৎপত্তি করা হয়। কিন্তু এই প্রকার মীড়কে এই সব বাদ্য যন্ত্রে 'ঘসিট' বা "সুত" বলা হয়ে থাকে। 'ঘসিট্' শব্দের প্রয়োগ কখন কখন সেতার বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রেও হয়। যেমন—একটি স্বরের পর্দা হতে অন্য আর একটি স্বরে দ্রুতগতিতে অঙ্গুলির দ্বারা ঘসে যাওয়া এবং মধ্যবর্তি স্বরগুলিকে স্পর্শ করা হবে। সেতার বাজাবার সময় এই প্রকার পদ্ধতিকে সেতারে 'ঘসিট' বলা হয়ে থাকে। মীড়, একই পর্দায় আঙ্গুল রেখে তারকে টেনে মীড়ের উৎপাদন করা হয়, কিন্তু 'ঘসিট' করার সময় তারকে টানা হয় না।

উহথাসিত গমক—এই প্রকার গমকে স্বর ক্রমানুসারে নীচ হতে উপরে

সা সা

অথবা উপর হতে নীচে আন্দোলিত হয়। যেমন— রে রে সা

রে রে ম ম

ম ম রে, প প ম, প্রভৃতি। ইহার আর এক নাম "গদগদীত গমক"।

ত্রিভিন্ন গমক—তিন সপ্তকের একই স্বরগুলিকে দ্রুতগতিতে বাজানো বা গাওয়াকে 'ত্রিভিন্ন গমক' বলা হয়ে থাকে যেমন—রেসা, রেসা, রেসা প্রভৃতি।

তিরিপ গমক—তিরিপ গমকে দ্রুতলয়ে মাত্রার চতুর্থাংশ স্বরগুলির প্রযোগ হয়।

বলী গমক—এই প্রকার গমকে স্বরগুলি চক্রাকারে ঘোরে। যেমন— রেসানিসা, গরেসারে প্রভৃতি।

হুম্ফিত গমক—হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে কোনো সময় স্বর খাড়াভাবে ব্যবহৃত হয় না, উহা পার্শ্ববর্তি বা মধ্যবর্তি কোনো না কোনো শ্রুতি বা স্বরের স্পর্শ আপনা হতেই পায় এবং তা হয় তো খুব প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে। আর যদি এই স্বরটি স্পষ্ট রূপে থাকে তবে তাকে জমজমা বলা হবে। কিন্তু যে স্বর বা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বরের শ্রুতি, যে রাগে বর্জিত অথবা বর্জিত নয় সেই স্বর বা স্বরের শ্রুতি সেই রাগে প্রচ্ছন্ন রূপে ও সুন্দরভাবে কোনো কোনো সময় ব্যবহৃত হয়। এই প্রকার সুন্দররূপে ও প্রচ্ছন্নভাবে স্বরের ব্যবহারে একটি স্বরের বিন্যাসের উঠা নামাকে "হুম্ফিত গমক" বলা হয়।

এইভাবে অন্যান্য গমকেরও ব্যাখ্যা প্রাচীন ও মধ্যকালীন সঙ্গীত শাস্ত্রে অবশ্যই পাওয়া যায়, কিন্তু তার ব্যাখ্যায় বা পরিভাষায় পূর্ণ অর্থ প্রতীয়মান হয় না। হুম্ফিত গমকেও স্পষ্ট অর্থ পাওয়া মুস্কিল।

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে গমক প্রয়োগের অর্থ এই যে, বক্ষ হতে জোর ও গাম্ভীর্য সহকারে স্বরোৎপাদন, এবং এই গমক, মীড়, খটকা ও মুর্কী প্রভৃতি হতে স্বতন্ত্র। ধ্রুপদ গায়কীতে গমকের প্রয়োগ অধিক মাত্রায় হয়ে থাকে। নোম, তোম্ প্রভৃতি বাণীযুক্ত আলাপ গানের শেষাংশেও দ্রুতলয়ের গমকযুক্ত স্বরবিন্যাসের ব্যবহার করা হয়। খেয়াল গায়কীর তানেও গমকযুক্ত তানের ব্যবহার হয়ে থাকে।

স্পর্শস্বর বা কণস্বর, কাকে বলে পূর্বেই তা বলা হয়েছে। গান বা বাজনার সময় মূল স্বরের সাথে যে সব স্বর স্পর্শ করে অলঙ্কারিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়, তাকে "কণ" স্বর বা "স্পর্শ" স্বর বলা হয়ে থাকে।

রে

(২) দ্বিতীয় যেমন "অনুলগণ কণ" যেমন—সা । মূল স্বরটি প্রথমে বলার পর শেষাংশে ঋষভ স্বরটি স্পর্শ করে। 'অনুলগন কণ' স্বরের প্রয়োগে রাগ বিস্তার অতি সুন্দররূপে প্রতিভাত হয়।

উঠাও এবং চলন—কোনো রাগ গাওয়া আরম্ভ করার সময়, সেই রাগের জন্য নির্দিষ্ট যে মুখ্য রাগবাচক স্বরগুলি থাকে, সেই স্বরগুলি প্রথমে গাওয়া হয়ে থাকে। এই স্বরসমষ্টিকে উঠাও বলা হয়ে থাকে। রাগের পূর্বাঙ্গের এবং উত্তরাঙ্গের "উঠাও" সর্বসময়ে স্বতন্ত্রভাবে নিশ্চিত থাকে। কখন কখন একই রাগের পূর্বাঙ্গে ও উত্তরাঙ্গে একাধিক রকমের "উঠাও" পাওয়া যায়।

উদাহরণার্থে—গৌরসারং রাগের পূর্বাঙ্গের উঠাও—সা, মগ, প, মপ, বা সা গ রে, মগ, প মপ। এর মধ্যে দ্বিতীয়টিই মুখ্য উঠাও। ইহার উত্তরাঙ্গে দুটি উঠাও হতে পারে। প, প, সাঁ এবং প, নিধ, সাঁ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইভাবে গৌড়মল্লার রাগেও, যেমন—সা, মরে, প, মপ, সাধ, সা এবং নি সা, রেগ ম, মপম, মপধনি সা। এই দুটি উঠাওই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উঠাও এর ব্যবহারে প্রথমতঃ রাগের পরিচয় স্পষ্ট হয় এবং কোনো প্রকার ভ্রম হয় না এবং দ্বিতীয়তঃ ইহার প্রভাবে শ্রোতার নিকটও রাগবাচক রূপ ও সৌন্দর্য স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

রাগ গীত হবার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত এবং পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গ পর্যন্ত, উহার ঠাট, স্বর, বাদী, সম্বাদী, বিবাদী, ন্যাস, উত্তরাঙ্গ ও পূর্বাঙ্গ প্রাধান্য পকড় প্রভৃতি নিয়মগুলি, অবলম্বন করে, নানা প্রকারের স্বর সমুদয়ের দ্বারা আলাপ বা বিস্তার করার ক্রিয়াকে "চলন" বলা হয়ে থাকে—চলন শব্দের সাধারণ অর্থ হল স্বর বিস্তারের বিধি। অর্থাৎ রাগের চলন হতেই রাগের বিস্তার বা আলাপ কি ভাবে করা উচিত তার পরিচয় মেলে। প্রত্যেক রাগের এক একটি পৃথক চলন থাকে, যা অন্য রাগ হতে পৃথক। একটি রাগে অন্য কোনো রাগের চলনের কিছু সাদৃশ্য থাকতে পারে, কিন্তু তার একটা নিজস্ব পৃথক রূপ নিশ্চয়ই থাকবে যার দ্বারা অন্য কোনো রাগের চলন হতে সেটি পৃথক বোধ হবে। চলনের অন্তর্গত রাগবাচক মুখ্য স্বর, বাদী, সম্বাদী, বিবাদী, আরোহ-অবরোহ ও ন্যাস প্রভৃতি স্বরের মহত্ত্ব বিশেষভাবে থাকে।

স্থায়, মুখচালন, আক্ষিপ্তিকা ও বিদারী—স্থায়, ছোট ছোট স্বর সমুদয়ের এক একটি সমষ্টিকে "স্থায়" বলা হয়ে থাকে।

মুখচালন—বিবিধ অলঙ্কার যথা, মীড় ও গমক প্রভৃতির প্রয়োগ দ্বারা স্বর বিস্তার করাকে "মুখচালন" বলা হয়ে থাকে।

আক্ষিপ্তিকা—স্বর, শব্দ ও তালযুক্ত কোনো রচনাকে 'আক্ষিপ্তিকা' বলা হয়ে থাকে। ধ্রুপদ, ধামার ও খেয়াল প্রভৃতি রচনাগুলি 'আক্ষিপ্তিকার' অন্তর্গত বলা হয়ে থাকে।

বিদারী—গান অথবা আলাপের ছোট ও বড় ভাগগুলিকে 'বিদারী' বলা হয়ে থাকে। প্রাচীন প্রবন্ধ, বস্তু ও রূপক প্রভৃতি নিবদ্ধ গানগুলি, যেগুলি উদ্‌গ্রাহ, ধ্রুব, মেলাপক, অন্তরা ও আভোগ প্রভৃতি পাঁচ ধাতুযুক্ত হত, সে ধাতুগুলিও "বিদারী" পর্যায়ের মধ্যে অন্তর্গত ছিল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আধুনিক স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, ও আভোগ ভাগগুলিও 'বিদারী'র অন্তর্গত হবে এবং ইহার ছোট ছোট উপবিভাগগুলিও 'বিদারী' পর্যায়ের মধ্যে পড়বে। গানের বিদারী ভাগের অন্তিম স্বরকেই ন্যাস, অপন্যাস প্রভৃতি বলা হয়।

পরমেল প্রবেশক রাগ—যে রাগে গীত হবার সময় একটি মেল বা ঠাট হতে অপর একটি মেল বা ঠাটে প্রবেশ করে তাকে "পরমেল প্রবেশক রাগ" বলা হয়। যেমন—

রাগ 'জয়জয়ন্তী' একটি "পরমেল প্রবেশক রাগ"। কারণ ইহা যখন গাওয়ার শুরু করা হয়, তখন ঋষভ, ধৈবত শুদ্ধ স্বরযুক্ত বর্গের বা মেলের রাগের সময়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে, কিন্তু যখন সমাপ্ত হয়, তখন গান্ধার ও নিষাদ কোমল স্বরযুক্ত বর্গের বা মেলের রাগের সময় শুরু হচ্ছে এবং সাথে সাথে জয়জয়ন্তী রাগে এই দুই বর্গের মেলের বিশেষত্বও কিছু না কিছু থাকে। যেমন ঋষভ, ধৈবত শুদ্ধ স্বরযুক্ত বর্গের রাগে ঋষভ, গান্ধার ও ধৈবৎ স্বর শুদ্ধ হওয়া উচিত এবং জয়জয়ন্তী রাগেও এই তিন স্বর শুদ্ধ রূপযুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। আর দ্বিতীয় বর্গের বৈশিষ্ট্য হল, কোমল গান্ধারের বর্তমান এবং জয়জয়ন্তী রাগে কোমল গান্ধার ও নিষাদ স্বরের ব্যবহারও আছে। এইভাবে জয়জয়ন্তী রাগ প্রথম হতে কোমল গান্ধার স্বরযুক্ত বর্গের আভাষ জানিয়ে দেয়।

মারবা রাগকেও এক দৃষ্টিকোণ হতে 'পরমেল প্রবেশক' রাগ বলা যেতে পারে। কারণ "সন্ধিপ্রকাশ রাগে"র বর্গের বৈশিষ্ট্য হল, ঋষভ স্বরটি কোমল হবে এবং সাথে সাথে পরবর্তি বর্গের রাগে ঋষভ ও ধৈবৎ শুদ্ধ স্বরযুক্ত হবে এবং শুদ্ধ ধৈবতের ব্যবহারে মারবা রাগেও পরবর্তি বর্গের আভাষ পাওয়া যায়। সংকীর্ণ ও প্রচলিত আরো কয়েকটি রাগ পরমেল প্রবেশক রাগের অন্তর্গত হতে পারে। যেমন—প্রাতর্গের রাগ—ভৈরব বাহার, আনন্দ ভৈরব, প্রভৃতি এবং সারংগের রাগ, যেমন—পিলু, পুরিয়া-কল্যাণ প্রভৃতি এবং রাত্রিকালের মালগুঞ্জী প্রভৃতি।

গীত—বাণীযুক্ত চিত্তপ্রসন্নকারী স্বরসমুদয়ের সমষ্টিই শাস্ত্রে "গীত" বলা হয়েছে এবং ইহার দুটি ভেদ আছে। যেমন—গন্ধর্ব ও গান। গন্ধর্বলোকে যে সঙ্গীত গীত হত, তাকেই গন্ধর্বগীত বলা হত। এই গানের মুখ্যভাব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ছিল 'মোক্ষপ্রাপ্তি' এবং গন্ধর্বগীত অপৌরুষেয় এবং শব্দপ্রধান ছিল। গন্ধর্বসঙ্গীতকে "মার্গসঙ্গীত" বলা হত, কারণ এই সঙ্গীতের মধ্যেই মোক্ষপ্রাপ্তির উপদেশ ও নির্দেশ থাকত।

গান—বিভিন্ন দেশের সঙ্গীত, যা পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত এবং দেশের রুচি অনুযায়ী দেশী রাগে নিবদ্ধ ও যার প্রধান লক্ষ্য থাকত লোকরঞ্জনের প্রতি। এই প্রকার রচনাগুলি 'গান' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। গানেরই আর একনাম "দেশী সঙ্গীত"। গন্ধর্ব বা উপরিউক্ত মার্গসঙ্গীত আজ প্রচলিত নেই। কেবল উপরিউক্ত দেশী সঙ্গীতের প্রচার আছে এবং ইহাও যুগের ও সময়ের পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। বিভিন্ন অঞ্চলের রুচি এক না হওয়ায় এবং ভারতের ন্যায় এক বিরাট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সংস্কৃতি ভেদে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের সঙ্গীত বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে এবং সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গেও সঙ্গীত সেইরূপে পরিবর্তিত হয়ে আসছে। কারণ, সময় বদলাবার সঙ্গে মানুষের রুচিরও পরিবর্তন হয়ে আসছে দেখা যায়।

গানের মধ্যে দুটি ভাগ বরাবরই পাওয়া যায়। যথা নিবদ্ধ গান ও অনিবদ্ধ গান। নিবদ্ধ গান, আমরা সেই গানকে বলি, যা কোনো তালে "নিবদ্ধ" থাকে। আর অনিবদ্ধ গান বলতে, নিবদ্ধ গানের বিপরীত অর্থাৎ যা তালে নিবদ্ধ নয়। 'অনিবদ্ধ' গানের প্রচার অনেক প্রাচীনকাল হতে পাওয়া যায়। অনিবদ্ধ গানকে আলাপ গানের পর্যায়ে রাখা হয়। যথা—(ক) রাগালাপ, (খ) রূপক আলাপ, (গ) আলাপ্তি গান, (ঘ) স্বস্থান নিয়মের আলাপ। যে আলাপ পদ্ধতিতে রাগের দশলক্ষণ—গ্রহ, অংশ, মন্দ্র, তার, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, ষড়বত্ব এবংঔড়বত্ব প্রভৃতি লক্ষণগুলি বিশদভাবে বজায় রাখা হয়, তাকে 'রাগালাপ' বলা হয়। রাগালাপের দশলক্ষণকে বজায় রাখার পর ও সঙ্গে সঙ্গে গানের প্রতিটি ভাগের মত অর্থাৎ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এর ন্যায় যে আলাপ পদ্ধতি আছে, তাকে "রূপক আলাপ" বলা হয়। আরো বিশদভাবে বলতে হলে, ধ্রুপদ গানের যে চারিটি ভাগ বা কলি আছে, যথা—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ, তার গানের বাণী অংশ পরিত্যাগ করে, কেবল স্বরের ঢংয়ের আলাপ পদ্ধতিই প্রকৃত 'রূপক আলাপ' গান বলা হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাগালাপের দশলক্ষণ বজায় রাখার পর রাগালাপের মধ্যে রাগের আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রক্রিয়াযুক্ত আলাপ গানকে "আলাপ্তি গান" বলা হয়। স্বস্থান নিয়মের আলাপ গানে, চার মুখ্য স্বরস্থান বা স্বরক্ষেত্রে নিশ্চিত করা থাকে এবং সেই স্বরস্থান বজায় রেখে রাগের আলাপ বিস্তার করা হত এবং এই রাগালাপের পদ্ধতিকে স্বস্থান নিয়ম আলাপ বলা হয়। এই বিষয়টি সম্বন্ধে পরে বিশদভাবে আলোচিত হবে।

নিবদ্ধ গানের প্রাচীন প্রকারগুলির মধ্যে ধ্রুপদ প্রভৃতি প্রকারের 'প্রবন্ধ', 'বস্তু', 'রূপক', প্রভৃতি গীতের প্রচলন ছিল। আধুনিক ধ্রুপদ গানের মধ্যে স্থায়ী অন্তরা প্রভৃতি ভাগ থাকে, ঠিক তেমনি প্রাচীন প্রবন্ধ গানের বিভিন্ন কলি বা ভাগকে "ধাতু" বলা হত। এগুলির নাম হল যেমন—উদ্গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব, অন্তরা ও আভোগ।

প্রাচীন নিবদ্ধ গান ও অনিবদ্ধ গান—পূর্বে বলা হয়েছে যে, তালে নিবদ্ধ গীত রচনাগুলি নিবদ্ধ গানের অন্তর্গত এবং তালছাড়া রচনাগুলি অনিবদ্ধ গানের পর্যায়ের মধ্যে আসবে। পূর্বে ইহাও বলা হয়েছে যে, প্রাচীন নিবদ্ধ গানের যতগুলি প্রকারভেদ আছে, তার মধ্যে প্রবন্ধ, বস্তু, রূপক প্রভৃতিগুলি অন্তর্গত এবং ইহার অবয়বগুলিকে 'ধাতু' বলা হয়। ধাতু পাঁচ প্রকারের পাওয়া যায়। যেমন—উদ্গ্রাহ, ধ্রুব, মেলাপক, অন্তরা ও আভোগ। অনিবদ্ধ গানের অন্তর্গত হল, রাগালাপ, রূপকালাপ, আলাপ্তিগান ও স্বস্থান নিয়মের আলাপ গান। এই চার প্রকার আলাপ গানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। রাগালাপ গানে, রাগালাপের দশ লক্ষণ দেখানো হয়ে থাকে। যেমন—গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, ষড়বত্ব, ঔড়বত্ব, মন্দ্র, এবং তার। এইসব উপরিউক্তগুলির বিশেষ বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে। এখন এখানে অপন্যাসের দুটি ভেদ 'সন্যাস ও বিন্যাসের' আলোচনা নিম্নে করা হল।

সন্যাস ও বিন্যাস—প্রাচীন নিবদ্ধ গানের রচনাতে প্রত্যেক রাগের বিশ্রান্তি স্বরের উপর বিশেষ ধ্যান দেওয়া হত। গানের রচনার অন্তিম স্বরটিকে 'ন্যাস' স্বর বলা হত। অন্তিম স্বরের অতিরিক্ত অন্য প্রত্যেক ছোট, বড় বিভাগ ও উপবিভাগের অন্তিম স্বরটিকে 'অপন্যাস' স্বর বলা হত। 'অপন্যাস' স্বরের দুই প্রকার ভেদ ছিল, এবং ইহার নাম 'সন্যাস

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও বিন্যাস'। গীতের প্রথম ভাগের, ছোট ছোট উপ-বিভাগের শেষ স্বরটি 'সন্যাস' বলা হত। যেমন—আধুনিককালের ধ্রুপদ গানে চারিটি কলি বা ভাগ থাকে, স্থায়ী অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। এই চারিভাগের মধ্যে অর্থাৎ তিন বা চার আবৃত্তির চরণযুক্ত স্থায়ীর বা অন্তরার প্রভৃতির ছোট ছোট উপ-বিভাগ হতে পারে এবং এইসব উপবিভাগের অন্তিম স্বরগুলিকে 'সন্যাস' বলা হয়। আর স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী বা আভোগ প্রভৃতি এক একটি অবয়বের শেষ স্বরটিকে 'বিন্যাস' বলা হয়। যেমন—স্থায়ী ভাগের শেষ স্বরটি যদি গান্ধার হয়, তো গান্ধারকে বিন্যাস স্বর বলা হবে। অন্তরা কলির শেষ স্বরটি যদি পঞ্চম হয়, তবে অন্তরা অংশের শেষ স্বরটিকে বিন্যাস স্বর বলা হবে। এরূপ নিয়মেই বিন্যাস স্বর নিরূপিত হয়। পূর্বে অবশ্য বলা হয়েছে যে, আধুনিককালে এইসব সন্যাস, বিন্যাস, অপন্যাস প্রভৃতি নিয়ম রাগের অন্তর্গত বিধিবদ্ধ নেই। কেবল আলাপ বা বিস্তার করার সময় রাগের আলাপ গানে, মধ্যে মধ্যে এক একটি স্বরের উপর বিশ্রান্তি করা হয় এবং সেই বিশ্রান্তি স্বরটিকেই রাগের "ন্যাস স্বরের" নামকরণ করা হয়ে থাকে।

অল্পত্ব-বহুত্ব—রাগালাপ গানে, অল্পত্ব এবং বহুত্বর মহত্ত্ব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আধুনিককালেও রাগালাপ গানে কোনো কোনো স্বরকে গৌণ, আবার কোনো কোনো স্বরকে মুখ্য বা মহত্বপূর্ণ স্বর হিসাবে রাগালাপে বা বিস্তারে গণ্য করা হয়ে থাকে। অল্পত্ব অর্থে রাগালাপে কোনো স্বরের মহত্ত্ব কম করা। অল্পত্ব আবার দুই প্রকারের পাওয়া যায়। প্রথমতঃ 'লঙ্ঘণের' দ্বারা এবং দ্বিতীয়তঃ 'অনভ্যাসের' দ্বারা। লঙ্ঘণের দ্বারা অল্পত্ব করার সময় কোনো রাগে আরোহ বা অবরোহ কোন স্বরকে বাদ দিয়ে চলা। যেমন—'শুদ্ধকল্যাণে' নিষাদের অল্পত্ব আছে। কারণ আরোহণে নিষাদ স্বরটি 'লঙ্ঘিয়ে' যাওয়া হয় অর্থাৎ বাদ দেওয়া হয়। আশাবরী রাগেও কোমল নিষাদের অল্পত্ব পাওয়া যায়। কারণ আশাবরী রাগেও আরোহণে কোমল নিষাদকে লঙ্ঘিয়ে বা বাদ দিয়ে তার ষড়জে যাওয়া হয়। কিন্তু কোনো স্বর কোনো রাগের আরোহণে বাদ থাখলেও, অবরোহণে মহত্বপূর্ণ হয়, তবে তাকে অল্পত্ব বলা যাবে না। তখন ওই স্বরটিকে কেবল আরোহণে অল্পত্ব এরূপ বলা যেতে পারে। যে স্বর রাগে সম্পূর্ণ বর্জিত, তাকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অল্পত্বের অন্তর্গত বলা যাবে না। কারণ সেই স্বরটির রাগের মধ্যেই কোনো অস্তিত্ব নেই, তাই তার অল্পত্বের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। অনভ্যাসের দ্বারা অল্পত্ব হল, যে স্বর রাগে বর্তমান, কিন্তু অল্প মাত্রায়। সেজন্য অধিক বার সেই স্বরে যাওয়া যায় না এবং অধিক সময় তার উপর স্থায়ী হওয়াও যায় না। যেমন—হাম্বীর রাগে 'নিষাদ' স্বরটি। এই হাম্বীর রাগের নিষাদ স্বরের উপর, না অধিক সময় দাঁড়ান যায়, না বার বার ব্যবহার করা যায়। এরূপ অল্পত্ব "ভীমপলশ্রী" রাগে ঋষভ ও ধৈবৎ স্বর দুটিতে 'অনভ্যাসমূলক অল্পত্ব' বজায় আছে। বিবাদী স্বরের প্রয়োগও 'অনভ্যাস অল্পত্বের' উদাহরণ।

বহুত্ব—বহুত্বের অর্থ হল কোনো স্বরকে রাগের মধ্যে মহত্ত্ব দেখানো। বহুত্বও দুই প্রকারের পাওয়া যায়। প্রথমতঃ অলঙ্ঘণের দ্বারা এবং দ্বিতীয়টি অভাসের দ্বারা। যখন কোনো রাগের আরোহণে ও অবরোহণে কোনো স্বরটিকে আমরা কখনও বাদ দিতে পারি না। অর্থাৎ সেই স্বরটির উপর দাঁড়াতে না পারলেও সে স্বরটি বাদ পড়ে না তখন তাকে "অলঙ্ঘন দ্বারা বহুত্ব" বলা হয়।

যেমন—কালেংড়া রাগে মধ্যম স্বরটির উপর দাঁড়ানোর অভ্যাস নেই, তবু আরোহণে ও অবরোহণে এই স্বরটির ব্যবহার অনবদ্য। আর যদি এই স্বরটিকে বাদ দেওয়া হয়, তবে এই রাগের রূপ, বিভাস রাগের রূপের ন্যায় প্রতীয়মান হতে পারে। ইমন রাগে তীব্রমধ্যম স্বরটিও এইভাবে মহত্ত্ব লাভ করেছে। অভ্যাস বলতে আমরা এই তাৎপর্য বুঝি যে, কোনো স্বরকে বার বার ব্যবহার করা বা তার উপর অধিক্ষণ স্থায়ী হওয়া। যেমন—হাম্বীর রাগে ধৈবত স্বরের 'অভ্যাসমূলক' বহুত্ব আছে। এইভাবে প্রত্যেক রাগের বাদী স্বরের উপর অভ্যাসের বহুত্ব দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু কখন কখন বাদীস্বর অতিরিক্ত, রাগে অন্য কোনো স্বর, অভ্যাসের দ্বারা বহুত্ব লাভ করে। যেমন—পরজ রাগে বাদী স্বর 'পঞ্চম' এবং সম্বাদী স্বর 'তার ষড়্জ'। কিন্তু নিষাদ স্বরের উপর অভ্যাসমূলক বহুত্ব অবশ্যই দেখানো হয়ে থাকে। রাগের আলাপ ও বিস্তারের অভ্যাসমূলক বহুত্ব অবশ্যই দেখানো হয়ে থাকে। রাগের আলাপ ও বিস্তারের অভ্যাসমূলক বহুত্ব বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ। রাগালাপে যেমন দশটি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লক্ষণের প্রভাব দেখানো হয়ে থাকে, সেরূপ প্রাচীনকালে 'জাতিগান' প্রচলিত ছিল এবং এই 'জাতিগান' পদ্ধতিতেও দশ লক্ষণের প্রচলন ছিল। এইগুলি রাগের দশ লক্ষণের মতই ছিল। কথিত আছে যে, বর্তমানে রাগ গাওয়ার মতই পূর্বে জাতিগান করার প্রথা প্রচলিত ছিল অর্থাৎ জাতিগানই রাগ গান করারই পর্যায়ভুক্ত ছিল। গ্রাম হতে মূর্চ্ছনা এবং মূর্চ্ছনা হতে জাতিগানের সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো পণ্ডিত শাস্ত্রকার, জাতিগানকে 'নিবদ্ধ গান' বলতেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে জাতিগানেই প্রথমে গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব প্রভৃতি লক্ষণের সাথে তালবদ্ধ রচনা পাওয়া যেত। শার্ঙ্গদেবের কিছু সময় পূর্ব হতেই জাতিগানের প্রচলন বন্ধ হয়ে যায় এবং জাতিগানের পরিবর্তে রাগ গায়ন রীতি প্রচলিত হয়। ভরতের সময় সাত প্রকার জাতিগান ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু এই জাতিগান যে কি প্রকারের ছিল, তার স্পষ্ট নমুনা আজও নির্ধারিত হয় নি। ভরত নাট্যশাস্ত্রে জাতিগানের দশলক্ষণও বলা হয়েছে এবং শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত পারিজাতেও জাতিগানের ত্রয়োদশ লক্ষণের কথা বলা আছে। শার্ঙ্গদেব রাগের দশলক্ষণ ছাড়াও অন্য তিনটি লক্ষন, যথা—সন্যাস, বিন্যাস ও অন্তরমার্গের কথা বলেছেন।

গ্রাম—এখানে "গ্রাম ও মূর্চ্ছনা" শব্দের অর্থ, প্রথমে বলে নেওয়া উচিত। নিয়মানুযায়ী শ্রুত্যন্তরের সাতটি স্বরের মুখ্য সমষ্টিকে "গ্রাম" বলা হয়ে থাকে। "চতুশ্চতুশ্চতুশ্চৈব" প্রভৃতি এই নিয়মের আধারে চতুর্থ, সপ্তম, নবম, ত্রয়োদশ, সপ্তদশ, বিংশ এবং দ্বাবিংশ, এই শ্রুতিগুলির উপর ক্রমানুসারে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবৎ, ও নিষাদ, স্বরগুলি স্থাপিত হয়ে, যে গ্রামের উৎপত্তি হয়, তাকে "ষড়জগ্রাম" বলা হয়ে থাকে। এই শ্রুত্যন্তর যোজনায় যদি সামান্যতম পার্থক্য হয়, তাহলে তা ষড়জগ্রাম হবে না। যদি পঞ্চমস্বরটিকে সপ্তদশ শ্রুতি হতে সরিয়ে ষষ্টদশ শ্রুতির উপর উপস্থাপিত করা হয়, তবে সেই সপ্তকটি "মধ্যম গ্রামে" পরিবর্তিত হয়ে যাবে। ইহার নাম মধ্যম গ্রাম হবে এজন্য যে, ইহা মধ্যম স্বর হতে শুরু হবে। প্রাচীন ষড়জ গ্রামে চার, তিন, দুই, চার, চার, তিন, দুই এইরূপ শ্রুত্যন্তর আছে অর্থাৎ ষড়জ স্বরটি মন্দ্র কোমল নিষাদ হতে চার শ্রুতি উপরে, ঋষভ, ষড়জস্বর হতে তিন শ্রুতি উপরে, গান্ধার, ঋষভ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হতে দুই শ্রুতি ঊর্ধ্ব, মধ্যম, গান্ধার হতে চার শ্রুতি উপরে, পঞ্চম, মধ্যম, হতে চার শ্রুতি উপরে, ধৈবত পঞ্চম হতে তিন শ্রুতি উপরে এবং নিষাদ, ধৈবৎ হতে দুই শ্রুতি উর্ধে অবস্থিত। অর্থাৎ ঋষভ ও গান্ধারের এবং ধৈবৎ ও নিষাদের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য অতি অল্প। ষড়জগ্রাম বর্তমান কাফীঠাটের সদৃশ মনে হয়, কারণ গান্ধার, ঋষভের অতি নিকটে এবং নিষাদ ও ধৈবৎ স্বরের অতি নিকটবর্তী স্বর। মধ্যম গ্রাম যড়জ হতে আরম্ভ করলে পর শ্রুত্যান্তর নিম্নরূপ দাঁড়াবে। যেমন—চার, তিন, দুই, চার, তিন, চার, দুই, কারণ পঞ্চম, মধ্যমের তিন শ্রুতির উপরে এবং পঞ্চম হতে ধৈবৎ চার শ্রুতি উপরে অবস্থিত। কিন্তু মধ্যম স্বরকে ষড়জ ধরলে শ্রুত্যান্তর দাঁড়াবে চার, তিন, চার, দুই, চার, তিন, দুই অর্থাৎ ষড়জ, মন্দ্র নিষাদ হতে চার শ্রুতি উর্ধে, ঋষভ, ষড়জ হতে তিন শ্রুতি উপরে, গান্ধার, ঋষভ হতে চার শ্রুতি উপরে। এখানে গান্ধার এবং ঋষভের দূরত্ব অধিক হয়ে যাওয়ায় এই গান্ধার আধুনিক শুদ্ধ গান্ধারের সমান। মধ্যম স্বর গান্ধার হতে দুই শ্রুতি উপরে হবে, ইত্যাদি। এখানে নিষাদ, ধৈবৎ হতে কেবলমাত্র দুইশ্রুতি উপরে আছে। অতএব গান্ধার শুদ্ধ স্বর ও নিষাদ কোমল স্বরূপ প্রাপ্ত হলেই প্রাচীন মধ্যম গ্রামের রূপ অর্থাৎ আধুনিক খাম্বাজে ঠাটের সমান হয়। প্রাচীনকালে মোট তিনটি 'গ্রাম' মানা হয়ে থাকে। প্রথমতঃ ষড়জ গ্রাম, দ্বিতীয়তঃ মধ্যম গ্রাম ও তৃতীয়তঃ গান্ধার গ্রাম। কথিত আছে যে, গান্ধার গ্রাম প্রাচীনকাল হতেই লুপ্ত হয়ে গেছে। তাই শাস্ত্রে গান্ধার গ্রামের কোনো স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ইহা নিষাদ গ্রাম ছিল বলেই মনে হয়। নিষাদ গ্রাম বলা হল এজন্য যে, এই গ্রামের শুরু নিষাদ স্বর হতে। কিন্তু ইহার প্রয়োগ গন্ধর্বলোকের দ্বারা হত বলেই হয়তো গন্ধর্বগ্রাম বলার রীতি প্রচলিত হয়। এই গন্ধর্বগ্রাম নামটি পরবর্তি যুগে 'গান্ধার গ্রাম' নাম ধারণ করে। মধ্য যুগে এসে, 'মধ্যম গ্রামের' প্রচারও উঠে যায় এবং সেই সময় হতে কেবলমাত্র ষড়জ গ্রাম প্রচলিত আছে। মধ্যম গ্রামের কেবলমাত্র এই ভাবটুকু রয়ে গেছে যে, কোনো কোনো রাগ গীত হবার সময় মধ্যম স্বরটিকে ষড়জ মনে করে রাগ গাওয়া হয়ে থাকে। যেমন—পিলু, পাহাড়ী প্রভৃতি রাগ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মূর্চ্ছনা—গ্রামগুলি হতেই মূর্চ্ছনার উৎপত্তি। প্রাচীনকালে গ্রামের প্রত্যেকটি স্বরকে, ষড়জ মনে করে বার বার সাত স্বরের ক্রমানুসারে আরোহ অবরোহ করলে যে বিভিন্ন শ্রুত্যন্তরযুক্ত সপ্তস্বরের সমষ্টির উৎপত্তি হত তাকেই 'মূর্চ্ছনা' বলা হয়। উদাহরণার্থে, প্রথম মূর্চ্ছনা ষড়জ গ্রামের ষড়জ হতে আরম্ভ করে ষড়জ গ্রামের মুখ্য স্বরের সমন্বয়ে হয়। ষড়জ—চার শ্রুত্যন্তর, ঋষভ—তিন, গান্ধার—দুই, মধ্যম—চার, পঞ্চম—চার, ধৈবৎ—তিন, নিষাদ—দুই। ইহা আধুনিক কাফী ঠাটের মত। দ্বিতীয় মূর্চ্ছনা মন্দ্র সপ্তকের নিষাদ হত আরম্ভ হত। অর্থাৎ নিষাদকে ষড়জ মনে করে, এই মূর্চ্ছনাটি নিম্নরূপ হত। যেমন—ষড়জ—দুই, শ্রুত্যন্তর, ঋষভ—চার, গান্ধার—তিন, মধ্যম—দুই, পঞ্চম—চার, ধৈবৎ—চার, নিষাদ—তিন প্রভৃতি শ্রুত্যন্তর। ইহা আধুনিক বিলাবল ঠাটের মত। তৃতীয় মূর্চ্ছনা ধৈবৎ স্বরটিকে ষড়জ মনে করে পাওয়া যায়। যেমন, ষড়জ—তিনশ্রুত্যন্তর, ঋষভ—দুই, গান্ধার—চার, মধ্যম—তিন, পঞ্চম—দুই, ধৈবত—চার, নিষাদ—চার শ্রুত্যন্তর। ইহা আধুনিক সা রে গ ম ম ধ নি র্সা স্বরের সদৃশ হবে। চতুর্থ মূর্চ্ছনা—পঞ্চম স্বর হতে শুরু হবে। যেমন, ষড়জ—চার শ্রুত্যন্তর, ঋষভ—তিন, গান্ধার—দুই, মধ্যম—চার, পঞ্চম—তিন, ধৈবত—দুই, নিষাদ—চার। ইহা আধুনিক আশাবরী ঠাটের অন্তর্গত হবে। এইভাবে ষড়জ গ্রামের সাত মূর্চ্ছনা, মধ্যম গ্রামের সাত মূর্চ্ছনা ও গান্ধার গ্রামের সাত মূর্চ্ছনা মিলে মোট (৭×৩=২১) একুশটি মূর্চ্ছনার কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। যেমন—

ষড়জ গ্রামের সাতমূর্চ্ছনার নাম—১। উত্তরমন্দ্রা, ২। রজনী, ৩। উত্তরায়তা, ৪। শুদ্ধ ষড়জা, ৫। মৎসরীকৃতা, ৬। অশ্বক্রান্তা, ৭। অভিরুদ্গতা।

গান্ধার গ্রামের সাত মূর্চ্ছনার নাম—১। নন্দা, ২। বিশালা, ৩। সুমুখী, ৪। বিচিত্রা, ৫। রোহিনী, ৬। সুখা, ৭। অলাপা।

মধ্যম গ্রামের সাত মূর্চ্ছনার নাম—১। সৌবীরী, ২। হরিণাশ্বা, ৩। কলোপনতা, ৪। শুদ্ধ মধ্যা, ৫। মার্গী, ৬। পৌরবী, ৭। হৃষ্যকা। (এই শ্রুতি গণনার শুদ্ধঠাট, বর্তমান কাফী ঠাটের সদৃশ' অর্থাৎ সা রে গ ম প ধ নি।)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মধ্যকালে মূর্চ্ছনার অর্থও কিছু বদলে গেছে। মধ্যকালে কোনো রাগের স্বর বিস্তারের সময় প্রারম্ভিক তানটির গ্রহস্বর হতে শুরু করে বর্জিত স্বরকে বাদ দিয়ে আরোহ-অবরোহ করা হত এবং উহাকেই মূর্চ্ছনার নামকরণ করা হয়েছে। উদাহরণার্থ, যদি দুর্গা রাগের গ্রহস্বর কিছু সময়ের জন্য ধৈবতকে মানা হয়, তা হলে এই রাগের মূর্চ্ছনা হবে ধ সা রে ম প ধ, ধ প ম রে সা ধ ইত্যাদি। এই প্রারম্ভিক তানকে 'উদ্‌গ্রাহক' তানও বলা হয়ে থাকে।

আধুনিককালে গ্রহস্বর সমস্ত রাগের ষড়জটিকে মানা হয়ে থাকার হেতু, মূর্চ্ছনা আরোহ-অবরোহ হতে অভিন্ন হয়েছে। এ জন্য আধুনিক কর্ণাটকী সঙ্গীতে মূর্চ্ছনা আরোহ-অবরোহকেই বলা হয়ে থাকে। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে অবশ্য 'মূর্চ্ছনা' শব্দের ব্যবহারই লোপ পেয়েছে। পার্শ্ববর্তি স্বরসংযোগ অলঙ্কারের যে কম্পন সৃষ্টি হয়, তার নামই মূর্চ্ছনা বলতে কোনো কোনো সঙ্গীত সমাজে শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে প্রাচীন মূর্চ্ছনা, আধুনিক মেল বা ঠাটের সমান ছিল এবং মধ্যকালীন মূর্চ্ছনা একটি নিশ্চিত রূপে নির্ধারিত গ্রহস্বর হতে শুরু করা আরোহ-অবরোহ। আর আধুনিককালের আরোহ-অবরোহের অন্য নামই মূর্চ্ছনা এবং মধ্যকালের ন্যায় বর্জিত স্বরগুলির কথা মনে রাখা অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু আধুনিককালের মূর্চ্ছনায় গ্রহস্বর বা প্রারম্ভিক স্বর সদা-সর্বদা ষড়জই হয়ে থাকে।

রাগালাপের পর রূপকালাপ গানের রীতি প্রচলিত ছিল এবং এই পদ্ধতিতে তালবদ্ধ প্রবন্ধ, বস্তু অথবা আধুনিক ধ্রুপদ প্রভৃতি গানের স্থায়ী অন্তরা, প্রভৃতির মত চার অথবা পাঁচ প্রকারের অবয়ব থাকত। সম্পূর্ণ আলাপে এই অবয়বগুলি বিভক্ত হয়ে এক একটি "চীজ"এর মত গীত হত, যদিও এগুলি তালবদ্ধ ও শব্দবদ্ধ রচনা ছিল না। রাগালাপের পরবর্তি পদক্ষেপ 'আলাপ্তি গান' বলা হয়ে থাকে। আলাপ্তি গানে রাগালাপের দশ রাগলক্ষণ অবশ্যই দেখানো হত এবং সঙ্গে সঙ্গে রাগের তিরোভাব ও আবির্ভাবও দেখানো হত।

আধুনিক নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ গান :

আলাপ গান—আধুনিক সঙ্গীতে অনিবদ্ধ গানের কেবল একটি মাত্র রূপই বর্তমান পাওয়া যায়, যার নাম "আলাপ গান"। এই আলাপ গান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

"নোম তোম" প্রভৃতি শব্দযুক্ত হয়ে গীত হয় এবং কোনো কোনো সময় আকার দ্বারাও গাওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু শব্দ বা বাণীযুক্ত আলাপই অধিক সৌন্দর্যপূর্ণ প্রতীয়মান হয় ও শ্রোতার উপর খুব প্রভাবশালী হয়। এই আলাপ গানে সাধারণত নোম্, তোম্ রী, রে, ন, তা প্রভৃতি শব্দের সহায়তায় রাগের আলাপ-বিস্তার করা হয় এবং বিভিন্ন আলাপের শেষে একটি নির্দিষ্ট মুখরার দ্বারা 'সমের' ঝোঁকের ন্যায় দেখানো হয় এই "সম" রাগোচিত স্বরসমুদায়ের দ্বারা 'তা না । নোম্' প্রভৃতি বোলযুক্ত করে, প্রদর্শন করা হয়। আকারযুক্ত আলাপে উপরিউক্ত ভাবে 'সম' দেখানোর কোনো সুযোগ থাকে না এবং আকার যুক্ত আলাপে বা বিস্তারে সৌন্দর্য সৃষ্টির সুযোগ কম। খেয়াল গানের প্রারম্ভে আকার যুক্ত সংক্ষিপ্ত আলাপ করা হয়ে থাকে। কিন্তু ধ্রুপদ এবং ধামারে গান বা গীত রচনা শুরু করার পূর্বে 'নোম তোম্' বাণীযুক্ত পূর্ণ আলাপ করা হয়ে থাকে। এই প্রকার ধ্রুপদ বা সমজাতীয় গানের প্রারম্ভে যে আলাপ করা হয়, তার পরিচয় নিম্নে বর্ণিত হল।

বাণীযুক্ত আলাপ গান—পুরাতনকালে কোনো কোনো বিজ্ঞসঙ্গীতবিদের মতে রাগালাপ করার সময় ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বাণীযুক্ত করে আলাপ বা বিস্তার করা হত। যেমন—"ওঁ অনন্ত নারায়ণ হরি" অথবা "তুহী অনন্ত হরি" প্রভৃতি। পরবর্তিকালে যেমন পুরাতন সঙ্গীতের স্বর—রাগ-বৈচিত্র্যের কথা বিস্মৃত হতে চলেছে তেমনি উপরিউক্ত শব্দগুলির ব্যবহারও কম হতে বসেছে। এই প্রকার আলাপে বর্তমান 'নোম্ তোম্, রী রে ণ" প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার যুক্ত হচ্ছে। আধুনিককালে বড়োদার ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবও তাঁর আলাপে কখন কখনও "নারায়ণ অনন্ত হরি" প্রভৃতি বাণীযুক্ত আলাপ করতেন। পুরাতন শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদ ঘরাণা, "হরিদাস ডাগুর" তাঁদের আলাপ গানে পুরাতন ঢং বজায় রাখতেন। এই ঘরাণার অধিকাংশ শিল্পীরা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং আধুনিককালের বিখ্যাত শিল্পী "নাসীরুদ্দীন খাঁ" সাহেবও ধ্রুপদগান করার সময় আলাপে পুরাতন ঢংগ, বিশেষভাবে বজায় রাখতেন। তিনি নিজেও ভাল সংস্কৃত জানতেন এবং গান করার পূর্বে রাগের সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধ্যানগুলি অতি সুন্দরভাবে রাগের সুরে আবৃত্তি করতেন। বাণীযুক্ত আলাপে অনেক স্বরবৈচিত্র্য ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ছন্দবৈচিত্র্য করার সরল সুযোগ থাকে এবং তার প্রভাবও শ্রোতার মনে বিশেষভাবে পড়ে। কেবল আকারযুক্ত আলাপে শ্রোতার মন কিছুটা খুশী হতে পারে বটে, কিন্তু বাণীযুক্ত আলাপে লয়ের বৈচিত্র্য ও দ্রুতগতির ছন্দযুক্ত আলাপ করারঅবকাশ থাকে এবং এই বাণীযুক্ত আলাপ বিশেষ সৌন্দর্যপূর্ণ ও শ্রোতারঞ্জক হয়। অনেক সঙ্গীত শিল্পী আছেন, যাঁরা আলাপগানকে চারভাগে বিভক্ত করে থাকেন। যেমন—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ প্রভৃতি ভাগগুলি গীত রচনায় পাওয়া যায়। আকারযুক্ত আলাপ গানে এই প্রকার বিস্তার করার আবশ্যক হয় না। তাই পূর্ণ চারভাগের আলাপে বাস্তবক্ষেত্রে বাণীযুক্ত আলাপ করার প্রচলনই আছে। আকারযুক্ত আলাপে মুখ্যতঃ কেবল স্থায়ী ও অন্তরার ন্যায় এই দুটি-ভাগ দেখানো হয়ে থাকে এবং এইভাবে রাগের পূর্বাঙ্গ ও উত্তরাঙ্গভাগ স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয়। কোনো কোনো সময় এই আলাপ অংশের সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত গমক যুক্ত করে সঞ্চারীভাগ করা হয়। সাধারণতঃ আলাপ গানেরও চারিটি ভাগ, যেমন চারিটি ভাগ ধ্রুপদ গানের মধ্যে পাওয়া যায় যথা—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ প্রভৃতি। প্রথমভাগে ষড়জ স্বর হতে শুরু করে বাদীস্বরকে কেন্দ্র করে পূর্বাঙ্গের মহত্ত্ব দেখানো হয়, আলাপ গানের প্রথম অংশে। আরম্ভের আলাপ গানে মুখ্য স্বর সমুদয়ের বা পকড়ের সাহায্যে স্বরবিন্যাস, রাগরূপ পরিস্ফুট করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। প্রথমভাগে মন্দ্র এবং মধ্য সপ্তকেই স্বর বিস্তার প্রস্তারিত হয়। কোনো কোনো সময় প্রথম ভাগের আলাপ গানে তার সপ্তকের ষড়জ স্পর্শ করে, কিন্তু তখনই আবার মধ্যসপ্তকের নির্দিষ্টভাগে প্রত্যাবর্তন করে এবং মধ্য সপ্তকের ষড়জে এসে প্রথম ভাগের আলাপ সমাপ্ত হয়। যদি রাগটি উত্তরাঙ্গপ্রধান হয় তবে পূর্বাঙ্গে সম্বাদীস্বরকে কেন্দ্র করে রাগরূপ অনুসারে পূর্বাঙ্গের মুখ্য স্বরসমুদয়ের সাহায্যে স্বর-সঙ্গতি আলাপগানে করা হয়। আর যে রাগ প্রধানতঃ উত্তরাঙ্গ প্রধান, যেমন—পরজ, সোহিনী প্রভৃতি রাগ, উত্তরাঙ্গেই অধিক মাত্রায় আলাপ হবার কথা। মধ্যসপ্তকের ষড়জ গাইবার পরই রাগরূপ অনুযায়ী আরোহ সহকারে উত্তরাঙ্গেই অধিক পরিমাণে আলাপ করা হয় এবং উত্তরাঙ্গবাদী ও অন্য ন্যাস স্বরগুলির বিস্তার করতে করতে আবার মধ্যসপ্তকে ফিরে আসে। আলাপের দ্বিতীয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাগের অংশের আলাপ অধিকাংশ সময় গান্ধার, মধ্যম ও পঞ্চম স্বর হতে আরম্ভ হয়ে থাকে এবং তার ষড়্জের উপর নানাবিধ স্বরবিন্যাসের দ্বারা বিশ্রান্তি করা হয়ে থাকে। তার সপ্তকের গান্ধার, মধ্যম ও কখন কখন পঞ্চম স্বর পর্যন্ত দ্বিতীয়ভাগের আলাপ গানে স্বর বিস্তার করা হয়ে আবার মধ্যসপ্তকের ষড়জ স্বরে ফিরে আসে। তৃতীয়ভাগে অধিকাংশ সময় মন্দ্র এবং মধ্য সপ্তকের মধ্যে স্বর বিস্তার আবদ্ধ থাকে। এই সময় আলাপ গানে গমকের প্রাধান্য দেখা যায় এবং ষড়জ, মধ্যম বা পঞ্চম স্বর হতে আরম্ভ করা হয়। বাস্তবক্ষেত্রে ইহা প্রথম ভাগের (সংশোধিত বা) পরিবর্ধিত পুনরাবৃত্তি বলা যেতে পারে। চতুর্থ ভাগে দ্বিতীয় ভাগের পুনরাবৃত্তি ধরা যেতে পারে। এই ভাগে স্বর বিস্তার, তিন সপ্তকের মধ্যে বিচরণ করে এবং তার সপ্তকে যতদূর ইচ্ছা বা সম্ভব, স্বর বিস্তারলাভ করা যেতে পারে। এ অবস্থায় শাস্ত্রীয় কোনো বাধানিষেধ থাকে না। উপরে ধ্রুপদ প্রভৃতি রচনাতে চার ভাগের সমান আলাপের চার তুলনাত্মক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে যখন বাণীযুক্ত আলাপ করা হয় তার মধ্যে অন্য আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এসে পড়ে। বাণীযুক্ত আলাপগানের মুখ্য বৈশিষ্ট্য নিম্ন প্রকার।

আলাপের প্রথমভাগ—এই অংশের আলাপ গানে বিলম্বিত লয়ে, মীড়যুক্ত হয়ে বিশেষ ঢংগে আলাপগান গাওয়া হয়ে থাকে। কণস্বরের প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু বিলম্বিত লয় ও গাম্ভীর্য বজায় রাখার জন্য অধিক খটকা, মুর্কী অথবা দানাযুক্ত কাজ, প্রয়োগ করা উচিত নয়। ষড়জ স্বরকে সুন্দরভাবে বিভিন্ন স্বর বিন্যাসের দ্বারা সজ্জিত করে ষড়জ স্বরের বঢ়ত বা বিস্তার, গাওয়া হয়ে থাকে। পূর্বাঙ্গে রাগের রূপ স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট করে এক একটি স্বরের বঢ়ত করা হয়। বাদী, সম্বাদী ও ন্যাস প্রভৃতি স্বরগুলির ক্রমানুসারে বঢ়ত হয়ে থাকে। এই সমস্ত স্বরগুলির উপরের এবং নীচের স্বরগুলি নিয়ে অনেক প্রকার স্বর রচনা করে, শেষে ন্যাস করা হয়। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে রাগের মুখ্য স্বর সমুদয় বা পকড় ও অন্য স্বরসঙ্গতি প্রয়োগ করে রাগের স্বরূপ অপরিবর্তিত রাখা হয়। এভাবে নানা প্রকার স্বরবিন্যাসের আলাপ করে শেষে মধ্য সপ্তকের ষড়জে ফিরে এসে, আলাপ অংশের সঙ্গে 'মুখরা' যুক্ত করে সমে আসার পদ্ধতি আছে। এই মুখরা গাওয়ার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সময় "তা না া নোম্ "বা নে তা—া তোম্" প্রভৃতি বাণী সংযুক্ত করা হয়। এই সমে আসার মধ্যে শ্রোতার মনে এক সৌন্দর্যযুক্ত প্রভাব পড়ে এবং আলাপের একটি অংশ যে শেষ হল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তা না া নোম্ এই বাণীর শেষ বাণীতে জোর দিয়ে একটি ঝোঁকের সৃষ্টি করা হয় এবং সঙ্গতকারী তবলা বা পাখোয়াজ বাদক ও এই ঝোঁকের সাথে ঝোঁক মিলিয়ে তবলা বা পাখোয়াজে "ধা" শব্দটী জুরে দিয়ে ঝোঁকটিকে আরো জোরদার বা সুন্দর করে তোলেন। স্থায়ীভাগে এক একটি স্বরকে নানা ভাবে ব্যবহার করে বঢ়ত করা হয়ে থাকে। এই অংশে স্বরবিস্তার মধ্যসপ্তকের নিষাদ পর্যন্ত বিস্তারিত হয়। তবে কোনো ক্ষেত্রে তার ষড়জও স্পর্শ করতে পারে এবং আবার মধ্যসপ্তকের ষড়জে ফিরে এসে প্রথম ভাগের সমাপ্তি ঘটে।

আলাপ গানের দ্বিতীয় ভাগ—এই অংশে সাধারণত গান্ধার, মধ্যম বা পঞ্চম স্বর হতে আরম্ভ করে তার ষড়জ পর্যন্ত যাওয়া হয়। কিন্তু কুশল শিল্পী অত্যন্ত সুন্দরভাবে ও কুশলতার সাথে তারষড়জ পর্যন্ত স্বরে গমন করেন। এই অংশে লয়ও কিছুটা বেড়ে যেতে পারে। বিভিন্ন বিন্যাসের দ্বারা তারষড়জে গিয়ে অন্যান্য স্বরকে স্পর্শ করে ন্যাস স্বরে আবার ন্যাস করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের স্বরবিন্যাস দ্বারা দ্বিতীয় আলাপ ভাগের এক একটি অংশ শেষ করার পূর্বে আবার মধ্যসপ্তকের ষড়জের উপর ফিরে এসে সমে আসার ন্যায় ঝোঁক দিয়ে, আবার উত্তরাঙ্গের দিকে বিস্তার করা হয়ে থাকে। এইভাবে উত্তরাঙ্গে, রাগের বিভিন্ন প্রকারের স্বরবিন্যাস করার পর শেষে মধ্যসপ্তকের ষড়জে ফিরে এসে আলাপের দ্বিতীয় অংশ সমাপ্ত করা হয় থাকে।

আলাপের তৃতীয় ভাগ—এই তৃতীয় অংশের আলাপ গানের স্ববিন্যাসের লয় আরো কিছুটা বর্দ্ধিত করা হয়ে থাকে। এই ভাগে আলাপ মধ্যলয়ে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে লয় বাড়ানো হয় এবং স্বরবিন্যাসের সঙ্গে দানাযুক্ত, কণস্বরযুক্ত ও বিভিন্ন প্রকারের গমকযুক্ত বিশেষ গায়কীর অবতারণা করা হয়ে থাকে। এই সময় তোম্ নননন, 'তোম্ নননন, রীরেনননন রীরে নোম্ তনন' প্রভৃতি বাণীগুলিকে মধ্যলয়ে স্বরবিন্যাসের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তারপর উত্তরাঙ্গ অংশে স্বরবিস্তার বিস্তৃত হতে থাকে এবং

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেক্ষেত্রেও ওই "রীরে নানা তোম নানা প্রভৃতি বাণীগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তারষড়জের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় ও উপরিউক্ত বাণীগুলির সমাবেশের দ্বারা বিভিন্ন লয়কারীও করা হয়ে থাকে। এই লয়কারীর সঙ্গেও গমকযুক্ত করে বিশেষ সৌন্দর্য সৃষ্টি, একমাত্র কুশল শিল্পীই সক্ষম হন। তৃতীয় ভাগ শেষ করার সময় আবার মধ্যসপ্তকের ষড়জে ফিরে এসে পূর্ববৎ সমের ঝোঁক দ্বারা আলাপের তৃতীয় ভাগ, সঞ্চারীর সমাপ্তি ঘটানো হয়।

আলাপের গানের চতুর্থ-অংশ—এই চতুর্থ ভাগের আলাপ অংশে স্বরবিস্তারের লয় পূর্ণদ্রুত-গতিতে চলতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে উপরিউক্ত বাণীগুলির সাহায্যে বিভিন্ন গমকযুক্ত হয়ে, বিভিন্ন প্রকারের লয়ের সৌন্দর্য বর্দ্ধন করা হয়ে থাকে। রাগ বিস্তারের এই অংশের আলাপভাগে স্বর বিস্তার তিন সপ্তকেই বিচরণ করতে থাকে। এই বিভাগের আলাপ করা অত্যন্ত কঠিন এবং এই গায়কী, পরিবেশন করতে হলে কণ্ঠকে বিশেষ সাধনার দ্বারা আয়ত্ব করতে হয় এবং এই ভাগের গমকেও বিভিন্ন লয়কারী করা হয়ে থাকে।

এইভাবে বাণীযুক্ত আলাপ গান পূর্ণরূপে পরিবেশিত হয়ে থাকে। কিন্তু এই নিয়মগুলি ঠিক ঠিক ভাবে পরিবেশন সব শিল্পীদের দ্বারা সম্ভব হয় না। আবার কোনো কোনো শিল্পী তাঁদের নিজেদের রুচি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী এই চার ভাগের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তনও করে থাকেন। উদাহরণার্থে কোনো কোনো গায়ক প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থভাগের আলাপে, মন্দ্র, মধ্য ও তার সপ্তক, এই চার অঙ্গে আলাপেই বিস্তৃত করে থাকেন। কেবল আলাপ করার সময় ক্রমশঃ লয়ের গতি বাড়াতে থাকেন। যেমন প্রথমভাগে বিলম্বিত লয়ে মীড় ও কণযুক্ত আলাপে তিন সপ্তকের মধ্যেই বিচরণ করে থাকেন। অর্থাৎ এই প্রথমভাগের আলাপের মধ্যেই ধ্রুপদ গানের স্থায়ী, অন্তরার মত আলাপে স্থায়ী, অন্তরাভাগ সন্নিবেশিত হয়। তারপর আলাপের দ্বিতীয় ভাগে লয় বাড়ানো হয় এবং তানের প্রয়োগ আরম্ভ হয়ে যায়। মধ্যে মধ্যে তিন চারটি স্বরের সমন্বয়ে তানের সহায়তায় আলাপের বিভিন্ন স্বরসঙ্গতি রচনা করে আলাপ তিন সপ্তকের মধ্যে বিস্তারিত হতে থাকে। অর্থাৎ আলাপের দ্বিতীয় অংশের ভিতর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ উভয় ভাগেই বর্তমান থাকে। আলাপের তৃতীয়াংশে ও পূর্ণ তিন সপ্তকের মধ্যে সঞ্চারণ হতে থাকে, কিন্তু ইহার লয়ের গতি আরো দ্রুত হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের ছন্দ ও গমকযুক্ত সুন্দর লয়কারী দেখানো হয়। আলাপের শেষভাগে লয় আরো দ্রুততর গতিতে চলতে থাকে। এই অংশে শিল্পী নিজের পারদর্শিতা অনুযায়ী যতটা পারেন দ্রুত লয়ের কাজ করেন এবং প্রস্তার এবারও তিন সপ্তকে বিস্তারিত হয়। এই অংশে গমকেরও প্রচুর উপযুক্ত ব্যবহার হয়ে থাকে এবং এইভাবে দ্রুতলয়ে তারাণা গানের সদৃশ রূপ, আলাপ গানের শেষভাগে করা হয়ে থাকে।

আধুনিক নিবদ্ধ গান—প্রাচীনকালে নিবদ্ধ গান বলতে আমরা প্রবন্ধ-গানকেই জানতাম। আধুনিককালে প্রাচীন নিবদ্ধ গানের স্থান পূরণ করেছে, ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি সঙ্গীত। কারণ আধুনিককালে সেই পুরাতন নিবদ্ধ গানের প্রচলন আর দেখা যায় না। তবে কালের বিবর্তনের সঙ্গে প্রাচীন নিবদ্ধগানের রূপও যদি বিবর্তিত হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমান প্রচলিত গীতগুলিই কালের বিবর্তিত ফল, ধরে নেওয়া যায় এবং সেই কারণেই একে আধুনিক নিবদ্ধগান বলে মনে করা যেতে পারে। আধুনিক নিবদ্ধগানের রচনাতেও, প্রাচীন নিবদ্ধগানের উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব প্রভৃতি ভাগের ন্যায় স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ প্রভৃতি ভাগ থাকে। গীতের প্রথম ভাগটিকে বলা হয় স্থায়ী, দ্বিতীয়টি অন্তরা, তৃতীয়টি সঞ্চারী এবং শেষটি আভোগ।

গীতের স্থায়ী ভাগে গায়ক অথবা বাদক অন্যান্য অংশ গাইবার পরও আবার এই ভাগে বার বার ফিরে আসে বলে, ইহাকে 'স্থায়ী ভাগ' বলা হয়ে থাকে। স্থায়ীভাগে গীতের বা গতের মন্দ্র এবং মধ্য সপ্তকেই সীমাবদ্ধ থাকে। কখন কখন একবার হয়তো তারসপ্তক স্পর্শ করতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ প্রস্তার সপ্তকের নীচের দিকেই হয়। স্থায়ীর পর যে অংশটি গাওয়া হয়, তার নাম 'অন্তরা'। অন্তরা ভাগে গানের বা গতের স্বর মধ্যসপ্তকের গান্ধার, মধ্যম ও পঞ্চম হতে শুরু হয়ে তার সপ্তকের গান্ধার, মধ্যম ও পঞ্চম প্রভৃতি স্বর পর্যন্ত বিস্তারিত হয় এবং মধ্যসপ্তকে ফিরে এসে আবার স্থায়ী ভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গীতের তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ সঞ্চারী, অন্তরাভাগের পর গীত হয়। সঞ্চারী ভাগে তারসপ্তকে স্বর অল্পই বিস্তৃত হয় এবং প্রধানতঃ মন্দ্র এবং মধ্য সপ্তকেই সঞ্চার লাভ করে। সঞ্চারী অংশ হতে কখনই স্থায়ী ভাগে গীত বা গত ফিরে যায় না এবং এর পরবর্তী বা চতুর্থ অংশ আভোগে গীত বিস্তারিত হয়। সঞ্চারী অংশের গায়কীতে মীড়, গমক প্রভৃতির প্রভাব বেশী দেখা যায়। আভোগ অংশ অন্তরারই পরিবর্ধিত রূপ এবং তারসপ্তকের শেষ সীমা পর্যন্ত স্বর বিস্তৃত হতে পারে। ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ সঙ্গীতেই এই চার ভাগ প্রধানতঃ পাওয়া যায়। আধুনিক নিবদ্ধগীত বলতে, ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, তারাণা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ, লক্ষণগীত, স্বরমালিক (গৎ), ভজন, গীত ও গজল প্রভৃতিগুলিকে ধরা হয়। এই আধুনিক নিবদ্ধগীতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিয়ে দেওয়া হল।

ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ—প্রচলিত ভারতীয় সঙ্গীত ধারার শ্রেষ্ঠ গীত রীতি। ধ্রুপদ, উত্তরভারতীয় সঙ্গীত ধারার প্রাচীনতম সঙ্গীতধারা। এই সঙ্গীতের পুরাতন রচনাগুলি ব্রজভাষা ও হিন্দী ভাষায় পাওয়া যায়। ধ্রুবপদ গানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—গীতের অন্তর্গত পদগুলি অত্যন্ত অর্থপূর্ণ হয় অর্থাৎ পদগুলি ধ্রুব বা সত্য। এই গানের রচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে ভক্তিমার্গ, দেবদেবীর রূপ বর্ণনা, ঐতিহাসিক বিবরণ, আধ্যাত্মিক বিবরণ, প্রাকৃতিক বিষয় প্রভৃতি রচনা পাওয়া যায়। এই সঙ্গীতের ধারায় শান্ত, ভক্তি, বীর ও শৃঙ্গার প্রভৃতি 'রস' সাধারণতঃ পাওয়া যায়।

ধ্রুপদ গান সর্বপ্রথমে কে রচনা করেছিলেন তার কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত আজও নিরূপিত হয় নি। তবে কোনো কোনো সঙ্গীতশাস্ত্রকারদের মতে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেবের সময় এই সঙ্গীতধারা সর্বপ্রথম রচিত হয় বলে থাকেন। আবার অন্যান্য বিজ্ঞ-সঙ্গীতশাস্ত্রকারদের মতে তা ঠিক নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে গোয়ালিয়রের রাজা 'মানতোমরই' প্রথম ধ্রুপদ গান রচনা করেন। যাহোক স্রষ্টিকর্তার কোনো বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও মোটামুটিভাবে ত্রয়োদশ বা পঞ্চদশ শতাব্দী হতে ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ গানের প্রচলন ছিল তা মানা যেতে পারে নিঃসংশয়ে। আবার সম্রাট আকবরের সময়ে যে ধ্রুপদ-সংস্কৃতি, গৌরবের শিখরে পৌঁছেছিল সে সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা করা যেতে পারে। বিখ্যাত সিদ্ধসঙ্গীত শিল্পী মিঞাতান বোল, ধ্রুপদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গানে যাঁর অবদান অনস্বীকার্য, তিনি এই সম্রাট আকবরের রাজদরবারে সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত ছিলেন এবং শোনা যায় যে, পরবর্তীকালেও তাঁর সমকক্ষ ধ্রুপদী, জন্মায় নি। তাই এই সময় হতেই যে ধ্রুপদ গান অত্যন্ত জনপ্রিয় সঙ্গীত ছিল তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। তানসেন বৃন্দাবনের স্বামী হরিদাস ডাগুরের শিষ্য ছিলেন বলে জানা যায়। স্বামী হরিদাস, তানসেন, নায়ক গোপাল, নায়ক বৈজু, নায়ক চর্জু, নায়ক বকসু, নায়ক ধন্দু, প্রভৃতি বিখ্যাত ধ্রুপদ গান রচয়িতা ও শিল্পীদের রচিত গানগুলি আজও বিখ্যাত শিল্পী কর্তৃক গীত হচ্ছে।

এই গান পাখোয়াজ সঙ্গতে গাওয়া হয়ে থাকে। চৌতাল, ধামার, সুরফাঁকতাল, তেওরা, ব্রহ্মতাল প্রভৃতি এই গানের তাল। বর্তমানে এইসব তালে, পাখোয়াজের পরিবর্তে কোনো কোনো সময় তবলা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ধ্রুপদ গানে খেয়াল গানের ন্যায় আকারযুক্ত গিটকারী তানের সংযোজন করা হয় না। তবে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চৌগুণ ও উপজ প্রভৃতি লয়কারী ধ্রুপদ গায়কীর অন্তর্গত। প্রাচীনকালের কোনো কোনো সঙ্গীতজ্ঞের মতে ধ্রুপদ গানের গীত শৈলাতে আদৌ কোনো প্রকার লয়কারী করার প্রথা, পুরাতন সময়ে ছিল না। ধ্রুপদ গান শুরু করার পূর্বে বাণীযুক্ত আলাপ করার পদ্ধতি বহু পুরাকাল হতেই প্রচলিত আছে। এই আলাপ গান করার সময়, রাগরূপের যত প্রকার বৈচিত্র্য করা সম্ভব, তা এই আলাপ গানের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে করা হত। কিন্তু যখন ধ্রুপদগান শুরু করা হত তখন রাগ বিস্তারের স্বাধীনতা আর থাকত না। ধ্রুপদের বাণীর ভাবের ও রসের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন প্রকার লয়ের, উপজ লয়কারী করা হয়। ধ্রুপদগান, প্রায় ছয় শত বৎসর ধরে অত্যন্ত জনপ্রিয়তার সঙ্গে প্রচলিত আছে। কিন্তু খেয়াল গান আনুমানিক মাত্র একশত হতে একশত পঞ্চাশ বৎসর ধরে শোনা যায়। কিন্তু ধ্রুপদ গান হতেই খেয়াল গান, বর্তমানে উত্তর ভারতে অধিক প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর হতে স্বতন্ত্র অধ্যয়নের দৃষ্টিকোণ জাগৃত হওয়ায় ধ্রুপদ গানের প্রচার ও প্রসার আবার বৃদ্ধি হয়েছে এবং ধ্রুপদের ভবিষ্যৎ আবার আশাপ্রদ দেখা যাচ্ছে।

প্রাচীনকালে ধ্রুপদী শিল্পীদের 'কলাবন্ত' বলা হত। ধ্রুপদ গানে চারটি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাণীর কথা শোনা যায়। যেমন,—খাণ্ডার, নৌহার, ডাগর ও গৌড়হর প্রভৃতি। এই বাণীগুলির দ্বারা ধ্রুপদ গানে বিভিন্ন গীতরীতি প্রকাশিত হয়। কোনো কোনো মতে এই বাণীগুলি আঞ্চলিক কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি পরে আরো বিশদভাবে আলোচিত হবে।

ধামার—ধামার, ধ্রুপদ সঙ্গীতেরই আরো একটি শাখা। এই শাখার ধ্রুপদ গানে প্রধানতঃ হোলী বিষয়ক রচনা পাওয়া যায়। ধ্রুপদ গান ধামার তালে রচিত এবং হোলী বিষয়ক গীতগুলিই প্রধানতঃ "ধামার" বলা হয়। এই ধামারের গীতে রাধাকৃষ্ণের বা গোপীগণের লীলা-মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। ধ্রুপদ গানে যে গাম্ভীর্য পাওয়া যায়, ধামার গানে তুলনাক্রমে তা কম। ধামার গানে উপজ, ছন্দ, লয়কারী করার বিশেষ প্রচলন আছে। তবে উপজ, ছন্দ ও লয়কারী সর্বদা গীত রচনার ভাব ও রসের উপর নির্ভরশীল। এই ধামার গান ধ্রুপদ গানের অন্তর্গত কিনা, তা নিয়ে কিছু মতপার্থক্য দেখা যায়। কোনো কোনো মতে ধামার গান, ধ্রুপদ গানের অন্তর্গত নয়। ইহা সঙ্গীতের সম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র ধারা বিবেচিত হয়। পূর্বে অনেক খেয়াল গায়কেরা খেয়াল গান করার আগে, বাণীযুক্ত আলাপ করে ধামার গাওয়ার রীতি অবলম্বন করতেন এবং এইভাবে ধ্রুপদ গান হতে ধামার গানকে পৃথক, বলতে শোনা যায়। ধামারে সাধারণতঃ পাখোয়াজ সঙ্গতের রীতি আছে। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে তবলা সঙ্গতেই ধামার গান গাওয়া হত। তবে ধামার গানের রচনা যে সর্বদাই হোলী বিষয়ক ছিল, সে বিষয়ে কোনো মতদ্বৈত নেই।

খেয়াল—এর পরবর্তি বিশিষ্ট সঙ্গীত ধারা হল খেয়াল। 'খেয়াল' শব্দটি ফারসী শব্দ হতে গৃহীত এবং ইহার শব্দার্থ হল "কল্পনা"। রাগের নির্দিষ্ট নিয়মগুলি বজায় রেখে শিল্পী নিজস্ব কল্পনার দ্বারা বৈচিত্র্য সহকারে ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করে এবং যে আলাপ বিস্তার ও তান, গীতের সঙ্গে সংযুক্ত, এইরূপ গীতরীতি "খেয়াল গান" নামে পরিচিত। খেয়াল গানের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করা হয় এবং একতাল, ত্রিতাল ঝাপতাল ও ঝুমরা প্রভৃতি তালে খেয়াল গান গীত হয়। খেয়াল গানের রচনাগুলিতে কেবলমাত্র স্থায়ীও অন্তরা, ভাগ থাকে অর্থাৎ এই গানগুলির বাণী খুবই ছোট হয়। কিন্তু স্বর বিস্তার, তান সরগম প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা ঘণ্টাধিককাল ধরে এক একটি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাগ ও গান গীত হতে দেখা যায়। খেয়াল গান সাধারণতঃ দুই প্রকারের দেখা যায়। প্রথমতঃ বিলম্বিত খেয়াল বা বড় খেয়াল এবং মধ্যলয়ের খেয়াল বা ছোট খেয়াল। বিলম্বিত বা বড় খেয়াল অত্যন্ত বিলম্বিত গতিযুক্ত হয়ে গীত হয় এবং এইভাগে রাগের বিস্তারই অধিক করা হয়ে থাকে, যাকে আলাপের সমতুল্য বলা যেতে পারে। এরূপ বিস্তার কখন আকারে হয়, কখন বা গীতের এক একটি বাণীর অবলম্বনে করা হয়। শেষের দিকে কিছু সারগম, বোলতান ও লয়কারী করা হয়। কিন্তু মধ্যলয়ের বা ছোট খেয়ালে, শুরুতেই দ্রুতগতির তানের বাহারে গানের মধ্যে নানা প্রকার ছন্দ বৈচিত্র্যের ও স্বর সৌন্দর্যের সৃষ্টি করা হয়। ধ্রুপদ গানের গায়কীতে রাগের শুদ্ধতা ও রাগের রূপ যতটা বজায় রাখা সম্ভব, খেয়াল গানের গায়কীতে ততোটা রাখা সম্ভব হয় না। খেয়াল গায়কীতে শিল্পীর স্বাধীনতা থাকায়, কখন কখন সৌন্দর্য সৃষ্টি ও বৈচিত্র্য রচনা করবার সময় রাগাঙ্গের কিছু ব্যতিক্রম হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ধ্রুপদের গায়কীতে শিল্পীর স্বেচ্ছাচারের সুযোগ অতি অল্প, সেজন্য রাগাঙ্গের বিচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনাও খুব কম। খেয়াল গান সাধারণতঃ শৃঙ্গার রস প্রধান দেখা যায়। তবে অন্যান্য রসের রচনাও পাওয়া যায়। বিলম্বিত খেয়ালে একতাল, ঝুমরা, তিলবাড়া, আড়াচৌতাল প্রভৃতি তাল এবং মধ্যলয়ের খেয়ালে ত্রিতাল, দ্রুত একতাল, ঝাপতাল প্রভৃতি তাল সাধারণতঃ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মধ্যলয়ের খেয়ালে তালের গতি শেষ পর্যন্ত কতটা দ্রুত হবে, তার কোন নির্দেশ নেই। খেয়াল গানের প্রচার, চতুর্দশ শতাব্দীতে আমীর খসরু দ্বারা এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে জৌনপুরের নবাব সুলতান হুসেনশর্কীর আমলে হয়। আমীর খসরু যিনি কাবাল গানের স্রষ্টা ছিলেন, কোনো কোনো মতে ছোট খেয়াল তাঁরই সৃষ্ট। কলাবন্ত খেয়াল বা বড় খেয়াল জৌনপুরের সুলতান হুসেন-শর্কীর আবিষ্কৃত গীতরীতি, এরূপ শোনা যায়। পরবর্তি যুগে, মুঘল বাদশাহ মুহম্মদ শাহ রঙ্গীলের দরবারের বিখ্যাত ধ্রুপদী শিল্পী সদারঙ্গ ও অদারঙ্গ বহু খেয়াল গান রচনা করে, খেয়াল গানের প্রচার বৃদ্ধি করেন। মহম্মদশাহ নিজেও বহু খেয়াল গান রচনা করেন। এই সব শিল্পীরা খেয়াল গান রচনা করলেও নিজেরা ধ্রুপদী শিল্পী ছিলেন এবং সর্বদাই ধ্রুপদ গান করতেন, খেয়াল গান করতেন না। এই অবস্থা হতে বোঝা যায় যে, সে যুগে এমন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধ্রুপদী শিল্পী ছিলেন যে, তাঁদের সামনে খেয়াল গান, অথবা তাঁদের ধ্রুপদ গানের পর খেয়াল গান আদৌ সমাদর লাভ করতে সক্ষম হত না। তাই সবার চেষ্টা ছিল ধ্রুপদী শিল্পী হবার। বর্তমানে যে সমস্ত বিখ্যাত খেয়াল গান শোনা যায়, তার অধিকাংশই এই সব ধ্রুপদী শিল্পীর দ্বারা রচিত। তাঁদের উপযুক্ত শিষ্যদের মধ্যে মনরঙ্গ, হররঙ্গ, রসরঙ্গ, গোয়ালিয়রের হদ্দু খাঁ, হস্সু খাঁ, নত্থ্ খাঁ এবং এঁদের পূর্বপুরুষ নত্থন্ পীরবকস্ও সদারঙ্গ, অদারঙ্গের শিষ্য। রামপুরের উজীর খাঁ সাহেব সদারঙ্গ ও অদারঙ্গের ঘরের উত্তরাধিকারী ছিলেন। উপরিউক্ত পুরাতন শিল্পীরা সবাই ধ্রুপদ গায়ক বা বীণকার ছিলেন, কিন্তু তাঁদের শিষ্যদের তাঁরা খেয়াল বা স্বরোদ প্রভৃতি শিক্ষা দেন। খেয়াল গায়কীর বিশদ ব্যাখ্যা পরবর্তি অংশে করা হবে।

টপ্পা—মরুভূমির উষ্ট্র চালকদের একপ্রকার গীতের অনুকরণে পাঞ্জাবে এই টপ্পা গানের প্রচলন ছিল। গোলাম নবী শোরী মিঞা এই গীতশৈলী, সারা উত্তর ভারতে প্রচার করেন। টপ্পা গান পাঞ্জাবী ভাষাতেই রচিত। এই গান তানপ্রধান ভাবসঙ্গীত বলা যেতে পারে। কারণ গানের সুরে সর্বদাই ছোট ছোট তানকর্তবযুক্ত থাকে। যার ফলে এই গায়কী অত্যন্ত কঠিন মনে হয়। গলার গিট্‌কারী তান তৈয়ারী করার জন্য টপ্পা গানের শিক্ষা অত্যন্ত সহায়ক হয়। এই গান শৃঙ্গার রসের অন্তর্গত। এই গান কাফী, খাম্বাজ, পিলু, ভৈরবী প্রভৃতি হাল্কা রাগে এবং যৎ, আদ্ধা প্রভৃতি তালে গীত হয়। এই গীত শৈলী হতে বাংলায় রামনিধিগুপ্ত নামক একজন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ও রচয়িতা, "বাংলা টপ্পা" নামে এক প্রকার গানের চলন বাংলাদেশে প্রচার করেন। এই গানের গায়কী পাঞ্জাবী টপ্পা গান হতে কিছুটা সহজ তানযুক্ত ও গায়কী পাঞ্জাবী টপ্পা গান হতে কিছুটা সহজ। বাংলায় এক সময় এই গান অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। আড়াঠেকা মধ্যমান, যৎ প্রভৃতি তালে এবং কাফী, খাম্বাজ, ভৈরবী, সিন্ধু প্রভৃতি হাল্কা রাগে গীত হত।

ঠুংরী—এই গান ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি হতে হাল্কা প্রকারের গান। এই গানের বাণী খুবই অল্প এবং কেবল স্থায়ী ও অন্তরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু বাণী অল্প হলেও গায়কীতে বোল সৃষ্টির দ্বারা ভাবের বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। এই গীতরীতিতে ছোট ছোট

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

খট্‌কা, মূর্কীর প্রভৃতি তানযুক্ত করে গীতের সৌন্দর্য বর্ধন করা হয়। টপ্পার ন্যায় ঠুংরী গানের মধ্যে চাপল্যভাব থাকে। করুণ, শৃঙ্গার প্রভৃতি রসের অন্তর্গত এই গান। পিলু, খাম্বাজ, কাফী ভৈরবী, সিন্ধু প্রভৃতি রাগে ও বং, দীপচন্দী প্রভৃতি তালে এই গান গীত হয়। এই ঠুংরী অঙ্গের গান এক এক ঋতুতে বা সময়ে যখন গীত হয়, তাদের নামকরণেও কিছু পার্থক্য পাওয়া যায়। যেমন—বসন্তকালে গেয় ঠুংরী গানকে "হোলীঠুংরী", বর্ষাকালে গেয় ঠুংরী গান, "কাজরী" চৈত্র মাসে গেয় "চৈতী" প্রভৃতি নামকরণ পাওয়া যায়।

শতবর্ষ পূর্বে লখনৌ প্রদেশে ঠুংরী গানের প্রচলন সুরু হয় এরূপ শোনা যায়। বেনারসেও ঠুংরী গানের বিশেষ প্রচলন আছে। পাঞ্জাব প্রদেশের ঠুংরী গানের গায়কীতে, পূরব অঙ্গের ঠুংরী হতে কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

তারাণা—ইহা খেয়াল অঙ্গের একপ্রকার গীতরীতি। এই গানে সাধারণতঃ কোনো অর্থযুক্ত ভাষা নেই। তা না রী ত ন দির্, তোম্ দানী প্রভৃতি শব্দযোগে, রাগ ও তালে নিবদ্ধ রচনা। এগুলি সাধারণতঃ মধ্যলয়ের খেয়াল গাইবার পরই গীত হয়। তারানা গান, হজরত আমীর খুসরু ইরানী ঢংগে সৃষ্টি করেন বলে জানা যায়। এই গান তবলা ও পাখোয়াজ উভয় প্রকার সঙ্গতেই গীত হতে দেখা যায়। এই গানের রচনার মধ্যে তবলা বা পাখোয়াজের বোলও সংযুক্ত থাকতে দেখা যায়। বিলম্বিত লয়ের গানেও তারাণা গীত হয়। তবে তা খুবই অল্প। বাহাদুর হোসেন খাঁ, তানরস খাঁ, নত্থু খাঁ। প্রভৃতি সঙ্গীত রচয়িতাদের তারাণা গান পাওয়া যায়।

ত্রিবট—এই গানে তিনটি প্রকারের ঢংগ একত্রে গ্রথিত থাকে। যেমন, তারাণার বাণী, সারগম, পাখোয়াজ বা তবলার বোল অথবা গানের বাণী এই চারিটি ভাগের মধ্যে যে কোনো তিনটি ভাগ সংযুক্ত থাকে। এই প্রকার গান আজকাল খুব কমই গাওয়া হয়।

চতুরঙ্গ—উপরিউক্ত অঙ্গগুলির চারিটি অঙ্গ একত্রে যেসব গীতে পাওয়া যায় তাকে 'চতুরঙ্গ' বলা হয়। যেমন—তারাণা,' সারগম, পাখোয়াজ বা তবলার বোল ও গানের বাণী প্রভৃতি একত্রে থাকে। এই গান সাধারণতঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পাখোয়াজ সঙ্গতে গীত হয়। তবে তবলা সঙ্গতেও গাওয়া যেতে পারে।

লক্ষণগীত—যে গানের ভাষায় রাগের ঔপপত্তিক বিবরণ থাকে তাকে "লক্ষণগীত" বলা হয়ে থাকে। রাগের ঔপপত্তিক বিবরণ অর্থাৎ বাদী, সম্বাদী, আরোহী' অবরোহী, ব্যবহৃত স্বরের নির্দেশ, সময়, বর্জিতস্বর প্রভৃতি রাগলক্ষণগুলি স্পষ্টভাবে বর্ণিত থাকে। লক্ষণগীত সাধারণতঃ দুই কলির অর্থাৎ স্থায়ী ও অন্তরাযুক্ত হয়। এই লক্ষণগীত ধ্রুপদ ও খেয়াল উভয় শৈলীর, গান হয়। শোনা যায় এই গীতের প্রচলন করেন চতুর পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী।

স্বরমালিকা—রাগে ব্যবহৃত স্বরসমষ্টি, তালে নিবদ্ধ রচনাকে 'স্বরমালিকা' বলা হয়। এই স্বরমালিকা ধ্রুপদ ও খেয়াল যেকোনো অঙ্গের হতে পারে ও পাখোয়াজ বা তবলা যেকোনো প্রকারের সঙ্গত হয়। সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের স্বরের ও রাগের জ্ঞান করাবার জন্য প্রথমে স্বরমালিকা শিক্ষা দিবার প্রথা আছে। এই স্বরমালিকাও স্থায়ী ও অন্তরা দুই কলির হয়। যন্ত্রসঙ্গীতে এই স্বরমালিকা 'গৎ' নামে পরিচিত এবং পূর্ণ গায়কীতে বাজানো হয়।

গজল, ভজন ও গীত—এগুলি লঘু সঙ্গীতের পর্যায়ে। 'গজল' সাধারণতঃ উর্দু ভাষায় রচিত ভাবপ্রধান গান। 'ভজন', ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ভক্তিপ্রধান গান। তুলসীদাস, কবীর, মীরা প্রভৃতি রচয়িতাদের বহু 'ভজন গান' পাওয়া যায়। গজল ও ভজন ছাড়া হিন্দী ভাষায় রচিত কাব্য সাহিত্যের গানকেই 'গীত' বলা হয়। এগুলিই দাদরা, কাহারবা প্রভৃতি তালে এবং মিশ্র রাগে গীত হতে দেখা যায়।

আধুনিক নিবদ্ধ গানের অন্তর্গত, ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, তারাণা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ, লক্ষণগীত, স্বরমালিকা, গজল, গীত ও ভজন প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আধুনিক নিবদ্ধ গানের সব ক'টির আলোচনা পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র। তবে এর মধ্যে কয়েকটির মুখ্য গীতরীতির কিছু বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা ও তার পরিচয় দেওয়া দরকার।

ধ্রুপদ ও ধামার—এই গীতরীতির মধ্যে খটকা, মূর্কী প্রভৃতির ব্যবহার হয় না। কেবল মীড়, গমক, কণ প্রভৃতির ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কণ প্রয়োগ করার সময় ও খটকাযুক্ত কণ প্রায় আদৌ ব্যবহার করা হয় না। ধামার অপেক্ষা ধ্রুপদ গানের গাম্ভীর্য অধিক মাত্রায় বর্তমান থাকে। যদি পঞ্চম স্বরের উপর কিছুক্ষণ দাঁড়ানো হয় এবং পরে আবার তীব্রমধ্যম কণরূপে প্রয়োগ করে পঞ্চম স্বরটিকে আবার গাইতে হয়, তবে তীব্রমধ্যম স্বরটি অত্যন্ত সাবধানে মীড়ের মত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন—প মপ। কিন্তু খেয়াল গায়কীতে পঞ্চম স্বরে তীব্রমধ্যম কণস্বররূপে ব্যবহার করার সময় তীব্রমধ্যম স্বরে ঝটকা দিয়ে পঞ্চম স্বরে যাওয়া যেতে পারে। যেমন—মপ। ধ্রুপদ ধামার গানের বাণীর ভাবের কথা স্মরণ রেখে, গানের গায়কী রচিত হয়। বর্তমানকালেও রামপুর ঘরানার কয়েকজন ভাল ধ্রুপদী শিল্পী আছেন এবং বাংলা দেশেও ভাল ধ্রুপদ গান আজও শোনা যায়। ধ্রুপদগান গাইতে হলে বিশেষ দম থাকা দরকার এবং কণ্ঠস্বর বেশ ভালভাবে সাধনার দ্বারা সুরেলা ও সংযত হওয়া দরকার। ধ্রুপদ গানের প্রচার, বর্তমানে খুব কমে যেতে আরম্ভ হয়েছে কারণ—(১) খেয়াল গানের গীতরীতিতে যে স্বতন্ত্রতা পাওয়া যায়, ধ্রুপদ গানে ততোটা নেই। শ্রোতা, খেয়াল গানে গায়কের বিভিন্ন প্রকার বোলতান ও সরগম তানের দ্বারা বিস্মিত ও আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান। খেয়াল গানে রাগ বিস্তার করার সময় রাগ রূপ ও রাগের পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য অধিক পরিমাণে সাবধান হতে হয় না। ফলে গীত পদ্ধতি অনেকটা সহজলভ্য হয়ে ওঠে। আর তান করার সময় রাগের রূপও কিছু না কিছু ভ্রষ্ট হয়। কিন্তু এই দোষ হতে শিল্পী মুক্ত হতে পারেন, যদি সেই শিল্পী ভালভাবে সঙ্গীত শিক্ষা করেন অর্থাৎ তাঁর আলাপ ও ধ্রুপদের কিছু শিক্ষা থাকে। আর দ্বিতীয়তঃ তানের ব্যবহারের সময় তানের কারুকার্যে শ্রোতারা রাগের রূপের কথা ভুলে যান। ধ্রুপদ গানের মধ্যে ইচ্ছা মত কোনো স্বরের বিস্তার করার কোনো সুযোগ নাই। তবে আলাপ গানে পদ্ধতি সহকারে এই স্বর বিস্তার করার সুযোগ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ খেয়াল গানে তবলার সঙ্গতে গানের বাহার আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও শ্রোতার মন আকর্ষিত করে বিশেষ করে যখন গানের লয় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে তবলার সাথে ছোটে। গানের মধ্যে লয়কারীর সৌন্দর্যও শ্রোতাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। তৃতীয়তঃ পরিস্থিতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকের মনে শৃঙ্গার রসের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশেষ করে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মুসলমান নবাব বাদশাদের দরবারে, শিল্পীরা বাদশাহদের প্রসন্ন করার জন্য, পরবর্তি সময়ে শৃঙ্গার রস সম্বন্ধীয় রচনার সঙ্গীত অধিক পরিমাণে পরিবেশিত হত। এই ভাবে কিছু ধ্রুপদ গানও শৃঙ্গার রসে রচিত হয়। পূর্বে ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ গানে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ভক্তিভাবের গান অধিক পাওয়া যেত, কিন্তু সেই সব গীত রচনার মাহাত্ম্য কমতে লাগলো এবং ক্রমশঃ খেয়াল, ঠুংরী প্রভৃতি শৃঙ্গার রসের রচনার প্রচার ও প্রসার বাড়তে লাগলো। মানুষের মনে চপলতার ভাব বৃদ্ধি হতে থাকায় এবং সহজলভ্যের প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়ায় উৎকর্ষ ও সাধনার দিকটা অগ্রাহ্য হতে থাকে। ফলস্বরূপ, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তার প্রতিচ্ছবি দেখা দেয়। ধ্রুপদ গানের গাম্ভীর্য ও স্থিরতা কোনো কোনো বড় খেয়াল গানেও অবশ্য আছে এবং সেই সব খেয়াল গানের প্রতিও বর্তমান শিল্পীদের আকর্ষণ অধিক দেখা যায় না। চতুর্থতঃ ধ্রুপদ গানের সাধনা, অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে ও নিষ্ঠা সহকারে করতে হয়। সাধারণ খেয়াল গান তুলনায় অল্প সাধনাতেই শিক্ষা করা যায়। খেয়াল গান বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য, আর ধ্রুপদ সঙ্গীত চরিত্র সৃষ্টিকারক। প্রাচীনকালে ধ্রুপদ গায়ককে 'কলাবন্ত' বলা হত এবং তার বিভিন্ন গায়কীর ধারা ছিল। এই ধারাগুলিই "বাণী" বলা হত যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কথিত আছে যে, অতি প্রাচীন কালের গায়ন-রীতি হতেই বিভিন্ন প্রকারের 'বাণীর' উৎপত্তি হয়েছে। এই গায়নরীতিগুলিকে প্রাচীন সঙ্গীতে 'গীতি' বলা হত। ইহা পাঁচ প্রকারের ছিল। শুদ্ধা—যে গীতিতে বক্রস্বরের ব্যবহার থাকত ও অত্যন্ত মধুর স্বর যুক্ত হত। ভিন্না—এই গীতিতে সূক্ষ্মরূপে স্বরের বক্রত্ব এবং মাধুর্যপূর্ণ গমকযুক্ত গায়কী থাকত। গৌড়ী—এই গায়কীতে তিন সপ্তকে গাম্ভীর্যপূর্ণ "উহাটী" গমক এবং লালিত্যপূর্ণ স্বর প্রয়োগ করা হত। বেসরা—এই রীতিতে ইকার ও উকার যোগে দ্রুতগতিতে চতুর্বর্ণযুক্ত স্বর রচনা প্রযুক্ত হত। অপরটি সাধারণী।

খেয়াল—খেয়াল গান সম্বন্ধে পূর্বেই বলা বলা হয়েছে এবং খেয়াল গানে বিবিধ প্রকার তানের ব্যবহারের কথাও বলা হয়েছে। এখানে কেবল কিছু তানের উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে এবং খেয়াল গানে খট্‌কা, মূর্কী এবং দানার ব্যবহারের কিছু নমুনাও দেখানো হল, যেগুলির ব্যবহারে গানের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য বাড়বে। যেমন—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শুদ্ধ তান—সা রেগম পধনির্সা নিধপমগরে সা।

কুটতান—সা রে গম গমধপ মগরেগ মপধনি মনি ধপ মগ মপ মগ

রেগ পমগরে সা।

মিশ্রতান—সা রে গ মপধপম পমগরে মগ পম ধ নি র্সা র্রের্গর্রের্সা

র্সানিধপ মগরে নিধ মধপম গরেসা।

সপাট তান বা

ঢাল তান—সারেগম পধনির্সা র্রের্গর্মর্পর্মর্গর্রের্সা নিধপ মগরেসা।

বক্র প্রকৃতি যে রাগগুলি পাওয়া যায়, সেই রাগের চলন অনুযায়ী বক্র গতিতেই শুদ্ধ তান হতে পারে। কিন্তু এই প্রকৃতির রাগে সপাট তান হতে পারবে না।

ছুট তান—র্গ—র্গর্রের্সা নিধ পমগরেসা...। অর্থাৎ উপরের কোনো স্বর হতে হঠাৎ তান দ্রুতগতিতে পূর্বাঙ্গে নেমে আসে।

অলঙ্কারিক তান—সারেগগ রেগমম গমপপ মপধধ পধনিনি ধনির্সার্সা

নির্সার্রের্রে র্সার্রের্গর্গর্রের্সা নির্সা পধনিনি ধপমপ সারেগগ রেসানিসা। অথবা সারেসগ রেগরেম গমগপ মপমধ পধপনি

ধনিধর্সা নির্সানির্রে র্সার্রের্সার্গ র্সানিধ নিধপ ধপম পমগ মগরে গরেসা।

দানাযুক্ত তান—যে তানগুলির সঙ্গে কণস্বর অধিকমাত্রায় যুক্ত হয় তাকে "দানাযুক্ত তান" বলা হয়। দানাযুক্ত তান কয়েক প্রকারের পাওয়া যায়। এই তানগুলি সরল প্রকৃতির হলে "কনযুক্ত" তান বলা হয়ে থাকে। দানাযুক্ত তানগুলি সাধারণতঃ দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়।

ধ প ম গ

একটি দানাযুক্ত তান—মপধ প, গমপ ম, রেগম গ, সারেগ রে সা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধ ধ প প ম ম

ছুটি দানাযুক্ত তান—মপধ প প, গমপ ম ম, রেগম গ গ, সারেগ

গ গ
রে রে সা।

গ গ গ ম ম ম প প প

তিনদানাযুক্ত তান—সারেগ রে রে রে, রেগম গ গ গ, গমপ ম ম ম.

প্রভৃতি।

রে

একদানার পেঁচদার একহারার টুকরোযুক্ত তান—সারেগমগ গ, রেগমপম

গ ম প
ম, গমপধপ প, মপধনিধ ধ প্রভৃতি।

রে সা

একদানার পেঁচদার দোহারার টুকরোযুক্ত তান—সারেগমগ গমগ রে,

গ রে
রেগমপম মপম গ প্রভৃতি।

উপরিলিখিত দানাযুক্ত তানগুলি ঝট্‌কা দিয়ে উচ্চারণ না করে যদি ভাবযুক্ত মীড়ের সাহায্যে গাওয়া হয়, তাহলে আরো সৌন্দর্যপূর্ণ হবে। কিন্তু এই তানগুলি কিরূপ ভাবযুক্ত মীড়ের সাহায্যে উচ্চারণ করতে হবে তার সঠিক নমুনা, উপযুক্ত সঙ্গীত গুরুর নিকট হতে না শুন্‌লে রূপটি বোঝা মুস্কিল। তাই এগুলি প্রকৃত সঙ্গীত শিক্ষা গুরুর নিকট হতে শিক্ষা করা দরকার। পুস্তক কেবলমাত্র কিছু অনুমান লাভের সাহায্য করতে পারে।

ফিরতের তান—সারে গম পপ ধধ পমপ ধধ, গমপ ধধ, রেরে, গগ, মপ ধধ গগমম পপ ধধ, গগ পপ মম পপ ধধ, রেরেরে গগগ, মমম পপ ধধ মমম পপপ ধধ, রেগমপ মপ ধধ. গরে, মগ পম, পপ ধধ সাসা সাসা নি ধধ নিনি ধধ পম গরেসা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গমক তান—বরাবর লয়ের তান বেলয়ের তান ও বোলতান প্রভৃতি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বরাবর লয়ের তান অনেক শিল্পী "ঠাহ" লয়ে করার পক্ষপাতী, কিন্তু ইহা তখনই সম্ভব যদি গান মধ্যলয়ে গাওয়া হয়। গান যদি অতি বিলম্বিত লয়ে গীত হয়, তবে তানগুলি সাধারণতঃ দুগুণ বা চৌগুণ প্রভৃতি লয়কারীর তান করা হয়ে থাকে এবং সেই তানগুলি লয়-বরাবর হয় বলে তাকেও বরাবর লয়ের তান বলা যেতে পারে।

টপ্পা ও ঠুংরী—টপ্পা গানের তানে দানাযুক্ত তানের ব্যবহার অধিক হয়, কিন্তু এই দানেদার তান, খেয়াল গানের দানেদার তানের ন্যায় হয় না। খেয়াল গানের দানাযুক্ত তানে লম্বা দানাযুক্ত তান করা হয় এবং মাঝে মাঝে দাঁড়ান হয়। এই ধরণের দানাযুক্ত তানে, অধিক তানের প্যাঁচ থাকে না। কিন্তু টপ্পা গানের দানাযুক্ত তানের গায়কীতে লম্বা দানাযুক্ত তান লাগান হয়ই এবং দানেদার তানের মধ্যে অধিক পরিমাণে প্যাঁচও ব্যবহার করা হয়। টপ্পা গানের তানের মধ্যে আরো বিশেষ ভাব লক্ষ্যণীয় যে, গানে তান করার মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্য ভাব দেখা যায়। অর্থাৎ খেয়াল গানের ন্যায় ধীর স্থির ভাবে গাওয়া হয় না। টপ্পা গানের সুরু হতেই ছোট প্যাঁচযুক্ত তান গাওয়া হয় এবং পরবর্তি অংশে বড় বড় দানাযুক্ত প্যাঁচ তানের অবতারণা করা হয। টপ্পা গানের তানের কিছু নমুনা নিম্নে দেওয়া হল।—

. . সা . .   . . . . গ . . . . রে .   . .
ধনিসারে রেসা নিধনি, সারেগম মগরেগ সা ধনিসারে

সা . . নি .   প . ধ
রেসা সানি ধনিধ ধপমনি নিধপম গরে সানিসা,

প্রভৃতি।

ঠুংরী গানে খেয়াল অথবা টপ্পা গানের মত দানেদার তান বা লম্বা লম্বা সোজা তানের ব্যবহার হয় না। ঠুংরী গান ভাব প্রধান গান। সেজন্য বাণীর ভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে নানা ভাব প্রকাশের জন্য নানা প্রকার স্বর বিন্যাসের অবতারণা করা হয় এবং গায়কীতে বোল বানান হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মাঝে মাঝে ছোট ছোট মুর্কী বা গিট্‌কিরি প্রভৃতি তানের কিছু কিছু নমুনা দেওয়া হল। যেমন—

মীড় ও কোমল খট্‌কা— সাঁধসাঁনি নিধপ গমগ গমপধনি ধনি

নি নি

পধপনি ধপ গমগ পধনি ধপ গমগ রেসা।

নি

মুর্কী ও গিট্‌কিরি তান—সা নি (সাঁ) ধসাঁনি ধপ গ (ম) গ গম গম (সাঁ)

প

নিধপ গ মগ গ (ম) (প) মগ রেসা।

গমপধপমপধনি ধপ গমপধপম পধনিধ প ধনিসাঁ নি সাঁ।

নি ধ প

নি নি ধনিসাঁ সাঁ নিধপ ধপ সাঁ নি নিধ ধনিসাঁ নি সাঁ।

ঠুংরী গানের এইসব খট্‌কা ও মুর্কী তানের ঠিক ঠিক পদ্ধতিপূর্ণ অভ্যাস ও শিক্ষা, একমাত্র গুরুর নিকট হতে প্রত্যক্ষভাবে শুনেই হতে পারে। খেয়াল গানে নিপুন শিল্পী হতে গেলে, ধ্রুপদ, টপ্পা ও ঠুংরী গানের অভ্যাস করা আবশ্যক। কারণ, আলাপ ধ্রুপদ গান হতে প্রকৃত রাগরূপ ও গানের গাম্ভীর্য আয়ত্ব হয় এবং স্বরের উপর দখল আসে। ঠুংরীর ঢংগ হতে বাণীর ভাব অবলম্বন করার অভ্যাস হয় ও টপ্পা গানের দানাযুক্ত তান, গানে বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য রচনা করতে সহায়তা করে।

পণ্ডিত—যে সঙ্গীতশিল্পী কণ্ঠসঙ্গীত বা যন্ত্রসঙ্গীত উত্তমরূপে পরিবেশন করতে পারতেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গীতশাস্ত্রের জ্ঞানও পূর্ণরূপে অর্জন করতেন, তাকে প্রাচীনকালে সঙ্গীতে "পণ্ডিত" বলা হত। বর্তমানেও এই ধরণের হিন্দু সঙ্গীতজ্ঞদের "পণ্ডিত" এবং মুসলমান শিল্পীদের "ওস্তাদ" বলতে শোনা যায়।

বাগ্‌গেয়কার—যে সঙ্গীতজ্ঞেরা সঙ্গীতশাস্ত্রে, স্বর রচনায় ও গীত রচনা প্রভৃতিতে দক্ষ হতেন তাঁদের "বাগ্‌গেয়কার" বলা হত। বাগ্‌গেয়কারের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থ হল সঙ্গীতের কাব্য রচনা ও সুর রচনা উভয় গুণের অধিকারী। রাগ অর্থে বাণী বা কাব্য এবং গেয় অর্থে গান বা সুর। কোনো কোনো পণ্ডিতরা "মাতু বা ধাতু"কে বাগ্গেয়কারের গুণের অন্তর্গত বলেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে Composer নামে যে শব্দটি পাওয়া তা ভারতীয় বাগ্গেয়কারের সমতুল্য। কিন্তু পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বিখ্যাত Composer-দের মধ্যে সকলেরই কাব্য রচনার ক্ষমতা ছিল না। যাঁরা সুরকার ছিলেন তাদেরই সাধারণভাবে Composer বলা হয়েছে। কিন্তু বাগ্গেয়কারের বেলায় সঙ্গীতের কাব্য রচনা ও সুর রচনা প্রভৃতি উভয়ের জ্ঞান থাকা অবশ্য দরকার।

সঙ্গীতরত্নাকর গ্রন্থে বাগ্গেয়কারের আটাশটি গুণের কথা বর্ণিত আছে। তার মধ্যে মুখ্য গুণগুলি নিম্নে বর্ণিত হল।

(ক) সাহিত্যের জ্ঞান। অর্থাৎ প্রবন্ধ, ব্যাকরণ, ছন্দ রস এবং অলঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রকার গ্রন্থ ও শাস্ত্রের জ্ঞান।

(খ) দেশের রীতি, স্থিতি, চাল ও প্রচলিত বিভিন্ন ভাষা প্রভৃতির জ্ঞান।

(গ) সঙ্গীতশাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞান। অর্থাৎ গান, বাজনা ও নৃত্য এই তিন শাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞান।

(ঘ) সঙ্গীতকলার পূর্ণ জ্ঞান। অর্থাৎ লয়, তাল, রাগ ও সুর প্রভৃতি সবের পূর্ণ জ্ঞান ও পরিবেশন করার ক্ষমতা।

(ঙ) বিভিন্ন শব্দের বৈশিষ্ট্য "কাকুর" জ্ঞান। ধ্বনির বিভিন্ন বিকারকে "কাকু" বলা হয়। কাকু ছয় প্রকারের। স্বরকাকু, রাগকাকু, দেশকাকু, ক্ষেত্রকাকু, অন্যরাগকাকু ও যন্ত্রকাকু।

(চ) রোগমুক্ত স্বাস্থ্য, শিল্পীসুলভ রূপ ও স্বভাব।

(ছ) অলৌকিক বুদ্ধি, প্রতিভা, সৌন্দর্যতত্ত্ব ও আনুপাতিক জ্ঞান প্রভৃতি।

(জ) একাগ্রতা, সরসতা, রাগদ্বেষ হতে মুক্ত স্বভাব।

(ঝ) সহজেই কাব্য রচনা ও সুর রচনা করার শক্তি।

(ঞ) শ্রোতাকে বোঝাবার ক্ষমতা ও বিষয় সম্বন্ধীয় বক্তৃতা করার ক্ষমতা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সাধারণভাবে বাগ্‌গেয়কারের মধ্যে উপরিউক্ত মুখ্য গুণগুলির বর্তমান দেখা যেত।

নায়কী—গুরুপরম্পরা হতে প্রাপ্ত নীতিগত শিক্ষাকে সঙ্গীতে "নায়কী" বলা হয়। অর্থাৎ গুরুর নিকট হতে প্রাপ্ত শিক্ষা, যার মধ্যে গুরুর সঙ্গীতের শৈলী ও রীতি পূর্ণরূপে বর্তমান, তাহাই "নায়কী"। নায়কীর প্রভাবে সঙ্গীত রচনাগুলি পরবর্তিকালেও অবিকৃত থাকতে সহায়তা করে। একটি গান বা গানের বন্দিশ, নায়কী শিক্ষা পদ্ধতিতে কোনোরূপ পরিবর্তিত হতে পারে না। কারণ নায়কী পদ্ধতি শিক্ষায়, গানের রচনাটি শুদ্ধভাবে শিক্ষা করাই এর বৈশিষ্ট্য।

গায়কী—গুরুপরম্পরা হতে নীতিগতভাবে প্রাপ্ত শিক্ষার সাথে, শিল্পীর নিজস্ব প্রতিভার উন্মেষ, অর্থাৎ অভ্যাস দ্বারা বা গুণী শিল্পীর সঙ্গীত শ্রবণে যে জ্ঞান অর্জন করে, তার সংমিশ্রণে যে স্বতন্ত্ররূপ সঙ্গীতে সৃষ্টি হয়, তাকে "গায়কী" বলা হয়।

নায়ক—সঙ্গীতশাস্ত্রের পূর্ণ অধিকার, চারুকলা শিল্পের পূর্ণজ্ঞান এবং এই অভিজ্ঞতা হতে নিত্যনবীন সঙ্গীত ও গীত রচনার ক্ষমতার অধিকারী হলেন "নায়ক"। যিনি সঙ্গীত প্রত্যক্ষভাবে ও সুন্দর রীতিতে পরিবেশন এবং শ্রোতার মনোরঞ্জন করতে সক্ষম, তিনি গায়ক বা শিল্পী। প্রত্যেক নায়কের অবশ্যই গায়কের বা শিল্পীর গুণ থাকা দরকার এবং উচ্চ পর্যায়ের শিল্পী হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কোনো গায়ক বা শিল্পীর মধ্যে নায়কের গুণগুলি বর্তমান না থাকতেও পারে। নায়ক হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। প্রসিদ্ধ নায়কদের মধ্যে বৈজু, গোপাল, ধন্ধু, চর্জু, বক্সু, হরিদাস এবং তানসেন, সদারঙ্গ, অদারঙ্গ, তানরঙ্গ, তানবরস, মনরঙ্গ, হররঙ্গ, মহম্মদ শাহ, রঙ্গীলে প্রভৃতি গুণী শিল্পীরা স্বীকৃত।

গায়কের গুণ—সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থে গায়কের দ্বাবিংশ গুণের কথা বর্ণিত আছে, দেখা যায়।—উত্তম শিল্পী নিম্নলিখিত দ্বাবিংশ গুণের ও জ্ঞানের অধিকারী হতেন। যেমন—(১) হৃদ্যশব্দ :—এর অর্থ হল সুমধুর ও সুরেলা কণ্ঠস্বর। (২) সুশারীর—যে কণ্ঠস্বরে প্রথম হতেই শ্রুতি ও রাগ রূপ সুরের বর্তমান। (৩) গ্রহমোক্ষবিচক্ষণ—গ্রহ ও ন্যাস স্বরের নিয়মের জ্ঞান।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(৪) রাগরাগাঙ্গভাষাঙ্গ-ক্রিয়াঙ্গোপাঙ্গকোবিদ :—রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ এই চার রাগ-ভেদের জ্ঞান। অর্থাৎ রাগের জ্ঞান, গীতের ভাষার জ্ঞান, রাগে নিবদ্ধ গীতের গায়কী, রাগ বিস্তারের বা স্বরবিন্যাসের পদ্ধতি প্রভৃতির জ্ঞান। (৫) প্রবন্ধগান নিষ্ণাত :—প্রবন্ধগান সম্বন্ধীয় জ্ঞান। (৬) বিবিধালাপ্তিতত্ত্ববিৎ :—বিভিন্ন প্রকার আলাপ গীতরীতির জ্ঞান। (৭) সর্বস্থানোচ্চগমকেষ্বনায়াসলসদ্‌গতি :—মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিন সপ্তকে সর্বপ্রকার গমক করার স্বাভাবিক ক্ষমতা প্রভৃতি। (৮) আয়ত্তকণ্ঠ—কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন এবং উদাত্ত। (৯) তালজ্ঞ :—সঙ্গীতের তালের ও লয়ের পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন। (১০) সাবধান :—একনিবিষ্ট চিত্তে গান করার শক্তি। (১১) জিতশ্রম :—অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে গান করার অভ্যাস অর্থাৎ গানের মধ্যে কোনো পরিশ্রম করার লক্ষণ প্রকাশিত না হওয়া। (১২) শুদ্ধছায়ালগাভিজ্ঞ :—শুদ্ধ, ছায়ালগ ও সংকীর্ণ জাতি ভেদ রাগের জ্ঞানসম্পন্ন। (১৩) সর্বকাকুবিশেষবিৎ—সঙ্গীতশাস্ত্রে বর্ণিত ছয় প্রকার কাকু বা ধ্বনির জ্ঞান। (১৪) আপারস্থায়সঞ্চার :—গান করার সময় স্বরবিস্তারের নানা প্রকার রাগাঙ্গ রচনা করার ক্ষমতা। (১৫) সর্বদোষবিবর্জিত :—দোষত্রুটি বিচ্যুতি রহিত স্বাভাবিক গান। (১৬) ক্রিয়াপর :—শুদ্ধ গানের অভ্যাস। (১৭) অজস্রলয় :—সর্বপ্রকার লয়কারীকরার ক্ষমতা। (১৮) সুঘট :—অতি সুন্দর মনোরঞ্জক গান। (১৯) ধারণান্বিত :—রাগে স্বর ও শ্রুতি প্রয়োগের সঠিক ধারণা। (২০) স্ফূর্জন্নির্জবন :—মেঘের ন্যায় গর্জনকারী গম্ভীর স্বরোচ্চারণ করার ক্ষমতা। (২১) হারিরহঃকৃদ্‌ভজনোদ্ধুর :—চিত্তাকর্ষক গানের দ্বারা শ্রোতার মনকে রাঙিয়ে তোলার শক্তি। (২২) সুসম্প্রদায় :—বিশিষ্ট গুরু পরম্পরার শিক্ষাপ্রাপ্ত।

সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থে বর্ণিত গায়কের গুণের মূলশব্দগুলি ব্যাখ্যাসমেত উপরে লিখিত হল। এই গ্রন্থে গায়কের পঞ্চবিংশ অবগুণের কথাও উল্লিখিত আছে। নিম্নে মুল শব্দগুলি ব্যাখ্যাসমেত বর্ণিত হল :—

(১) সংদষ্ট :—দন্তপিষ্ট করে গান করা। (২) উদঘৃষ্ট :—অত্যন্ত চিৎকার করে নীরস গান করা। (৩) সুত্‌কারী—যার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক শব্দযুক্ত। (৪) ভীত :—ভয়ে ভয়ে বেকার গান করা। (৫) শঙ্কিত-গান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করার সময় শঙ্কিত হয়ে অপ্রয়োজনে তাড়াতাড়ি গান করা। (৬) কম্পিত :—গান করার সময় যার কণ্ঠস্বর কম্পিত হয়। (৭) করালী :—গান করার সময় বিকট হাঁ করা অর্থাৎ মুখের দাঁত প্রভৃতি বার করে গান করা। (৮) বিকল :—গলার সুর ঠিক নেই বা বেসুরো। (৯) কাকী—কাকের ন্যায় কর্কশ কণ্ঠস্বর। (১০) বিতাল :—তালে গান করতে পারে না বা বেতালা। (১১) করভ :—উষ্ট্রের ন্যায় মুখ উঁচু করে গান করা। (১২) উদ্ভট :—ভেরার মত মুখ খুলে ও তুলে গান করা। (১৩) ঝোঁবক :—গান করার সময় গলার শিরা উপশিরগুলি ফুলে উঠা। (১৪) তুঁবকী :—কুমড়োর মত মুখ ফুলিয়ে গান করা। (১৫) বক্রী :—ঘাড় বক্র করে গান করার অভ্যাস। (১৬) প্রসারী :—হাত, পা প্রসারিত করে গান করা (১৭) নিমীলক :—চোখ বন্ধ করে গান করা। (১৮) বিরস :—রঞ্জকতা বিহীন গান। (১৯) অপস্বর :—রাগে ব্যবহৃত স্বর স্মরণ না রাখা বা বিচ্যুতিঘটা। (২০) অব্যক্ত :—গানের উচ্চারণ অস্পষ্ট। (২১) স্থানভ্রষ্ট :—মন্দ্র, মধ্য ও তার স্থানে যে কণ্ঠস্বর ঠিকভাবে যায় না। (২২) অব্যবস্থিত :—অশুদ্ধ পদ্ধতির গান। (২৩) মিশ্রক :—রাগের শুদ্ধতা বজায় রাখতে সক্ষম নয়। (২৪) অনবধান :—বেপরোয়া হয়ে গান করা। (২৫) সানুনাসিক :—নাকীসুরে গান করার অভ্যাস।

বিবাদী স্বরের প্রয়োগ—বিবাদী স্বর রাগে ব্যবহৃত বিধিবদ্ধ স্বর নয়। বিবাদী স্বরকে বাদ দিয়েই রাগ, সাধারণতঃ গীত হয়। কিন্তু কখন কখন দক্ষ শিল্পী অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে এই বিবাদী স্বরের ব্যবহার এমনভাবে করেন যে, রাগের স্বরূপে কোনো প্রকার বিকৃতি আসে না, বরং রাগের সৌন্দর্যবর্দ্ধন করতে সহায়ক হয়। বিবাদী স্বর রাগের সম্পূর্ণ বর্জিত স্বর নয়। যে রাগে এই বিবাদী স্বর, রাগের চলনের সাথে সুন্দরভাবে খাপ খায় সেই সব রাগেই বিবাদী স্বরের প্রয়োগ হয় এবং এরূপ প্রয়োগে রাগের রূপে কোনোরূপ প্রতিকূল ভাবের সৃষ্টি আদৌ হয় না, বরং রাগে সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক হয়। বিবাদী স্বর, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় এবং বিবাদী স্বরের ব্যবহার কোনো কোনো রাগে এতোই জনপ্রিয় হয়ে গেছে যে, সেই রাগে বিবাদী স্বরটি অনুবাদী স্বর রূপে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। হাম্বীর, ছায়ানট, কেদারা, কামোদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও গৌড়সারং প্রভৃতি রাগে কোমল নিষাদ, বিবাদী স্বর ছিল এবং খুব অল্প ব্যবহৃত হত। কিন্তু কালক্রমে উপরিউক্ত কোনো কোনো রাগে বর্তমানে কোমল নিষাদ অনুবাদী স্বররূপে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পূর্বে

নি

উপরিউক্ত রাগগুলিতে কেবল অবরোহণে—"সা ধ প" এইভাবে কোমল নিষাদ, স্পর্শরূপে খুব সামান্য ব্যবহৃত হত। হাম্বীর, কামোদ ও গৌড়সারং রাগগুলিতে পূর্বের ন্যায়, বর্তমানেও কোমল নিষাদ খুবই সামান্য ব্যবহৃত হয়ে, বিবাদী স্বরের বৈশিষ্ট্য বজয়ে আছে।কিন্তু কেদারা ও ছায়ানট রাগে বর্তমানে কোমল নিষাদের ব্যবহার এতোই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, কোমল নিষাদ এই রাগ দুটিতে বিবাদী হতে অনুবাদী স্বরের রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। কেদারা রাগের কোনো কোনো বিখ্যাত গানের বন্দেশের প্রথমেই কোমল নিষাদের ব্যবহার পাওয়া যায়। "কঙ্গনবা মোরা", "কান্হারে নন্দনন্দন" প্রভৃতি বিখ্যাত খেয়াল গানগুলিতে কোমল নিষাদ, অনুবাদী স্বর রূপেই ব্যবহৃত দেখা যায়। ছায়ানট রাগের বিখ্যাত খেয়াল গান "ঝনন ঝনন বাজে পায়েলিয়া" প্রভৃতি আরো গান পাওয়া যায়, যাতে কোমল নিষাদ স্বরটি অনুবাদীরূপে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কেদারা রাগের সাধারণ স্বরবিস্তারে "প মপ, ধনিধপ, মপধপ ম" এইভাবে কোমল নিষাদের বহুল ব্যবহার, ছায়ানট রাগে "রেগমনিধপ, সাধনিপ" প্রভৃতি কোমল নিষাদযুক্ত স্বরবিন্যাস অত্যধিক থাকে। ভৈরবী রাগে একাধিক বিবাদীস্বর ব্যবহারের রীতি ছিল এবং এই রাগেও বিবাদী স্বরের ব্যবহার বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং বিবাদী স্বরগুলি বর্তমানে ভৈরবী রাগের অনুবাদী স্বরের পর্যায়ে এসে গেছে। বিবাদী শুদ্ধ নিষাদ স্বরের ব্যবহার। যেমন—সা রে গ ম, রেসারে, নিসানিরেসা। বিবাদী তীব্র মধ্যম স্বরের ব্যবহার। যথা—ধ, ম ম গ, সারেসা, অথবা, ধপ, গরেগ, পধনি ম ম গ রেগ সা রে সা।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপরিলিখিত স্বরবিন্যাসে বিবাদী শুদ্ধ ঋষভ স্বরটিরও ব্যবহার দ্রষ্টব্য। এইভাবে ভৈরবী রাগে শুদ্ধ ধৈবৎ ও গান্ধার স্বর দুটিও বিবাদী স্বররূপে নিম্নলিখিতভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন—

প প
পধ নি ধনি ধ ম পধ পধ প়ধ, সা নিধপ, পধপম, গম, গমপনিধপ, মগম,

গরে সা, সানি় সারে, সারে পমগরে সা।

এইভাবে লঘু প্রকৃতির রাগগুলি, যথা পিলু, কাফী, খাম্বাজ প্রভৃতি রাগেও বিবাদীস্বর জনপ্রিয় হয়ে, অনুবাদী স্বরের রূপ প্রাপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে। এই সমস্ত রাগগুলিতে ঠুংরী প্রভৃতি গানই অধিকাংশ গীত হয় এবং ঠুংরী গান সাধারণতঃ লঘু প্রকৃতির গান এবং গানের গায়কীতেও নানা প্রকার স্বরবিন্যাস বৈচিত্র্যের অবকাশ থাকে। এই স্বরবিন্যাস করার সময়ই উপরিলিখিত রাগগুলিতে বিবাদী স্বরের প্রয়োগ অধিক মাত্রায় পাওয়া যায় এবং কালক্রমে সেগুলি রাগের অনুবাদী স্বরের রূপ ধারণ করছে। পিলুতে কোমল ঋষভের ব্যবহার। যেমন—সা গ রে়সা, নি়সারেসা, নি়ধ়প় প্রভৃতি। কাফীরাগে কোমল ধৈবতের বিবাদীরূপ ব্যবহার। যথা— রেগ, মপ, ধনি ধপ, মগম, ধপ, গরে, সা, রেগমগ মপ।

আজকাল ভৈরবীতে, পিলুরাগে, উপরিউক্ত যে বিবাদী স্বরগুলির ব্যবহার দেওয়া হয়েছে, তা ভৈরবী এবং পিলুরাগ গীত হবার সময় প্রায়শই পাওয়া যায় এবং এরূপ স্বরবিন্যাস-বৈচিত্র্য না থাকলে রাগের রূপটি যেন অসম্পূর্ণ মনে হয়। অর্থাৎ বিবাদী স্বরগুলি অনুবাদী স্বরে রূপান্তরিত হচ্ছে বোধ হয়। অবশ্য বিবাদী স্বর সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দক্ষ শিল্পী কুশলতার দ্বারা বিবাদী স্বরের প্রয়োগ করে রাগ-রূপ-সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে থাকেন। কিন্তু এই প্রয়োগ যদি সমুচিত বা রাগোচিত না হয় বা দক্ষতার অভাব থাকে তবে ফল বিপরীত হতে পারে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসকে মুখ্যতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় এবং এই তিন সময়ে শ্রুতিস্বর বিভাজনও একাধিক প্রকারের পাওয়া যায়। এই তিন ভাগকে তিনটি কালে অর্থাৎ প্রাচীন কাল, মধ্য কাল ও আধুনিক কালে বিভক্ত করা হয়েছে। এই তিন কালে যে সমস্ত সঙ্গীত গ্রন্থাদি রচিত হয় এবং তার যে প্রতিবেদন পাওয়া যায়, নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে তার আলোচনা করা হল।

প্রাচীন কাল বলতে শুরু হতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ধরা হয়। এই সময় প্রধানতঃ দুজন প্রধান গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থের রচয়িতা "ভরত" এবং পরবর্তী বিশিষ্ট গ্রন্থকার "সঙ্গীতরত্নাকর" গ্রন্থরচয়িতা "শার্ঙ্গদেব"। বিখ্যাত সঙ্গীত গ্রন্থ ভরতের "নাট্যশাস্ত্র" পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বেই রচিত হয়। শার্ঙ্গদেব তাঁর বিখ্যাত সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচনা করেন। এই গ্রন্থটি ভারতীয় সঙ্গীতের উভয় শাখারই আধার গ্রন্থ এবং আজও কর্ণাটক ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিশেষ বিশেষ তথ্যগুলি এই গ্রন্থটি হতে গৃহীত হয়। ভরত এবং শার্ঙ্গদেব উভয় গ্রন্থকারই সপ্তকের এক নাদস্থানের মধ্যে দ্বাবিংশ শ্রুতির কথা বলেছেন এবং তার স্বর বিভাজনও একই সিদ্ধান্ত অনুসারে করেছেন দেখা যায়। যেমন—

"চতুশ চতুশ চতুশ চৈব ষড়জ মধ্যম পঞ্চমাঃ।
দ্বে দ্বে নিষাদ গান্ধারৌ ত্রিস্ত্রী ঋষভধৈবতৌ ॥

অর্থাৎ ষড়জ, মধ্যম এবং পঞ্চম স্বর তিনটি চার চার চার শ্রুতিযুক্ত। নিষাদ ও গান্ধার দুই দুই শ্রুতিযুক্ত এবং তিন তিন শ্রুতিযুক্ত স্বর ঋষভ ও ধৈবৎ স্বর দুটি। উভয় গ্রন্থেই স্বর শ্রুতির অন্তিম শ্রুতির উপর স্থাপিত বলা আছে। ইহার বিবরণ পূর্বেই বলা হয়েছে। প্রাচীন গ্রন্থ দুটির উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে, উভয় গ্রন্থকারই শ্রুতিগুলি পরস্পর একই দূরত্বপূর্ণ বলেছেন। অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রুতি, প্রথম শ্রুতি হতে যে দূরত্ববিশিষ্ট, তৃতীয় শ্রুতি, দ্বিতীয় শ্রুতি হতেও সেই একই দূরত্ব বিশিষ্ট এবং এইভাবে বাকী সব শ্রুতিগুলিই পরস্পর সমদূরবর্তি। এক নাদস্থানের সপ্তকের শ্রুতিগুলির অন্তর পরস্পর সমান দূরত্ব বিশিষ্ট হওয়ায়, ইহাদের প্রমাণশ্রুত্যন্তর বা প্রমাণ শ্রুতি বলা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী অংশে আরো বিশদভাবে আলোচিত হবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মধ্যকাল বলতে চতুর্দশ শতাব্দী হতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে মানা হয়ে থাকে। এই সময়ে প্রধানতঃ চারজন সঙ্গীত পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটেছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শাস্ত্রকার "লোচন কবি" তাঁর "রাগতরঙ্গিনী" সঙ্গীত গ্রন্থটি রচনা করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বভাগে "অহোবল" পণ্ডিত "সঙ্গীত পারিজাত" নামক সঙ্গীত গ্রন্থটি রচনা করেন এবং এই গ্রন্থেই তিনি সর্বপ্রথম বীণার তারে সপ্তকের সাত শুদ্ধ স্বরের ও পাঁচ বিকৃত স্বরের স্বরস্থান নির্দেশ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর উত্তর ভাগে "হৃদয়-নারায়ণদেব" নামক এক পণ্ডিত সঙ্গীত শাস্ত্রকার "হৃদয় কৌতুক" ও "হৃদয় প্রকাশ" নামক দুটি সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বভাগে পঃ শ্রীনিবাসজীর "রাগতত্ত্ববিবোধ" নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি রচিত হয়। হৃদয় নারায়ণ ও পঃ শ্রীনিবাসজী উভয় গ্রন্থকারই বীণার তারের উপর স্বরসপ্তক স্থাপনের বিবরণ দিয়েছেন এবং এই পদ্ধতি, অহোবল কৃত সঙ্গীত পারিজাত গ্রন্থের পদ্ধতির সাথে মিল পাওয়া যায়।

মধ্যকালীন উপরিউক্ত সব সঙ্গীত শাস্ত্রকারগণই দ্বাবিংশ শ্রুতির অন্তর্গত সাতশুদ্ধ স্বরের বিভাজন প্রাচীন চতুশ্চতুশ্চতুশ চৈব ষড়জ মধ্যম পঞ্চমাঃ,' দ্বে দ্বে গান্ধার, ত্রিস্ত্রি ঋষভ ধৈবতৌ, নিয়মানুসারে ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতানুসারে শুদ্ধ স্বরের সংস্থান শ্রুতির অন্তিম শ্রুতির উপর নির্দেশ করেছেন। শ্রুতির উপর স্বরের সংস্থান সম্বন্ধীয় বিষয়ে মিল থাকলেও প্রাচীন ও মধ্যকালীন পণ্ডিতগণের মধ্যে এক বিশেষ মত পার্থক্য পাওয়া যায় এই যে, প্রাচীন পণ্ডিতগণ শ্রুতিগুলিকে সমদূরবর্তী বলেছেন কিন্তু মধ্যকালীন সঙ্গীত শাস্ত্রকারদের মতে সব শ্রুতিগুলি সমান দূরবর্তী নয়। অর্থাৎ একটি শ্রুতি হতে অন্য শ্রুতির দূরত্বের পার্থক্য আছে।

এজন্য ভরত এবং শার্ঙ্গদেবের গ্রন্থে প্রত্যেক স্বরের স্থান নির্দেশ করার সময়, তারের উপর স্বরস্থানের দূরত্বের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয় নি। তাঁদের মতে শ্রুতিগুলির পরস্পর দূরত্ব যখন সমান, তখন স্বরের অন্তরবর্তী শ্রুতিগুলির সংখ্যা নির্দেশ দ্বারা স্বরস্থানের দূরত্ব অথবা পার্থক্য স্পষ্টতঃ বোঝা যাবে। কিন্তু মধ্যকালীন সঙ্গীত শাস্ত্রকারদের মতে শ্রুতিগুলি অসমান হওয়ায়, বীণার তারের উপর স্বরস্থানের নির্দিষ্ট স্থান সূচিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দী হতে আধুনিক কালের প্রারম্ভ। এই সময় যেসব সঙ্গীত শাস্ত্রকারদের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাম পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে প্রধান সঙ্গীত শাস্ত্রকার পঃ বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজী এবং তাঁর রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে "অভিনব রাগ মঞ্জরী" ও "লক্ষ্যসঙ্গীত" এই দুটি সংস্কৃত-সঙ্গীত-শাস্ত্র। "অভিনব রাগমঞ্জরী" গ্রন্থে মধ্যকালীন সঙ্গীত শাস্ত্রকারদের নীতি অনুযায়ী ভাতখণ্ডেজী আধুনিক দ্বাদশ স্বরস্থানের সংস্থান বীণার তারের উপর দৈর্ঘ্যের সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যেহেতু আধুনিক কালের শুদ্ধ স্বরসপ্তকে গান্ধার ও নিষাদ স্বর দুটির রূপ পরিবর্তিত হয়, সেজন্য স্বরস্থান নির্দেশ করার সময়ও ভাতখণ্ডেজী তারের উপর অন্যান্য স্বরের সাথে আধুনিক গান্ধার ও নিষাদ স্বর দুটির আধুনিক স্বরস্থান নির্ণয় করেছেন। কারণ মধ্যকালীন শুদ্ধ গান্ধার ও শুদ্ধ নিষাদ স্বর দুটি আধুনিক কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদের সমান। অর্থাৎ মধ্যকালীন শুদ্ধ ঠাট আধুনিক কাফী ঠাটের ন্যায় এবং আধুনিক শুদ্ধ ঠাট আধুনিক বিলাবল ঠাটের ন্যায়।

দ্বিতীয় মুখ্য বা প্রধান প্রভেদ দেখা যায় যে 'অভিনব রাগমঞ্জরী' গ্রন্থে ষড়জ মধ্যম ও পঞ্চম চার চার চার শ্রুতিযুক্ত; ঋষভধৈবৎ তিন তিন শ্রুতিযুক্ত এবং গান্ধারনিষাদ স্বর দুটি দুই দুই শ্রুতিযুক্ত থাকলেও, প্রত্যেক স্বরের সংস্থান শ্রুতিগুলির প্রথম শ্রুতির উপর পাওয়া যায়. কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যকালীন স্বর ব্যবস্থায়, স্বর শ্রুতিগুলির শেষ শ্রুতির উপর স্থাপিত ছিল। আধুনিক কালে স্বরের সংস্থান, শ্রুতিগুলির শেষ শ্রুতি হতে প্রথম শ্রুতির উপর স্থান পরিবর্তন হওয়ায়ই, প্রাচীন ও মধ্যকালীন শুদ্ধ স্বরসপ্তক হতে আধুনিককালের শুদ্ধ স্বর সপ্তকের এক বিশেষ পরিবর্তন পাওয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যকালীন সঙ্গীতের রাগগুলির উপরও যে এই প্রভাব পড়েছে, তার বহু নজীর পাওয়া যায়। বিষয়টি অত্যন্ত লক্ষ্য করার মত। তাই ঠিক কোন সময়ে বা কোন সঙ্গীতশাস্ত্রে সর্বপ্রথম এই পরিবর্তন দেখা যায়, তা বিশদ অনুসন্ধান সাপেক্ষ। ভারতীয় রাগ সঙ্গীত এই স্বরসপ্তকের মধ্যেই নিবদ্ধ এবং এই স্বরসপ্তকের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই সমগোত্রীয় স্বরসমন্বিত ভিন্ন প্রকৃতির রাগের রূপ পাওয়া যায়। তাই ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের স্বরস্থানের বৈশিষ্ট্য একান্তভাবে স্বীকৃত। বৈজ্ঞানিক ধারায় তারের উপর স্বরস্থানের পরিমাপের ব্যবস্থা বিশেষ দরকার।

সঙ্গীতের ইতিহাসে মধ্যকাল বলতে চতুর্দশ শতাব্দী হতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ধরা হয়ে থাকে। এই চতুর্দশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে মাত্র তিন চারটি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সংস্কৃত-সঙ্গীত-শাস্ত্র রচিত হয়। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে মুখ্য গ্রন্থ হল পণ্ডিত অহোবল কৃত 'সঙ্গীত পারিজাত' সঙ্গীতশাস্ত্র। 'সঙ্গীত পারিজাত' সঙ্গীত শাস্ত্রেই সর্বপ্রথম বীণার তারের উপর দ্বাদশ শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরস্থানের মাপের হিসাব সুনির্দিষ্ট হয়। পরবর্তীকালে পণ্ডিত শ্রীনিবাস কর্তৃক রচিত "রাগতত্ত্ব-বিবোধ" গ্রন্থেও পণ্ডিত অহোবলের ন্যায় দ্বাদশ স্বরের শুদ্ধ বিকৃত স্বরস্থানের নির্দেশ পাওয়া যায়। পণ্ডিত শ্রীনিবাসজীকৃত "রাগতত্ত্ববিবোধ" গ্রন্থে দ্বাদশ শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের পরিষ্কার ও স্পষ্ট বর্ণনা, বীণার তারের উপর যথাযথ মাপ অনুসারে. নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

"তত্র স্বরবিবোধার্থং স্থানলক্ষণমুচ্যতে।
পূর্ব্বাং ত্যয়োশ্চ মের্বোশ্চ মধ্যে তারকসংস্থিতঃ।
তদর্থে স্বতিতারস্য সস্বরস্য স্থিতির্ভবেত্॥
মধ্যস্থানাদিম ষড়জ মারভ্যাতারষড়জগম্।
সূত্রং কুর্যাত্তদর্ধে তু স্বরং মধ্যমমাচরেৎ॥
ভাগ ত্রয় সমাযুক্তং তৎসূত্রং কারিতং ভবেত্।
পূর্বভাগদ্বয়াদগ্রে স্থাপ নিয়থ পঞ্চমঃ॥
ষড়জপঞ্চমধ্যে তু গান্ধারস্থান মাচরেত্।
ষড়জ পঞ্চমগং সূত্রমংশ ত্রয় সমন্বিতম্॥
তত্রাংশদ্বয়সংত্যাগাৎ পূর্বভাগে তু রি ভবেৎ।
পঞ্চমোত্তর ষড়জাখ্য মধ্যে ধৈবতমাচরেৎ॥
পসয়োর্মধ্য ভাগে স্যাৎ ভাগত্রয় সমান্বিতে।
পূর্বভাগদ্বয়ং ত্যক্ত্বা নিষাদো রাজতে স্বরঃ॥
ভাগত্রয়োদিতে মধ্যে মেরোশ্চর্ষভ সংজ্ঞিতাৎ।
ভাগদ্বয়োত্তরং মেরোঃ কুর্যাৎ কোমলরি স্বরম্॥
মেরুধৈবতয়োর্মধ্যে তীব্রগান্ধার মাচরেৎ।
ভাগত্রয় বিশিষ্টেঅস্মিন্ তীব্রগান্ধার ষড়জয়োঃ॥
পূর্বভাগোত্তরং মধ্যে মং তীব্রতরমাচরেৎ।
ভাগত্রয়ান্বিতে মধ্যে পঞ্চমোত্তর ষড়জয়োঃ॥
কোমলো ধৈবতঃ স্থাপ্যঃ পূর্বভাগে বিবেকিভিঃ।
তথৈব ধসয়োর্মধ্যে ভাগত্রয় সমন্বিতে॥
পূর্বভাগদ্বয়াদূর্ধে নিষাদং তীব্রমাচরেৎ॥

'রাগতত্ত্ববিবোধ'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীনিবাসজীর ততযন্ত্রের তারটির সম্পূর্ণ অংশটি ৩৬" ইঞ্চি ধরা হয় এবং এই তারটিতে ষড়জ স্বরের উৎপত্তি মানা হয়েছে। এই মূল তারটির উপর ছোট ছোট অংশে দ্বাদশটি ভাগ করে দ্বাদশ শুদ্ধ বিকৃত স্বরের স্থাপনা করেছেন। এই অংশগুলির নির্ভুল মাপ শ্রীনিবাসজীর পদ্ধতি অনুসারে নিয়ে নির্ণিত হল।

শ্রীনিবাসজী বলেছেন ততযন্ত্রের মেরু ও ঘুরচের ঠিক মধ্যস্থলে তারষড়্জ স্বরটি অবস্থিত। এর দ্বারা তারষড়্জ স্বরটি ঘুরচ হতে ১৮" ইঞ্চি দূরত্বে অবস্থিত বোঝা যায়। অর্থাৎ ততযন্ত্রের তারের উপর ১৮" ইঞ্চি স্থলটিতে তারষড়্জস্বরটি। কারণ সম্পূর্ণ তারটির দৈর্ঘ্য ৩৬" ইঞ্চি এবং তারষড়্জ স্বরটি সম্পূর্ণ তারের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত, রাগতত্ত্ববিবোধে এরূপ বর্ণিত আছে।

মধ্যম স্বরটির স্থান নির্দেশ করেছেন শ্রীনিবাসজী, মেরু এবং তারষড়্জের মধ্যস্থলে, অর্থাৎ মেরু এবং তারষড়্জের মধ্যে তারের দৈর্ঘ্যের মাপ হল ১৮" ইঞ্চি এবং এর এক একটি ভাগ হল ১৮÷২=৯" ইঞ্চি। অর্থাৎ ঘুরচ হতে মধ্যম স্বরের স্থানটি হবে ১৮+৯=২৭" ইঞ্চি দূরত্বের উপর এবং মধ্যম স্বরের স্থান নির্দিষ্ট হবে, ঠিক ২৭" ইঞ্চির উপর।

নিম্ন চিত্রে একটি ততযন্ত্রের তারের মাপ ৩৬" ইঞ্চি কল্পনা করা হয়েছে এবং এই তারের উপর মেরু হতে ঘুরচের মধ্যে তারষড়্জ ও মধ্যম স্বরের স্থান স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা হল। যেমন—

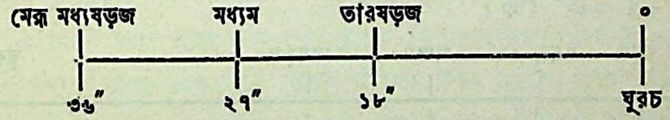

এরপর পঞ্চম স্বরটির স্থাপনা সম্বন্ধে শ্রীনিবাসজী তাঁর রাগতত্ত্ববিবোধ গ্রন্থে এরূপ বলেছেন যে, মেরু এবং তারষড়্জের মধ্যস্থলে যে অংশটি আছে, তাকে সমান তিনভাগে বিভক্ত করার পর মেরু হতে দ্বিতীয় ভাগের শেষে পঞ্চম স্বরটির স্থান নির্দিষ্ট হবে। অর্থাৎ মেরুও তারষড়্জের মধ্যে ১৮" ইঞ্চি অংশ আছে। ইহার তিনটি সমান ভাগের এক একটি অংশ হল ১৮÷৩=৬" ইঞ্চি। দ্বিতীয় ভাগের শেষ অংশটি হল মেরু হতে ১২" ইঞ্চির উপর এবং এই স্থানটি পঞ্চম স্বরের স্থান নির্দিষ্ট হবে অথবা তারষড়্জ হতে বামদিকে ৬" ইঞ্চির উপর স্থানটি। অতএব ঘুরচ হতে পঞ্চম স্বরের দূরত্ব হল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

১৮"+৬"=২৪" ইঞ্চি। প্রত্যেক স্বরস্থানের দূরত্ব ঘুরচ হতে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। কারণ ঘুরচের নিকটই তারটি বাজাবার স্থল এবং নির্দিষ্ট স্থানে তারটিকে আঙ্গুল দ্বারা বা অন্য কিছুর দ্বারা চাপিলে তারের আন্দোলন সেই স্থান হতে ঘুরচের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং নির্দিষ্ট স্বরটি পাওয়া যায়। এবং সেই তারের মাপ হতে স্বরের আন্দোলনও পাওয়া যায়। যেমন—

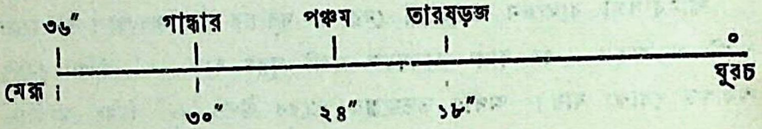

মেরু এবং পঞ্চম স্বরের মধ্যস্থলে গান্ধার স্বরটির স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। মেরু ও পঞ্চম স্বরের মধ্যে স্থলটি ১২" ইঞ্চির এবং তার মধ্যস্থলটি হল ১৬÷২=৮" ইঞ্চির। ইহা পঞ্চমের ৮" ইঞ্চি বামদিকে স্থাপিত। অতএব গান্ধারের দূরত্ব ঘুরচ হতে ২৪"+৬"=৩০" ইঞ্চি।

ঋষভ স্বরের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য মেরু এবং পঞ্চম স্বরের মধ্যভাগকে তিন সমান ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং তার মধ্যে মেরু হতে প্রথম ভাগে ঋষভের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে অর্থাৎ ষড়্জ ও পঞ্চম স্বরের মধ্যভাগ স্থানের দৈর্ঘ্য হল—৩৬"—২৪"=১২" ইঞ্চি। ইহার তিন ভাগের এক একটি ভাগ হল চার ইঞ্চি করে এবং ঋষভের দৈর্ঘ্য হবে মেরু হতে ৪" ইঞ্চি স্থানের উপর। বিপরীত ভাবে ঘুরচ হতে ঋষভের মধ্যস্থলের দৈর্ঘ্য হবে ৩৬"—৪'=৩২" ইঞ্চি।

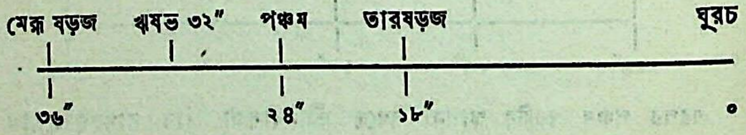

ধৈবৎ স্বরের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীনিবাসজী বলেছেন যে ধৈবৎ, পঞ্চম এবং তারষড়্জ স্বরের মধ্যস্থানে অবস্থিত। এখানে মধ্যস্থান বলতে ঠিক মাঝামাঝি স্থান বোঝায় না। কারণ গাণিতিক হিসাবে ধৈবতের দৈর্ঘ্য ঘুরচ হতে ২১" ইঞ্চি পাওয়া যায়। কিন্তু এই দূরত্ব ঋষভ স্বরের দূরত্বের দৈর্ঘ্য ৩২" ইঞ্চির দেড়গুণ হবে না। পণ্ডিত শ্রীনিবাসজী তাঁর গ্রন্থে একথা স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, সপ্তকের মধ্যে পরস্পর পঞ্চম স্বরটি ষড়্জ-পঞ্চম হিসাবে অবস্থিত হবে, অর্থাৎ পঞ্চম স্বরটি, ষড়্জ স্বরটি হতে দেড়গুণ উঁচুতে স্থাপিত হবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এইভাবে যথাক্রমে নিষাদস্বর, গান্ধারের দেড়গুণ এবং তারষড়জ স্বরটি মধ্যমের দেড়গুণ উচ্চে অবস্থিত হবে। অর্থাৎ ঋষভের পঞ্চম স্বর হবে ধৈবৎ স্বরটি বা দেড়গুণ উচ্চে, গান্ধারের পঞ্চম স্বরটি হবে নিষাদ স্বরটি, এবং মধ্যমের পঞ্চম স্বরটি হবে তারষড়জ। এই স্বরগুলির দূরত্বের তারতম্য হবে দেড়গুণ সম্পন্ন। যেমন, সা-প, রে-ধ, গ-নি এবং ম-র্সা।

ষড়জ পঞ্চম স্বরের পারস্পরিক সম্বন্ধকে ষড়জ-পঞ্চম হিসাবের প্রথা বলা হয়। এর গুণান্তর ৩/২ বা ১১/২ বা দেড়গুণ। ষড়জের আন্দোলন সংখ্যাকে ১১/২ দ্বারা গুণ করলে পঞ্চমের আন্দোলন সংখ্যা পাওয়া যাবে। এইভাবে যদি দেখা যায় যে, পরস্পর দুটি স্বরের গুণান্তর ৩/২ হয়, তবে তাদেরও ষড়জ-পঞ্চম হিসাব বলা যেতে পারে।

তাই ঋষভ স্বরের ৩২" ইঞ্চির দেড়গুণ মাপ হিসাবে ধৈবৎ স্বরের দৈর্ঘ্য ২১" ইঞ্চি হয় না। এজন্য শ্রীনিবাসজীর নির্দেশমত পঞ্চম ও তারষড়জের মধ্যস্থলে ধৈবতের স্থান না হয়ে, "মধ্য" অর্থে ক্ষেত্র মেনে নিয়ে ধৈবতের প্রকৃত স্থান হবে, ষড়জ-পঞ্চম হিসাব অনুযায়ী ঋষভের দৈর্ঘ্যকে ৩/২ দিয়ে ভাগ করলে যে দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে, সেটাই হবে ধৈবৎ স্বরের প্রকৃত স্থান।

অতএব ধৈবতের দৈর্ঘ্য = ঋষভের দৈর্ঘ্য ৩২ ÷ ৩/২ = ৩২ × ২/৩ = ২১১/৩" ইঞ্চি।

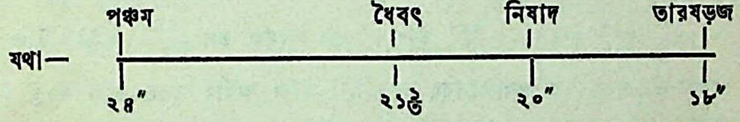

এইভাবে নিষাদ স্বরের স্থান পঞ্চম স্বরের এবং তারষড়জ স্বরের মধ্যস্থলকে তিন সমান ভাগে ভাগ করে দ্বিতীয় ভাগের উপর নির্দেশ দেওয়া আছে। পঞ্চম স্বর ও তারষড়জের মধ্যস্থল ৬" ইঞ্চি দৈর্ঘ্য। ইহার তিনটি সমান ভাগ ২" ইঞ্চি করে প্রতি ভাগটি পাওয়া যায়। অর্থাৎ নিষাদ স্বরের দৈর্ঘ্য হবে = ১৮" + ২" = ২০" ইঞ্চি। যেহেতু পঞ্চম হতে দ্বিতীয় ভাগের অর্থ হল ষড়জের প্রথম ভাগ।

শুদ্ধ স্বর ছাড়া পণ্ডিত শ্রীনিবাসজী পাঁচটি বিকৃত স্বরেরও বীণার তারের উপর স্বরস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। বিকৃতি স্বরগুলির মধ্যে কোমল ঋষভ, কোমলধৈবৎ, তীব্রমধ্যম, তীব্রগান্ধার ও তীব্রনিষাদ প্রভৃতি বিকৃত স্বরগুলি অন্তর্ভুক্ত। গান্ধার ও নিষাদের স্থান কোমলরূপ প্রাপ্ত এবং পূর্বেই তার স্থান নির্দেশ আছে। কারণ প্রাচীন ও মধ্যকালীন শুদ্ধ স্বরসপ্তক বর্তমান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কাফীঠাটের ন্যায় ছিল। তাই বিকৃত স্বরস্থানের মধ্যে তীব্র গান্ধার ও তীব্র নিষাদ স্বর দুটি অর্থাৎ বর্তমান শুদ্ধ গান্ধার ও শুদ্ধ নিষাদ সংযুক্ত হয়েছে। বিকৃত স্বরস্থানগুলি পণ্ডিত শ্রীনিবাসজী নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করেছেন।

কোমল ঋষভ, বীণার তারের উপর ষড়্জ এবং ঋষভ স্বরের মধ্যে পার্থক্য হল $৩৬'' - ৩২'' = ৪''$ ইঞ্চি। এর সমান তিন ভাগের এক একটি ভাগ হল $\frac{৪}{৩}''$ ইঞ্চি অর্থাৎ কোমল ঋষভের দৈর্ঘ্য হবে ঘুরচ হতে ঋষভের দৈর্ঘ্য $\frac{৪}{৩}'' - ৩২ + \frac{৪}{৩} = ৩৩\frac{১}{৩}''$ ইঞ্চি

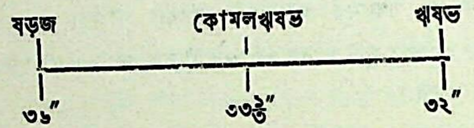

কোমল ধৈবতের দৈর্ঘ্য হবে কোমল ঋষভের দৈর্ঘ্যের দেড়গুণ কম হবে। অর্থাৎ $৩৩\frac{১}{৩} \div \frac{৩}{২} = \frac{১০০}{৩} \times \frac{২}{৩} = \frac{২০০}{৯} = ২২\frac{২}{৯}''$ ইঞ্চি হবে। যে পদ্ধতি অবলম্বনে (ষড়্জ-পঞ্চম হিসাবে) শুদ্ধ ধৈবতের দৈর্ঘ্য শুদ্ধ ঋষভের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়েছিল, ঠিক সেই পদ্ধতি অবলম্বনে কোমল ধৈবতের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা হল।

তীব্রগান্ধারের স্থান হল মেরু অর্থাৎ মধ্য ষড়্জ এবং ধৈবতের ঠিক মধ্যস্থানে অবস্থিত। মেরু বা ষড়্জ এবং শুদ্ধ ধৈবৎ স্বরের মধ্যে দৈর্ঘ্যের পার্থক্য হল $= ৩৬'' \quad ২১\frac{১}{৩}'' = ১৪\frac{২}{৩} = \frac{৪৪}{৩}''$ ইঞ্চি। এর অর্ধেক হল $\frac{৪৪''}{৩ \times ২} = \frac{২২}{৩}''$ ইঞ্চি। এজন্য তীব্রগান্ধারের দৈর্ঘ্য ধৈবৎ হতে $\frac{২২}{৩}''$ ইঞ্চি অর্থাৎ ঘুরচ হতে $২১\frac{১}{৩}'' + \frac{২২}{৩}'' = ২১\frac{১}{৩}'' + ৭\frac{১}{৩}'' = ২৮\frac{২}{৩}''$ ইঞ্চি হবে।

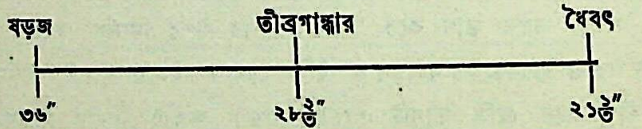

তীব্রনিষাদের স্থান ধৈবৎ এবং তারষড়্জের মধ্যস্থলকে সমান তিন ভাগে বিভক্ত করে দ্বিতীয় ভাগের উপর মাপা হয়েছে অর্থাৎ তারষড়্জ এবং ধৈবতের মধ্যে পার্থক্য হল $২১\frac{১}{৩}'' - ১৮'' = ৩\frac{১}{৩}'' = \frac{১০}{৩}''$ ইঞ্চি। এজন্য তীব্র নিষাদের স্থান হল ঘুরচ হতে $১৮'' \quad \frac{১০}{৯}'' = ১৮'' + ১\frac{১}{৯}'' = ১৯\frac{১}{৯}$ ইঞ্চি দূরে হবে।

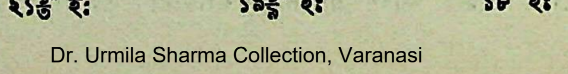

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তীব্রমধ্যমের স্থান, তীব্রগান্ধার এবং তার ষড়জের মধ্যস্থলকে তিন সমান ভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগের উপর তীব্রতর মধ্যমের স্থান মানা হয়েছে। তীব্রগান্ধার এবং তারষড়জের মধ্যে পার্থক্য হল ২৮$\frac{১}{৩}$"−১৮"=১০$\frac{১}{৩}$−$\frac{৩২}{৩}$" ইঞ্চি। ইহার তিন সমান ভাগ হল $\frac{৩২}{৩}$×$\frac{১}{৩}$=$\frac{৩২}{৯}$" ইঞ্চি। অতএব তীব্রতর মধ্যমের স্থান হবে ঘুরচ হতে ১৮"+$\frac{৩২}{৯}$"+$\frac{৩২}{৯}$"=১৮+$\frac{৬৪}{৯}$=১৮+৭$\frac{১}{৯}$=২৫$\frac{১}{৯}$" ইঞ্চি দূরে হবে।

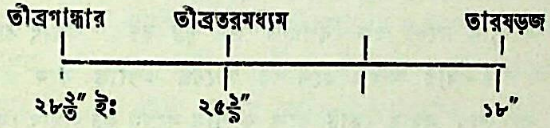

উপরিউক্তভাবে শ্রীনিবাসজী বীণার তারের উপর তৎকালীন বা মধ্যকালীন প্রচলিত বারটি স্বরের দৈর্ঘ্য ও স্থান নির্দেশ করে গেছেন। নিম্নে শুদ্ধ এবং বিকৃত স্বরগুলির দৈর্ঘ্যের পৃথক পৃথক তালিকা দেওয়া হল।

শ্রীনিবাসজীর নির্দেশিত স্বরের দৈর্ঘ্য

শুদ্ধ স্বর—		বিকৃত স্বর —	
(১) ষড়জ—৩৬"	ইঞ্চি	(১) কোমল ঋষভ—৩৩$\frac{১}{৩}$"	ইঞ্চি
(২) ঋষভ –৩ "	„	২) কোমল ধৈবৎ– ২২$\frac{২}{৯}$"	„
(৩) গান্ধার—৩০"	„	(৩) তীব্রতর মধ্যম—২৫$\frac{১}{৯}$"	„
(৪) মধ্যম –২৭" .	„	(৪) তীব্রগান্ধার—২৮$\frac{১}{৩}$"	„
(৫) পঞ্চম ২৪"	„	(৫) তীব্রনিষাদ—১৯$\frac{১}{৯}$"	„
(৬) ধৈবৎ—২১$\frac{১}{৩}$"	„		
(৭ নিষাদ—২০"	„		
(৮) তারষড়জ—১৮"	„		

তারের দৈর্ঘ্য হতে তারের আন্দোলন সংখ্যা বা "কম্পাঙ্ক" বার করা যায়। পণ্ডিত শ্রীনিবাসজী প্রদত্ত বারটি স্বরের দৈর্ঘ্য হতে সুরের "কম্পাঙ্ক" নির্দ্ধারণ পদ্ধতি প্রদত্ত হল।

ততযন্ত্রের তারের উপর আঘাত করলে বা বাজালে স্বরে বাঁধা তারগুলিতে আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং এই আন্দোলনের ফলেই নাদের উৎপত্তি হয়। তারের এরূপ আন্দোলন প্রস্থের দিকে যতই বিস্তৃত হয়, নাদ ততই বড় হয়। আর তারের আন্দোলন যতই কম প্রস্থের দিকে বিস্তৃত হয়, নাদ ততই ছোট

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয়। আবার নাদের "কম্পাঙ্ক" বা আন্দোলন সংখ্যা যতই কম হয় স্বরের উচ্চতাও ততই কম এবং নাদের আন্দোলন সংখ্যা বা "কম্পাঙ্ক" যতবেশী স্বরের উচ্চতা ততই বেশী দেখা যায়।

তারের দৈর্ঘ্যের উপর নাদের উঁচুনীচু ভাব বিশেষভাবে নির্ভরশীল থাকে। তারে দৈর্ঘ্য যত কম হবে, নাদ বা স্বর ততই উঁচু দেখা যায় এবং তারের দৈর্ঘ্য বেশী হলে নাদ বা স্বর নীচু হয়। এইভাবে তারের দৈর্ঘ্য ও তারের আন্দোলন সংখ্যার মধ্যে এক বিপরীত ফল দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ তারের দৈর্ঘ্য বেশী হলে বা তার লম্বায় অধিক হলে পর তারের কম্পাঙ্ক কমে এবং তারের দৈর্ঘ্য কম বা তার লম্বায় ছোট হলে কম্পাঙ্ক সংখ্যা বড় অর্থাৎ বেশী পাওয়া যায়।

দুটি স্বরের তারের দৈর্ঘ্যের বা কম্পাঙ্কের ভাগফলকে তাদের পরস্পর গুণান্তর বা স্বরান্তর বলা হয়। ষড়জ স্বরের তারের দৈর্ঘ্য যদি ৩৬" ইঞ্চি হয় বা কম্পাঙ্ক যদি ২৪০ হয় এবং পঞ্চম স্বরের তারের দৈর্ঘ্য ২৪" ইঞ্চি বা কম্পাঙ্ক ৩৫০ হয়, তবে ষড়জ এবং পঞ্চম স্বরের মধ্যে স্বরান্তরের বড় সংখ্যা দুটি ভেঙ্গে যে ছোট সংখ্যাটি বার হবে তাহাই হবে ষড়জ পঞ্চম স্বরের গুণান্তর। যেমন—ষড়জের তারের দৈর্ঘ্য ৩৬" ইঞ্চি এবং পঞ্চম স্বরের তারের দৈর্ঘ্য=২৪"

অতএব ষড়জ পঞ্চম স্বরের দৈর্ঘ্যের গুণান্তর = $\frac{৩৬}{২৪} = \frac{৩}{২}$"

ষড়জের কম্পাঙ্ক = ২৪০ কম্পাঙ্ক এবং পঞ্চম স্বরের কম্পাঙ্ক = ৩৫০ কম্পাঙ্ক

অতএব ষড়জ পঞ্চম স্বরের কম্পাঙ্কের গুণান্তর = $\frac{৩৬০}{২৪০} = \frac{৩}{২}$

অর্থাৎ দৈর্ঘ্যের বা কম্পাঙ্কের উভয়ের গুণান্তরই = $\frac{৩}{২}$ বা ১$\frac{১}{২}$।

ষড়জ স্বরের কম্পাঙ্ক ২৪০ ধরা হয়। পিয়ানোর মধ্যসপ্তকের "C" নোটটিকে অর্থাৎ পিয়ানোর মধ্য সপ্তকের "C" স্বরটি হতে ২৪০ কম্পাঙ্ক পাওয়া যায়।

এইভাবে ততযন্ত্রের তারের উপর তার ষড়জ ও মধ্য ষড়জ স্বরের দৈর্ঘ্য বা কম্পাঙ্কের দ্বারা এই দুই স্বরের পরস্পর গুণান্তর পাওয়া যায়। যেমন মধ্যষড়জের তারের দৈর্ঘ্য=৩৬" ইঞ্চি এবং তার ষড়জের তারের দৈর্ঘ্য=১৮" ইঞ্চি। অতএব মধ্য এবং তার ষড়জের গুণান্তর সমান $\frac{৩৬}{১৮} = \frac{২}{১}$। অর্থাৎ তার ষড়জ ও মধ্যষড়জ স্বরটির পরস্পর গুণান্তর হবে দ্বিগুণ বা তার ষড়জ মধ্য ষড়জের দ্বিগুণ উঁচু বলা হবে এবং ষড়জ পঞ্চম হিসাবের গুণান্তর বা স্বরান্তর হল দেড়গুণ = ১$\frac{১}{২}$।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কোনো স্বরের গুণান্তর বা সুরান্তর বার করতে হলে ষড়জস্বরের তারের দৈর্ঘ্য বা কম্পাঙ্কের বামে নির্দিষ্ট স্বরটি তারের দৈর্ঘ্য বা কম্পাঙ্ক ভাগ দিতে হয়।

কোনো স্বরের তারের দৈর্ঘ্যের সাহায্যে পরস্পর স্বরের গুণান্তর নির্ণয় করতে সাধারণতঃ ষড়জ স্বরটির দৈর্ঘ্যের সাথে গুণান্তর ধরা হয় এবং স্বরের দৈর্ঘ্যের বড় সংখ্যাটি উপরে লিখিত হয় এবং ছোট সংখ্যাটি নিয়ে থাকে। কিন্তু স্বরের কম্পাঙ্কের দ্বারা পরস্পর স্বরের গুণান্তর নির্ণয় করতে হলে সাধারণতঃ ষড়জ স্বরের কম্পাঙ্কের সংখ্য ধরা হয় এবং উভয় কম্পাঙ্কের মধ্যে বড় সংখ্যাটি সর্বসময়ে উপরে স্থাপিত হয় এবং ছোট সংখ্যাটি নিম্নে থাকে। ষড়জের তারের দৈর্ঘ্য ৩৬" ইঞ্চি মানা হয় এবং ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি স্বরের তারের দৈর্ঘ্য ষড়জস্বরটি হতে কম পাওয়া যায়। ফলে ষড়জ স্বরের তারের দের্ঘ্যটি সর্বসময়ে উপরে থাকে। কিন্তু স্বরের কম্পাঙ্কের সাহায্যে স্বরের গুণান্তর নির্ণয় করতে হলে পর ষড়জের কম্পাঙ্ক সর্বসময়ে নিম্নে বসে ও অন্য স্বরের কম্পাঙ্ক উপরে লিখিত হয়। কারণ সাধারণতঃ ষড়জের কম্পাঙ্ক ২৪০ এবং অন্য স্বরগুলি অর্থাৎ ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি প্রতিটি স্বরের কম্পাঙ্ক ষড়জ স্বরটি হতে অধিক পাওয়া যায়।

আবার পঞ্চম ও তার ষড়জ স্বর দুটির মধ্যে গুণান্তর বার করতে হলে যদি তারের দৈর্ঘ্যের সাহায্যে করা হয়, তবে তারের দৈর্ঘ্যের বড় সংখ্যাটি অর্থাৎ তার ষড়জ স্বরটির তারের দৈর্ঘ্যফলটি নিম্নে এবং পঞ্চম স্বরটির তারের দৈর্ঘ্যফল উপরে বসবে। কারণ বড় সংখ্যাটি সর্বদা উপরে থাকবে। যথা—

$$\frac{\text{পঞ্চম স্বরের তারের দৈর্ঘ্য} = ২৪''}{\text{তার ষড়জ স্বরের তারের দৈর্ঘ্য} = ১৮''} = \frac{৪}{৩} \text{ গুণান্তর।}$$

কিন্তু স্বরের কম্পাঙ্কের সাহায্যে পরস্পর গুণান্তর নির্ণয় করতে হলে তার ষড়জের স্বরের কম্পাঙ্ক উপরে এবং পঞ্চম স্বরের কম্পাঙ্ক নিম্নে বসে। যথা —

$$\frac{\text{তার ষড়জ স্বরের কম্পাঙ্কের সংখ্যা} = ৪৮০}{\text{পঞ্চম স্বরের কম্পাঙ্কের সংখ্যা} = ৩৬০} = \frac{৪}{৩} \text{ গুণান্তর।}$$

অর্থাৎ গুণান্তর নির্ণয় করার সময় তারের দৈর্ঘ্যের বড় সংখ্যাটি উপরে এবং ছোট সংখ্যাটি নীচে বা স্বরের বড় কম্পাঙ্ক ফলটি উপরে এবং ছোট কম্পাঙ্কটি নীচে স্থাপিত হয়।

উপরি উক্ত পদ্ধতিতে যদি কোন স্বরের তারের দৈর্ঘ্য পাওয়া যায় তবে তার কম্পন সংখ্যা বা কম্পাঙ্কও সহজেই নির্ণয় করা যায়। আবার কোন স্বরের কম্পাঙ্ক পাওয়া গেলে উপরিউক্ত প্রথায় সেই স্বরের তারের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতি সহজ। এই নির্ণয় সাধারণতঃ গুণান্তরের সাহায্যেই সহজ হয়। যেমন— পঞ্চম স্বরের তারের দৈর্ঘ্য যদি ২৪″ হয় তবে তার কম্পাঙ্ক কত হবে?

পঞ্চম স্বরটির কম্পাঙ্ক নির্ণয় করতে হলে ষড়জ স্বরটি তারের দৈর্ঘ্য ও পঞ্চম স্বরের তারের দৈর্ঘ্যের গুণান্তর নির্ণয় $\frac{৩৬}{২৪}$″ = $\frac{৩}{২}$।

ষড়জ স্বরের কম্পাঙ্ক = ২৪০ × $\frac{৩}{২}$ = ৩৬০ কম্পাঙ্ক পঞ্চম স্বরের।

বিপরীতভাবে, পঞ্চম স্বরের কম্পাঙ্ক = ৩৬০। তাহলে পঞ্চম স্বরের তারের দৈর্ঘ্য নির্ণয় পদ্ধতি?

পঞ্চম স্বরের তারের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হলে, ষড়জ স্বরের ও পঞ্চম স্বরের মধ্যে কম্পাঙ্কের গুণান্তর = $\frac{৩৬০}{২৪০}$ = $\frac{৩}{২}$।

ষড়জ স্বরের তারের দৈর্ঘ্য = ৩৬ ÷ $\frac{৩}{২}$ = ৩৬ × $\frac{২}{৩}$ = ২৪″ ইঞ্চি পঞ্চম স্বরের দৈর্ঘ্য।

যদি একটি স্বরের কম্পাঙ্ক দেওয়া থাকে, তাহলে সেই স্বরের দৈর্ঘ্য অনায়াসেই নির্ণয় করা যায়। প্রথমে স্বর দুটির কম্পাঙ্ককে ভাগ করে গুণান্তর বার করতে হয় এবং সেই গুণান্তর দিয়া ষড়জ স্বরের দৈর্ঘ্য ৩৬″ ইঞ্চির সাথে ভাগ দিলে নির্দিষ্ট স্বরের দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়। হিসাব করার সময় ষড়জ স্বরের কম্পাঙ্ক = ২৪০ এবং ষড়জ স্বরের তারের দৈর্ঘ্য সর্ব সময়ে ৩৬″ ধরা হয়ে থাকে। উদাহরণার্থ—যদি ষড়জ স্বরের তারের দৈর্ঘ্য = ৩৬″ ইঞ্চি হয় এবং এর কম্পাঙ্ক ২৪০ হয়, আর যদি মধ্যম স্বরের কম্পাঙ্ক ৩২০ দেওয়া থাকে। তবে মধ্যম স্বরের তারের দৈর্ঘ্যর মাপ নিম্নলিখিত গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত হবে।

$$\text{মধ্যমস্বরের গুণান্তর} = \frac{\text{মধ্যমস্বরের কম্পাঙ্ক}}{\text{ষড়জস্বরের কম্পাঙ্ক}} = \frac{৩২০}{২৪০} = \frac{৪}{৩}।$$

অতএব মধ্যমস্বরের তারের দৈর্ঘ্য = ষড়জস্বরের তারের দৈর্ঘ্য ÷ $\frac{৪}{৩}$

= ৩৬″ × $\frac{৩}{৪}$ = ২৭″ ইঞ্চি।

পাশ্চাত্য দেশের পিয়ানোর Key Board এর মধ্য সপ্তকের " " স্বরটি ২৪০ কম্পাঙ্ক সম্পন্ন বলা হয়। যদি ও বর্তমানে সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা এই মতের কিছু ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। কারণ "C" স্বরটি একাধিক পিচের (Pitch) হয়। এখানে হিসাবের সুবিধার জন্য ২৪০ কম্পাঙ্কের "C" স্বরটির পিচ্ গ্রহণ করা হয়েছে, এবং এই স্বরটিই মধ্য ষড়জ স্বর ধরা হয়েছে। অর্থাৎ স্বরের কম্পাঙ্ক বা স্বরের তারের দৈর্ঘ্য যদি নির্ণয় করতে হয় তবে ষড়জ স্বরের তারের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দৈর্ঘ্য=৩৬ ইঞ্চি এবং ষড়জ স্বরের কম্পাঙ্ক=২৪০, এই অনুমোদিত হিসাবের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

যেমন একটি স্বরের কম্পাঙ্ক=৩০০ হলে সেই স্বরের তারের দৈর্ঘ্য। যে স্বরের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে তার গুণান্তর - $\frac{৩০০}{২৪০}=\frac{৫}{৪}$। এবার প্রয়োজনীয় স্বরটির তারের দৈর্ঘ্য ষড়জস্বরের দৈর্ঘ্য $\div \frac{৫}{৪}=৩৬ \div \frac{৫}{৪}=৩৬\times\frac{৪}{৫}=\frac{১৪৪}{৫}=২৮\frac{৪}{৫}$" ইঞ্চি।

যদি দুটি স্বরের তারের দৈর্ঘ্য এবং উহার মধ্যে একটি কম্পাঙ্ক দেওয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় স্বরটি কম্পাঙ্ক নির্ণয় করতে হলেও প্রথমে উহার গুণান্তর নির্ণয় করতে হবে এবং সেই গুণান্তর দ্বারা স্বরের প্রদত্ত কম্পাঙ্ককে গুণ করলে দ্বিতীয় স্বরটির কম্পাঙ্ক পাওয়া যাবে। যেমন—

প্রশ্ন :—যদি নিষাদ স্বরের দৈর্ঘ্য ১৯$\frac{১}{৫}$" হয়, তবে উহার কম্পাঙ্ক কত?

উত্তর—ষড়জ স্বরের তারের দৈর্ঘ্য =৩৬" ইঞ্চি এবং ষড়জের কম্পনসংখ্যা ২৪০ কম্পাঙ্ক।

অতএব নিষাদের গুণান্তর $=\frac{৩৬}{১৯\frac{১}{৫}}=\frac{৩৬}{\frac{৯৬}{৫}}=\frac{৩৬\times৫}{৯৬}=\frac{১৫}{৮}$

নিষাদের আন্দোলন সংখ্যা বা কম্পাঙ্ক$=২৪০\times\frac{১৫}{৮}=৪৫০$ কম্পাঙ্ক;

(যদি কোনো স্বরের গুণান্তর দেওয়া থাকে, তাহলে ষড়জ স্বরের কম্পাঙ্ক ২৪০কে তার সঙ্গে গুণ করলে সেই স্বরের কম্পাঙ্ক পাওয়া যায়।)

ষড়জ স্বরের তারের দৈর্ঘ্য ৩৬" ইঞ্চি হলে, ওই স্বরের কম্পাঙ্ক কত? বর্তমানে পিয়ানোর মধ্যসপ্তকের "C"কে মধ্যষড়জ মানা হয় এবং এর কম্পাঙ্ক ২৪০ ধরা হয়। যেহেতু "C" স্বরটি একাধিক "পিচে"র পাওয়া যায়, তাই "C" স্বরের কম্পাঙ্কেরও পার্থক্য জানা যায়। কিন্তু মোটামুটিভাবে "C" স্বরটি ২৪০ কম্পাঙ্কের ধরা হয়ে থাকে এবং এই হিসাবের অনুপাতেই অন্যান্য স্বরগুলির কম্পাঙ্ক নির্ধারিত হয়।

ঋষভ স্বরের তারের দৈর্ঘ্য ৩২" ইঞ্চি হলে, ওই স্বরের কম্পাঙ্ক কত? ষড়জ ও ঋষভের স্বরের মধ্যে গুণান্তর$=\frac{৩৬}{৩২}=\frac{৯}{৮}$।

$\therefore$ ঋষভ স্বরের কম্পাঙ্ক=ষড়জের কম্পাঙ্ক$\times\frac{৯}{৮}=২৪০\times\frac{৯}{৮}=২৭০$ কম্পাঙ্ক।

গান্ধার স্বরের তারের দৈর্ঘ্য ৩০" ইঞ্চি হলে, ওই স্বরের কম্পাঙ্ক কত? ষড়জ ও গান্ধারের স্বরের মধ্যে গুণান্তর $=\frac{৩৬}{৩০}=\frac{৬}{৫}$।

$\therefore$ গান্ধার স্বরের কম্পাঙ্ক=ষড়জের কম্পাঙ্ক$\times\frac{৬}{৫}=২৪০\times\frac{৬}{৫}=২৮৮$ কম্পাঙ্ক।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মধ্যম স্বরের তারের দৈর্ঘ্য ২৭" ইঞ্চি হলে, ওই স্বরের কম্পাঙ্ক কত? ষড়জ ও মধ্যম স্বরের মধ্যে গুণান্তর $= \frac{৩৬}{২৭} = \frac{৪}{৩}$।

∴ মধ্যম স্বরের কম্পাঙ্ক = ষড়জের কম্পাঙ্ক $\times \frac{৪}{৩} = ২৪০ \times \frac{৪}{৩} = ৩২০$ কম্পাঙ্ক।

পঞ্চম স্বরের তারের দৈর্ঘ্য ২৪" ইঞ্চি হলে, ওই স্বরের কম্পাঙ্ক কত? ষড়জ এবং পঞ্চম স্বরের মধ্যে গুণান্তর $= \frac{৩৬}{২৪} = \frac{৩}{২}$।

∴ পঞ্চম স্বরের কম্পাঙ্ক = ষড়জের কম্পাঙ্ক $\times \frac{৩}{২} = ২৪০ \times \frac{৩}{২} = ৩৬০$ কম্পাঙ্ক।

ধৈবৎ স্বরের তারের দৈর্ঘ্য ২১$\frac{১}{৩}$" ইঞ্চি হলে, ওই স্বরের কম্পাঙ্ক কত?

ষড়জ এবং ধৈবৎ স্বরের মধ্যে গুণান্তর $= \frac{৩৬}{২১\frac{১}{৩}} = \frac{৩৬}{\frac{৬৪}{৩}} = ৩৬ \times \frac{৩}{৬৪} = \frac{২৭}{১৬}$।

∴ ধৈবত স্বরের কম্পাঙ্ক ষড়জের কম্পাঙ্ক $\times \frac{২৭}{১৬} = ২৪০ \times \frac{২৭}{১৬} = ৪০৫$ কম্পাঙ্ক।

নিষাদ স্বরের তারের দৈর্ঘ্য যদি ২০" ইঞ্চি হয়, তবে ওই স্বরের কম্পাঙ্ক কত? ষড়জ এবং নিষাদ স্বরের গুণান্তর $= \frac{৩৬}{২০} = \frac{৯}{৫}$।

∴ নিষাদ স্বরের কম্পাঙ্ক = ষড়জের কম্পাঙ্ক $\times \frac{৯}{৫} = ২৪০ \times \frac{৯}{৫} = ৪৩২$ কম্পাঙ্ক।

উপরে সাতশুদ্ধ স্বরের তারের দৈর্ঘ্য হতে কম্পাঙ্ক নির্ণয় করার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হল। ঠিক এই পদ্ধতি অবলম্বনেই বাকী পাঁচটি বিকৃত স্বরের তারের দৈর্ঘ্য হতেও সহজে তাদের কম্পাঙ্ক নির্ণয় করা যায়।

আধুনিক কালের শুদ্ধ স্বরসপ্তকের সঙ্গে, প্রাচীন ও মধ্যকালীন স্বরসপ্তকের মধ্যে কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয়। প্রাচীন ও মধ্যকালীন শুদ্ধ স্বরসপ্তকের গান্ধার ও নিষাদ স্বরদুটি বর্তমান কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদের সমান পাওয়া যায়। স্বর্গীয় পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজী তাঁর "অভিনব রাগমঞ্জরী" গ্রন্থে পণ্ডিত শ্রীনিবাসজী কৃত শুদ্ধ স্বরসপ্তকের গান্ধার ও নিষাদ স্বরদুটির তাদের দৈর্ঘ্য আধুনিক কালের কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদের স্বরদুটির তারের দৈর্ঘ্যের সমান এবং শ্রীনিবাসজীর তীব্রগান্ধার ও তীব্রনিষাদ স্বরদুটির তারের দৈর্ঘ্য আধুনিক কালের শুদ্ধ গান্ধার ও শুদ্ধ নিষাদ স্বরদুটির তাদের দৈর্ঘ্যের সমান বলেছেন।

শ্রীনিবাসজীর গ্রন্থের নির্দেশ ও পরিমাপ হিসেবে ততযন্ত্রের তারে যদি শুদ্ধ স্বরসপ্তক রচনা করা যায়, তাহলে সেই শুদ্ধ স্বরসপ্তকের সঙ্গে বর্তমান কাফীঠাটের স্বরসপ্তকের সাদৃশ্য পাওয়া যাবে। কারণ আধুনিক কাফীঠাটের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বরসপ্তকে গান্ধার ও নিষাদ স্বরদুটি কোমল রূপ প্রাপ্ত দেখা যায়। কারণ প্রাচীন বা মধ্যকালীন শুদ্ধ গান্ধার ও শুদ্ধ নিষাদ স্বরদুটি, বর্তমান কোমল গান্ধার ও কোমল নিষাদ স্বরদুটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু বর্তমান শুদ্ধ স্বরসপ্তকে গান্ধার ও নিষাদ স্বরদুটি শ্রীনিবাসজীর পদ্ধতি অনুসারে তীব্ররূপ প্রাপ্ত বলা যায় বা আধুনিক শুদ্ধ গান্ধার ও শুদ্ধ নিষাদের সমান। এরূপ শুদ্ধ স্বরসপ্তক বর্তমান বিলাবল ঠাটের সমান। এই শুদ্ধ স্বরসপ্তক বৈদেশিক সঙ্গীতের প্রভাবেই ঘটেছে এরূপ অনুমান করা হয়। কারণ আরব এবং পারস্য দেশের সঙ্গীতে এবং বর্তমান ইউরোপীয় সঙ্গীতের শুদ্ধ স্বরসপ্তক বা Scale এ আধুনিক বিলাবল ঠাটের সঙ্গে বিশেষ মিল পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের আদি শুদ্ধ স্বরসপ্তক বর্তমান বিলাবল ঠাটের অনুরূপ ছিল না।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী, পণ্ডিত শ্রীনিবাসজীর পদ্ধতি অবলম্বনে আধুনিক দ্বাদশ শুদ্ধ স্বরের স্বরস্থান ততযন্ত্রের তারের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু গান্ধার ও নিষাদ স্বর দুটির ক্ষেত্রে আধুনিক শুদ্ধ গান্ধার ও শুদ্ধ নিষাদ স্বর দুটির দৈর্ঘ্যের পরিমাপ দিয়েছেন। কারণ আধুনিক শুদ্ধ স্বরসপ্তকে এই স্বর দুটি প্রাচীন বা মধ্যকালীন তীব্র গান্ধার ও তীব্র নিষাদের সমান।

অভিনব রাগমঞ্জরী গ্রন্থে শুদ্ধ স্বরের দৈর্ঘ্যের পরিমাপ নিম্নে প্রদর্শিত হল।

ষড়জ = ৩৬" ইঞ্চি
ঋষভ = ৩২" „
গান্ধার = ২৮$\frac{৮}{৯}$" „
মধ্যম = ২৭" „
পঞ্চম = ২৪" „
ধৈবৎ = ২১$\frac{৩}{৪}$" „
নিষাদ = ১৯$\frac{৭}{৯}$" „
তারষড়জ = ১৮" „

বিকৃত স্বরগুলির মধ্যে "অভিনব রাগমঞ্জরী গ্রন্থে", কোমল গান্ধার ও কোমলনিষাদ স্বরের দৈর্ঘ্য শ্রীনিবাসজীর "রাগতত্ত্ববিবোধ" গ্রন্থের শুদ্ধ গান্ধার ও শুদ্ধনিষাদ স্বরদুটির দৈর্ঘ্যের সমান পরিমাপ দিয়েছেন। কোমল ঋষভ, কোমল ধৈবৎ ও তীব্রমধ্যমের স্থানও পরিবর্তিত হয়েছে। কোমল ঋষভের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্থান ষড়জ ও শুদ্ধ ঋষভের ঠিক মাঝামাঝি স্থলে অবস্থিত এবং কোমল ধৈবৎ স্বরটির সংস্থান কোমল ঋষভের ঠিক পঞ্চম স্বর হিসেবে নির্দিষ্ট হয়েছে। এইভাবে কোমল ঋষভের দৈর্ঘ্য হল ৩৪" ইঞ্চি এবং কোমল ধৈবৎ স্বরটির দৈর্ঘ্য পাওয়া যায় ২২$\frac{২}{৩}$" ইঞ্চি। শুদ্ধ মধ্যম এবং পঞ্চম স্বরটির ঠিক মধ্যস্থলে তীব্রমধ্যম স্বর স্থাপিত হয়েছে। অতএব তীব্রমধ্যমের দৈর্ঘ্য পাওয়া যায় ২৫$\frac{১}{২}$" ইঞ্চি। মঞ্জরীকারের উপরিলিখিত দৈর্ঘ্যানুসারে তার আন্দোলন সংখ্যাও নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হতে মধ্যকালীন পণ্ডিত শ্রীনিবাসজীর স্বরাবস্থানগুলি এবং আধুনিক মঞ্জরীকার কৃত স্বরাবস্থানের দৈর্ঘ্য এবং আন্দোলন সংখ্যা সমন্বয়ে তুলনামূলক দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হল। শেষের ভাগে ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বরসপ্তকের দ্বাদশ স্বরের আন্দোলন সংখ্যাও তুলনার্থে দেওয়া হল।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

মধ্যকালীন, আধুনিক ও পাশ্চাত্য স্বরসমূহের তুলনা

স্বরের নাম		তারের দৈর্ঘ্য	আন্দোলন সংখ্যা বা কম্পাঙ্ক	তারের দৈর্ঘ্য	আন্দোলন সংখ্যা বা কম্পাঙ্ক	আন্দোলন সংখ্যা বা কম্পাঙ্ক
		শ্রীনিবাসের স্বরসমূহ		মঞ্জরীকারের স্বরসমূহ		পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বরসমূহ
	সা	৩৬" ইঞ্চি	২৪০	৩৬" ইঞ্চি	২৪০	২৪০
শুদ্ধ	রে	৩২" „	২৭০	৩২" „	২৭০	২৭০
„	গ	৩০" „	২৮৮	২৮ ২/৩" „	৩০১ ১৭/৪৩	৩০০
„	ম	২৭" „	৩২০	২৭" „	৩২০	৩২০
	প	২৪" „	৩৬০	২৪" „	৩৬০	৩৬০
„	ধ	২১ ১/৩" „	৪০৫	২১ ১/৩" „	৪০৫	৪০০
„	নি	২০" „	৪৩২	১৯ ১/৯" „	৪৫২ ৪/৪৩	৪৫০
তার	সাঁ	১৮" „	৪৮০	১৮" „	৪৮০	৪৮০
কোমল	<u>রে</u>	৩৩ ১/২" „	২৫৯ ১/৫	৩৪" „	২৫৪ ২/১৭	২৫৬
„	<u>ধ</u>	২২ ২/৯" „	৩৩৮ ৪/৫	২২ ২/৩" „	৩৮১ ৩/১৭	৩৮৪
বিকৃত	ম	(তীব্রতর) ২৫ ১/৯" „	৩৪৪ ৮/১৪৩	২৫ ১/২" „ (তীব্র)	৩৩৮ ১৪/১৭	৩৩৭ ১/২
„	গ	(তীব্র) ২৮ ২/৩" „	৩০১ ১৭/৪৩	৩০" „ (কোমল)	২৮৮	২৮৮
„	নি	(তীব্র) ১৯ ১/৯" „	৪৫২ ৪/৪৩	২০" „ (কোমল)	৪৩২	৪৩২

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri
Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই তালিকা চিত্র হতে দুটি মুখ্য বিষয় স্পষ্টতঃ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ মধ্যকালীন তথা পঞ্চদশ হতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময় উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে যে শুদ্ধ ঠাট বা স্বরসপ্তক ব্যবহৃত হত তা বর্তমান কাফীঠাটের সমান। কারণ মধ্যকালীন শুদ্ধ স্বরসপ্তকে গান্ধার ও নিষাদ শুদ্ধ স্বর দুটি বর্তগান কালের কোমল গান্ধার ও কেমল নিষাদের রূপ প্রাপ্ত। দ্বিতীয়তঃ হল ভারতীয় স্বরসমষ্টির সঙ্গে পাশ্চাত্য স্বর সমষ্টির মধ্যে কতটা সাম্য জানা যায় এবং এগুলি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পর সরল গুণান্তর আধারের উপর রচিত। শুদ্ধ বিকৃত মিলে বর্তমান বা আধুনিক স্বরসপ্তকেও মোট দ্বাদশ স্বর পাওয়া যায়।

ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরসপ্তকে যেরূপ ষড়জপঞ্চম হিসাব বিশেষভাবে মানা হয়ে থাকে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতে সর্বক্ষেত্রে তা মানা হয় না। যেমন—ধৈবৎ স্বরটির অন্দোলন সংখ্যাটি ৫০০ কম্পাঙ্ক পাশ্চাত্য সঙ্গীতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের স্বর পদ্ধতিতে ধৈবতের ৪০৫ কম্পাঙ্ক ধরা হয়। ষড়জ-পঞ্চম হিসাবেই ভারতীয় ধৈবতের ৪০৫ কম্পাঙ্ক। অর্থাৎ ঋষভ স্বরের কম্পাঙ্ক ২৭০ এর ঠিক দেড়গুণ। এইভাবে ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতিতে স্বরসপ্তকে ষড়জপঞ্চম হিসাবের মহত্ত্ব বজায় আছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্বিতীয় অধ্যায়

সঙ্গীত শিক্ষাতত্ত্ব

সঙ্গীত শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মনে প্রশ্ন উঠে যে, কাদের পক্ষে বা কোন অবস্থায়, ব্যক্তি বিশেষের 'যন্ত্রসঙ্গীত' বা 'কণ্ঠসঙ্গীত' শিক্ষা করা উচিত। সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বপ্রথমে কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষা করার প্রবণতা অধিক দেখা যায় এবং যদি কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষা করায় কোনো বাধা বা অন্তরায় থাকে, তখনই যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষার কথা শিক্ষার্থীর মনে জাগে। কণ্ঠসঙ্গীতের শিক্ষার্থী হতে হলে কি কি বিষয়ের প্রয়োজন এবং কোন কোন গুণের অধিকারী হতে হবে অর্থাৎ গান করার কণ্ঠস্বর আছে কিনা, বা সঙ্গীতোপযোগী কণ্ঠস্বর শিক্ষার দ্বারা হওয়া সম্ভব কিনা, প্রভৃতি প্রশ্ন, কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে জাগে।

কণ্ঠসঙ্গীতের বিষয়ে এবং কণ্ঠসঙ্গীতের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট কণ্ঠসঙ্গীত বিশেষজ্ঞের মতামতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে হয়তো এ বিষয়ে কিছু মূল্যবান তথ্যের আভাষ মিলবে। ফরাসী দেশের কণ্ঠসাধনা শিক্ষার বিশেষজ্ঞ মেডেলেইনী ম্যানসান্ (Madeleine Mansion) "How to Sing" নামক তাঁর বিশিষ্ট গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। মেডেলেইনীর মতে যে মানুষ কথা বলতে পারেন, তিনি গানও করতে পারবেন। Speaking Timbre অর্থাৎ কণ্ঠস্বরের চারিত্রিক গুণাগুণ ঠিক থাকলে প্রকৃত পদ্ধতি অনুসারে নির্দিষ্ট সময়মত অভ্যাস দ্বারা সঙ্গীতোপযোগী কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই লাভ করা যেতে পারে।

গান করা বা কণ্ঠস্বর উৎপাদন প্রাণীমাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম। এক একটি প্রাণীর এক এক প্রকারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত কণ্ঠস্বর বা ডাক শোনা যায় এবং এই ডাকই তাদের নিজস্ব পরিচয়। এক একটি পাখীর সুমধুর ডাকে আমরা বিমোহিত হই এবং সেইসব পাখীর সেই সুমধুর কণ্ঠস্বর বা ডাক তাদের বিশিষ্ট পরিচয়। এই সুমধুর ধ্বনিকেই আমরা সঙ্গীতের পর্যায়ে বিচার করি। আর সেই সঙ্গীত. সেইসব প্রকারের সকল পাখীর মধ্যে সাধারণতঃ পাওয়া যায়। যদি কোনো ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয় তো অন্য কারণ থাকতে পারে। তাই মানুষের ক্ষেত্রেও গান করার চেষ্টা স্বাভাবিক ধর্ম। তবে সেই গান, সুমধুর হতেও পারে বা নাও হতে পারে। যেক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর সুমধুর নয় সেখানে পদ্ধতি সহকারে কণ্ঠসাধনা, কণ্ঠস্বর সুমধুর করতে সহায়ক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয়। তাই উপরিউক্ত কণ্ঠস্বর বিশেষজ্ঞ তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, "Singing itself a natural action, but fundamentals breathing, resonance, production and articulation must be clearly understood and nothing left to chance, this is the only way to gain mastery or vocal control—in other words Technique." অর্থাৎ গান করাটা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু তাকে নির্দিষ্ট মানে উন্নত করতে হলে, কণ্ঠসাধনার শ্বাসপ্রণালী, কণ্ঠস্বরের অণুরণন বিষয়, কণ্ঠস্বর প্রযোজন ও স্পষ্ট উচ্চারণ প্রভৃতির পরিষ্কার জ্ঞান থাকা দরকার। ঘটনাক্রমে কিছু লাভ করার পদ্ধতি কোনক্রমেই নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। এভাবেই কণ্ঠস্বরের ক্ষেত্রে কণ্ঠস্বরের পূর্ণজ্ঞান হতে কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসে। একেই অন্য ভাষায় প্রকৃত পদ্ধতি বলা যেতে পারে। সঙ্গীত শিক্ষার্থীর এরূপ নির্ভুল প্রথায় কণ্ঠস্বর সাধনা করা উচিত, যাতে উপরিউক্ত নিয়মগুলির প্রতি লক্ষ্য থাকে ও যথাযথভাবে অভ্যাস কার্যকরী হয়।

কণ্ঠস্বর উৎপাদনে মূল স্থলগুলি, যেখান থেকে কণ্ঠস্বর নির্গত হয়, তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত মাংসপেশীগুলি, হাড়গুলি ও কোমলাস্থি প্রভৃতি গুলির বৈজ্ঞানিক নাম ও গুণাগুণ কণ্ঠস্বর সাধকের বা শিক্ষকের আবশ্যিকভাবে জানা দরকার এবং কণ্ঠস্বরের জ্ঞানের সাথে কণ্ঠস্থলের কি কি পরিবর্তনের দ্বারা, কোন কোন স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ কোন কোন স্থল হতে উৎপত্তি হয়, তার বিশদ অনুশীলন ও জ্ঞান থাকা চাই। কারণ কণ্ঠস্বর উৎপাদন মূলগুলির ধারণা থাকলে তবেই কণ্ঠস্বরের উন্নতি করা যেতে পারে। কিন্তু কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ, সঙ্গীতে স্বরোচ্চারণের জন্য যার একান্ত প্রয়োজন, কণ্ঠস্বর শিক্ষার সঙ্গে তার (স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের) জ্ঞানও একান্ত অপরিহার্য। যদি শিক্ষকের এরূপ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা না থাকে, তবে সঙ্গীত শিক্ষার্থী তাদের বহুমূল্য সময় ব্যয় করে, অথবা এক শিক্ষক হতে অন্য শিক্ষকের নিকট গিয়ে শিক্ষা করেও কোনো সুফল প্রাপ্ত হয় না এবং সঙ্গীত শিক্ষার সোপান দৃঢ় হয় না। শিক্ষার্থী ক্রমাগত শিক্ষক পরিবর্তন করে, কোনো কার্যকরী শিক্ষা লাভের অনুসন্ধানে এবং কিছু উন্নতি লাভের আশায়। কিন্তু প্রকৃত ফল কোনো দিনই লাভ হয় না।

সত্যকে যেমন ভাগ করা যায় না, তেমনি কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পীকেও সত্যকারের কণ্ঠসাধন পদ্ধতি অবলম্বন করতেই হয়। নচেৎ প্রকৃত কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী হওয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যায় না। কণ্ঠস্বর উৎপাদন স্থল মানুষের দেহের অন্যান্য অবস্থিতির মধ্যে একটি। একটি মানুষ হতে অন্য মানুষ যেমন এক নয় এবং উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদ থাকবেই, তেমনি একই প্রকারের কণ্ঠসাধনার প্রথায় সবার কণ্ঠস্বরের উন্নতির ফলাফল একই রকম হতে দেখা যায় না। একটি মানুষের দেহের অসুস্থতায় যে প্রকার চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, ঠিক সেই প্রকার চিকিৎসায় অন্য মানুষের দেহের অসুস্থতায় একই ফল পাওয়া যায় না। মানুষের প্রকৃতি ও দেহের তারতম্যে ভিন্ন প্রকার চিকিৎসার যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনি কণ্ঠস্বর সাধনার ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির কণ্ঠস্বরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরণের অনুশীলনের প্রয়োজন।

যদি কোনো শিল্পী তার কণ্ঠস্বরকে মধুর হতে মধুরতর করতে চান, তাহলে তাকে নীরস ও দুরধিগম্য প্রথা বর্জন করে, মধুর কণ্ঠস্বর উৎপাদনের দিকে অধিক দৃষ্টি দিতে হবে। তবে শিক্ষার্থী প্রকৃত মধুর কণ্ঠস্বর উৎপাদনে সাফল্য লাভ করবেন। আবার অনেক শিল্পীর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিল্পী তার কণ্ঠের মধ্যে সুরের কসরতি বা কেরামতি কতটা লাভ করতে পারেন, তার প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখেন। সে ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু পূর্ব প্রথা কার্যকর নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে কণ্ঠস্বর সাধনায় ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক প্রথায় শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা কণ্ঠস্বরের তারতম্য ঘটান যেতে পারে। কিন্তু যেকোনো ব্যক্তিই কি কণ্ঠসঙ্গীত, শিল্পী হতে পারেন? এ বিষয়ে "হুগো রীম্যান" তাঁর "ডিক্সনারী অফ্ মিউজিক" নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, "যে কণ্ঠের সাহায্যে আমরা কথা বলি, সেই কণ্ঠস্বরের অনুকম্পন বৃদ্ধির দ্বারাই সঙ্গীতের উপযোগী কণ্ঠ পাওয়া যায়"। কণ্ঠে শুধুমাত্র অনুকম্পন বৃদ্ধি করলে, কণ্ঠের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয় বটে, কিন্তু তাকে আবার সঙ্গীতের সুরের বশবর্তী করতে হবে। এইখানেই শিল্প সৃষ্টির প্রশ্ন নিহিত থাকে। শিল্পী হতে হলে প্রকৃত শিল্পীর সংস্পর্শে আশা চাই। যেমন একটি পাখী তার সুমধুর ডাক, সেই জাতীয় পাখীর সংস্পর্শে থেকেই শিক্ষা করে। শিল্পী হবার জন্যও বিশেষ প্রকারের শিক্ষা দরকার, যার দ্বারা শিক্ষার্থী শিল্পীসুলভ জ্ঞান আহরণ করতে পারেন।

এ বিষয়ে শুধু ঔপপত্তিক আলোচনা করা হল। কিন্তু প্রত্যক্ষ কিছু ঘটনার দিকে অনুসন্ধান করা যায় তো উপরিউক্ত মতগুলির সমর্থন পাওয়া যাবে। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পীদের জীবনী আলোচনা করলে হয়তো আরো তথ্যের সন্ধান মিলবে। সঙ্গীত জগতে যেসব শিল্পী প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন, তাঁদের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মধ্যে পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গীত শিল্পী কারুসো (Caruso) কে অনেকেই জানেন। এই সঙ্গীত শিল্পীর প্রথম জীবনে কণ্ঠশিল্পী হবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। তিনি প্রথম জীবনে পাশ্চাত্য দেশের সমবেত সঙ্গীত শিল্পীদের দলে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কারণ সঙ্গীতে যথেষ্ট শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন না করলে একক শিল্পী (Soloist) হওয়া যায় না। কিন্তু বিখ্যাত কারুসোর কণ্ঠস্বর প্রথম জীবনে এমনই ছিল যে, সমবেত সঙ্গীত শিল্পীদের দলেও তাঁর স্থান হত না। এই অবস্থায় তিনি তাঁর অবস্থা উপলব্ধি করলেন এবং প্রকৃত সঙ্গীত শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের নিকটে গিয়ে বিজ্ঞান সম্মতভাবে সঙ্গীত অনুশীলন করতে আরম্ভ করলেন। তারপর প্রকৃত পদ্ধতির সাথে এবং সময়মত সঙ্গীতের অভ্যাস দ্বারা নিজে একজন একক কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী হয়ে উঠলেন এবং সঙ্গীত জগতে যশস্বী হলেন। এইভাবে আরো অন্য বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীদের জীবনী অনুসন্ধান করলে পর ও এই ধরণের আরো বহু তথ্যের সন্ধান মিলবে।

"সুকণ্ঠ, প্রতিটি মানুষের মধ্যে 'লুক্কায়িত ধন' হিসাবে নিহিত থাকে"। সেই অপ্রকাশিত সম্পদকে প্রকৃত পদ্ধতির সাহায্যে প্রকাশিত করতে পারলেই সুকণ্ঠ অর্জন করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীর শিক্ষাপর্ব শুরু করার পূর্ব হতেই স্বাভাবিক ভাবেই কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ও সুপ্রকাশিত। এই সুপ্রকাশিত ও সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরকে দীর্ঘদিন অবিকৃত রাখতে হলে পদ্ধতি সহকারে কণ্ঠস্বর সাধনার অভ্যাস দরকার। কারণ বিকৃত অভ্যাস, অল্পদিনেই কণ্ঠস্বরের মাধুর্য ও মিষ্টত্ব নষ্ট করে দিতে পারে। সুকণ্ঠ স্বাভাবিকভাবে লাভ করলেও তাকে রক্ষা করার শক্তি অর্থাৎ দক্ষতা ও শিক্ষা থাকা চাই। যে কোনো ক্ষেত্রেই সম্পদকে ঠিকভাবে রক্ষা না করলে পর হারাতে হয়। তেমনি সুমিষ্ট ও সুপ্রকাশিত সঙ্গীতোপযোগী কণ্ঠস্বরকেও যথাযথভাবে পরিচর্য্যা ও রক্ষা না করলে পর, তা হারাতে হবে। তাই সুকণ্ঠ স্বাভাবিকভাবে থাকলেও তার রক্ষার জন্য বৈজ্ঞানিক ও সাঙ্গীতিক শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। আর এই শিক্ষার দ্বারা স্বাভাবিক সুকণ্ঠ আরো মাধুর্যপূর্ণ হতে পারে।

সাধারণত কণ্ঠস্বরের বিকৃতি কেন ঘটে তার কিছু আলোচনা দরকার। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও নিষ্কাশন, নাসিকার দ্বারা করি। এরূপ ক্ষেত্রে নাসিকার গহ্বরের মধ্যে কোনো বিকৃতি বা বাধার উৎপত্তি না হলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনো বাধা হয় না। কণ্ঠস্বর উৎপাদনের সময় বা গান করার সময় আমাদের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কণ্ঠস্বর গলার মধ্য দিয়ে নির্গত হয়। তাই গলার স্বর স্বাভাবিক থাকে, যখন গলার ভিতরকার অংশগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ গলার অভ্যন্তরে টন্‌সিল, ল্যারিঙ্গস্, গ্লটিস্ প্রভৃতি যে অংশগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি যেন রোগমুক্ত থাকে। কারণ এগুলিতে অস্বাভাবিকভাবে ঠাণ্ডা লাগলে, কোনো প্রকার জীবাণুর ছোঁয়াচ বা হঠাৎ কোনো প্রকারে আঘাত প্রাপ্ত হলে পর অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখা যায় এবং ফলস্বরূপ গলার কণ্ঠস্বর ও বিকৃত হয়ে যায়। এই অবস্থায় কোনো চিকিৎসকের পরামর্শে এবং ঔষধ সেবনে গলার কণ্ঠস্বর আবার স্বাভাবিক হয়। কোনো কোনে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গলার অভ্যন্তরে টন্‌সিলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, আবার ল্যারিংজাইটিস্ বা ফ্যারিংজাইটিস্-এ ক্রমাগত কষ্ট পাওয়া প্রভৃতি অসুবিধা বর্তমান। এই অবস্থায় কণ্ঠস্বরের আওয়াজ স্বাভাবিক থাকে না এবং চিকিৎসার দ্বারা যদি এই অসুবিধাগুলি দূরীভূত না করা যায় তবে গান করা অতিশয় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে যন্ত্রসঙ্গীতের সাহায্যে সঙ্গীত শিক্ষার আগ্রহ মিটাতে হয়। পূর্ণ কণ্ঠস্বর উৎপাদনে কণ্ঠের সঙ্গে নাসিকারও আংশিক যোগ আছে। কিন্তু কণ্ঠের প্রাধান্যই অধিক মাত্রায় বর্তমান থাকে।

যাদের কণ্ঠ, উপরিউক্ত দোষগুলি হতে মুক্ত, তারা অনায়াসেই সঙ্গীত শিক্ষা করতে সক্ষম হয়। এখন প্রশ্ন উঠে যে কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষা শুরু করার কোনো নির্দ্ধারিত বয়স সীমা আছে কিনা। প্রশ্নটি সঙ্গীত শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সঙ্গীত একটি বিরাট বিষয়বস্তু এবং ভারতীয় সঙ্গীত আয়ত্ব করতে হলে অধিক সময় লাগে। এ বিষয়ে কণ্ঠসঙ্গীত বিশেষজ্ঞের মত হল, অতি অল্প বয়স হতে বা খুব বেশী বয়সে সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করা হলে, আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায় না। আবার সতেরো কিংবা আঠারো বয়সের পূর্বে সঙ্গীত শিক্ষা করা যাবে না এরূপ চিন্তাও ঠিক নয়। পুরুষ সঙ্গীত শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এই সময় কণ্ঠস্বরের এক পরিবর্তন দৃষ্ট হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর এই কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন প্রকটরূপে দেখা দেয় ও কণ্ঠের মধ্যে বেশ অসুবিধার সৃষ্টিও হতে থাকে। এই সময় কোনো কোনো শিক্ষার্থীকে কণ্ঠসঙ্গীতের সাধনা একেবারে বন্ধ করার অবস্থা করে দেয়। তাই কোনো কোনো মতে এই অবস্থা পার হয়ে যাবার পর কণ্ঠসঙ্গীত শিক্ষা ও সাধনা করা উচিত, এরূপ মনে করেন। কিন্তু এই প্রথায় অনেক অসুবিধার সৃষ্টি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হতে দেখা যায়। অধিক বয়সে সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করলে পর সঙ্গীতের উপযোগী শ্রবণ শক্তি লাভ করতে অনেক দেরী হয়ে যায় এবং ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সাধারণ মান থেকে পিছিয়ে পড়তে দেখা গেছে। কারণ ভারতীয় সঙ্গীতের প্রগাঢ়ত্ব বুঝতে বুঝতেই বয়সের বৃদ্ধি হয়ে যায়, তখন কণ্ঠস্বরের শক্তি ও সৌন্দর্য নষ্ট হয়, ফলে অধিক বয়সে সঙ্গীত শিল্পীর উপযোগী কণ্ঠস্বর তৈয়ারী হতে পারে না। আর বয়স অধিক হওয়ার সাথে গলার মিষ্টত্ব কমে আসে, গলায় কর্কশ ভাব এসে পড়ে এবং এই সব কারণে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শিল্পীর সুকণ্ঠস্বর খুবই বিরল।

যে সব শিশু অতি অল্পবয়স হতে সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাদের যদি সাধারণ পাঠ্যক্রমের সাথে সঙ্গীত-কলাকেও পাঠ্যক্রমের একটি শাখা হিসাবে রেখে শিশু-বয়স হইতেই অল্প অল্প সঙ্গীতের অভ্যাস করান যায়, তাতে শিশুর মনকেও প্রফুল্ল রাখায় সাহায্য করে এবং সঙ্গীতের শিক্ষার ব্যাপারেও সহায়তা হয়। অনেকের মনে হতে পারে যে, শৈশবাবস্থায় সঙ্গীত শিক্ষার দরুণ, শিক্ষার্থীর সাধারণ শিক্ষা, ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু পৃথিবীর নানাস্থানে যেসব শিক্ষায়তনে উপরিউক্ত ব্যবস্থা আছে, সেখানকার শিক্ষার্থীরা তাদের সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েনি, বরং যেসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী অতি সাধারণ স্তরে ছিল, সঙ্গীতের দ্বারা তারা পরবর্তী জীবনে সর্ববিষয়ে লাভবান হয়েছেন। এবিষয়ে নানা গবেষণার কথা পরবর্তী অংশে আলোচনার অবকাশ রাখে। যেসব শিশুর কণ্ঠস্বর প্রথমাবস্থা হতেই সুমিষ্ট এবং একক সঙ্গীতের উপযুক্ত, তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষকের অধিক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন হয়। অল্প বয়স হতে গান করার প্রবণতা থাকায় শৈশবাবস্থা হতে পদ্ধতি সহকারে কণ্ঠস্বর সাধনা করা দরকার। গান করার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকায় অনেক ক্ষেত্রে গান করার জন্য কোনো কোনো সময়ে অধিক চাপ পড়ে। এইভাবে অত্যাধিক এবং অস্বাভাবিক গান করার কারণে কণ্ঠস্বরের সৌন্দর্য ও মিষ্টত্ব চিরতরে নষ্ট হতেও দেখা গেছে। গান করার চাপ অস্বাভাবিক হয়, তার প্রধান কারণ এই যে, কোনো অল্পবয়সের শিশুর গান করার ক্ষমতা দেখলে সবাই আশ্চর্য হয় এবং সেই শিশুর গান শোনার জন্য প্রায়সঃই গান করার চাপ সৃষ্টি হয়। শৈশবাবস্থা হতে সাধারণ পড়াশুনা ও কাজের সঙ্গে কিছু কিছু সঙ্গীতের, পদ্ধতি-সহকারে অভ্যাস কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে। কিন্তু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে সঙ্গীতের অভ্যাসের জন্য অধিক সময় দিতে হয় ফলে সাধারণ পড়াশুনার সময় কিছু কম হতে পারে।

কোনো সঙ্গীত পিপাসু শিক্ষার্থী শিশুবয়স থেকে প্রথমাবস্থায় প্রতিদিন দশ মিনিট হতে পনেরো মিনিট পর্যন্ত কণ্ঠসাধনার সঙ্গে শ্বাস-পদ্ধতির নির্ভুল অভ্যাস এবং আধ ঘণ্টা করে প্রতি সপ্তাহে তিনদিন সঙ্গীতের পাঠ অনুশীলন করলে পর সঙ্গীতের অভিষ্টসিদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়। এখন এই সময় সঙ্গীতের যেসব অভ্যাস দরকার তা কেমন হবে সাধারণতঃ প্রশ্ন ওঠে।

শ্বাসকার্য এবং শ্বাসনিয়ন্ত্রণ কিভাবে হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা না হলে শিক্ষার্থীর নিকট বিষয়টি পরিষ্কার হবে না। গান করার জন্য একেবারে খুব বেশী শ্বাস গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন হয় না। তবে যেটুকু শ্বাস গ্রহণ করা হয় সেটুকু কণ্ঠস্বর উৎপাদন করার সময় কি অনুপাতে এবং কিভাবে নিঃসৃত করতে হবে, সেই প্রক্রিয়া অভ্যাসের সাথে শিক্ষা করা দরকার। একেবারে অতিশয় শ্বাস গ্রহণ করা কণ্ঠস্বর উৎপাদনে বাধার সৃষ্টি করে। কারণ সঙ্গীতের উপযোগী কণ্ঠস্বর উৎপাদনে কোনো বিকট শব্দের প্রয়োজন হয় না। বরং সুমিষ্ট ও সুরেলা কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন। বক্ষস্থলে যদি অধিক শ্বাস গৃহীত থাকে, তবে তার চাপে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর নির্গত হতে পারে না। তাই স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর উৎপাদনে স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া, কণ্ঠস্বর উৎপাদনে উপযোগী।

বড় শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, কেবল শ্বাস-ব্যায়াম ক্রিয়ার জন্য এবং এর দ্বারা দমের স্থায়ীত্ব ও দৈর্ঘ্য এবং শ্বাস নিয়ন্ত্রণ অভ্যাস করা সহজ হয়। ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শ্বাসের স্থায়ীত্ব, দৈর্ঘ্য ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করলে, কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশনে সহায়তা হয়।

কণ্ঠের জন্য গৃহীত শ্বাস কণ্ঠস্বর উৎপাদনের জন্যই সম্পূর্ণভাবে ব্যয়িত হওয়া উচিত। কোনো বস্তুর জন্য যেমন কোনো জিনিষের একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠি থাকা আবশ্যক, সঙ্গীতোপযোগী কণ্ঠস্বর উৎপাদনের জন্যও শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার নির্দিষ্ট মাপকাঠি আছে। কণ্ঠস্বর উৎপাদনে শ্বাস, স্বরযন্ত্রের দ্বারা কত পরিমাণে এবং কতটা চাপ সৃষ্টি করলে কণ্ঠস্বর সঙ্গীতোপযোগী হয় তার জ্ঞান ও অভ্যাস থাকা দরকার।

কিন্তু এই জ্ঞান ও অভ্যাস না থাকলে, কোনো নষ্ট হয়ে যাওয়া রেকর্ড, গ্রামোফোনে বাজালে যেরূপ শব্দের উৎপত্তি হবে, কণ্ঠস্বরের মধ্যেও সেরূপ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবস্থা দেখা দেয়। সেজন্য শ্বাস-ক্রিয়ার এমন অভ্যাস থাকা দরকার যে, তা যেন প্রয়োজনে সহজেই নমনীয় হয়। কিন্তু সেই সাথে দৃঢ়তাও যেন থাকে, তবেই কণ্ঠস্বর ইচ্ছাগত নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হবে।

সঙ্গীতের স্বরের প্রবাহ বজায় রাখার জন্য কণ্ঠস্বরের সঙ্গে দমের যোগাযোগ সম্বন্ধ ব্যাপারে বিশেষ সাবধান থাকা দরকার। কারণ কোনো স্বরের প্রবাহকে অধিক সময় রাখতে গিয়ে হঠাৎ যদি দম শেষ হয়ে যায়, তবে স্বরের প্রবাহে যে হঠাৎ বাধা পড়ে, তাতে স্বরের সৌন্দর্য নষ্ট হতে পারে। তাই স্বরকে কতটা সময় একশ্বাসে ধরে রাখা যায় এবং শ্বাস সমাপ্ত হবার ঠিক পূর্ববর্তী মুহূর্তে কোনো একটা ফাঁকে আবার শ্বাস নিয়ে নেওয়া প্রভৃতি শ্বাস-ক্রিয়ার অভ্যাস স্বরের সৌন্দর্য বজায় রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

একটি স্বর প্রবাহের সঙ্গে অন্য স্বর প্রবাহের মধ্যে শ্বাস গ্রহণ করার সময় যদিও খুবই অল্প হয়, অর্থাৎ দুবার শ্বাস গ্রহণ করলে স্বরসমষ্টির সৌন্দর্য হানি হবার সম্ভাবনা আছে, যদি এরূপ অবস্থা হয়, তবে শ্বাস গ্রহণের সময় হৃদযন্ত্রের পাশাপাশি যে পাঁজরাগুলি থাকে, তাকে প্রসারিত করে শ্বাস কিছুটা রাখার চেষ্টা করা যেতে পারে এবং প্রয়োজনানুসারে তার সদ্ব্যবহার, এই সমস্যার সুরাহা হতে পারে। কণ্ঠস্বর উৎপাদনের সময় শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ায় যেন অন্য কোনো শব্দ শোনা না যায় বা দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির নজর আকৃষ্ট না হয়।

কোনো যন্ত্রী যেমন তার যন্ত্রসঙ্গীত সাধনায় একটি নির্দিষ্ট ও নির্ভুল পথ অবলম্বন করে সাফল্য লাভ করে, তেমনি কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পীরও উচিত কণ্ঠস্বর সাধনায় নির্দিষ্ট ও নির্ভুল পথ অবলম্বন করে কণ্ঠসঙ্গীতে সাফল্য অর্জন করা। আমরা সাধারণতঃ কথাবার্তা বলার সময় এইসব রীতিনীতি অনেকাংশে অজানিতভাবে মেনে চলি। কণ্ঠসঙ্গীত সাধনার সময়ও এইসব রীতিনীতি অনুসরণ করলে পর কণ্ঠস্বর উৎপাদনে সহায়তা মিলবে। কথাবার্তা বলার সময় কণ্ঠস্বরের যে গুণাগুণ ও মান থাকা দরকার কণ্ঠ-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তা আরো ব্যাপক। সেজন্যই কণ্ঠস্বর সাধনায় বা সঙ্গীতে আরো নির্দিষ্টভাবে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়।

কোনো কোনো কণ্ঠসঙ্গীত বিশেষজ্ঞের মতে, কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পীর এক একটি শ্বাসক্রিয়ার স্থায়ীত্বের পরিমাপ ত্রিশ সেকেণ্ড হওয়া উচিত।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতীয় সংগীতের প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি

প্রাচীন ভারতের সর্ব বিষয়ের শিক্ষা পদ্ধতিই "ব্যষ্টি" কেন্দ্রিক এবং আধুনিক যুগের শিক্ষা পদ্ধতিতে "সমষ্টিগত পদ্ধতি" অধিক বর্তমান দেখা যায়। প্রাচীন কালে শিক্ষা পদ্ধতি "ব্যষ্টিকেন্দ্রিক" হয়েছিল নানা কারণে এবং আধুনিক কালের শিক্ষা পদ্ধতি "সমষ্টিগত" হয়েছে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে। সে যুগে বর্তমান সমস্যার ন্যায় কোন সমস্যাই বোধ হয় ছিল না এবং ব্যষ্টিকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলন করার সুবিধাও ছিল। তাই সে যুগে ব্যষ্টিকেন্দ্রিক প্রথা সম্ভব হয়েছিল। ব্যষ্টিকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি উৎকৃষ্ট না সমষ্টিগত শিক্ষা পদ্ধতি অধিক শ্রেষ্ঠত্য এক কথায় বলা কঠিন। বিষয় ভেদে, প্রয়োজনানুসারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় কোনটি উৎকৃষ্ট, আবার কোনটি অধিক কাম্য।

বৈজ্ঞানিক যুগে দূরত্ব সংখ্যা, অনুসন্ধান ও সমষ্টি প্রভৃতির সমস্যা, যা পূর্বে ছিল, তা বিজ্ঞানের সাহায্যে দূরীভূত হতে চলেছে। তাই সমষ্টির সংরক্ষণ বা ভৃথকীকরণ, বৈজ্ঞানিক ধারায় সহজ হতে সহজতর প্রতীয়মান হতে চলেছে। কোন বিশেষ বিষয়ে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ বা অনুসন্ধান অতি সহজেই করতে পারা যায় যদি বিজ্ঞানের সাহায্যে গ্রহণ করা হয়। বিজ্ঞানের সাহায্যে বা বৈজ্ঞানিক ধারায় অনুসন্ধান, আবিষ্কার, সৃষ্টি প্রভৃতির সাফল্যের প্রভুত প্রমাণ আজ আমাদের সামনে আছে। কিন্তু আত্মার উপলব্ধি বা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে বিজ্ঞান আজও পারি নি। সেখানেই বিজ্ঞান আজও পরাজিত।

ভারতীয় কৃষ্টির বিশেষত্ব প্রাচীন কাল হতেই এই ছিল যে শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে আত্মার উপলব্ধি ও সর্ব বিষয়ে একান্ত সাধনা চলে এসেছে। সাধনার ক্ষেত্র যেমন ব্যাপক, অনুশীলনের ক্ষেত্রে তেমনি একাগ্রতার প্রয়োজন ছিল ও আছে। অনুশীলন আবার কোন কিছুর সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ লাভে সমর্থ হয় না। শিক্ষা ক্ষেত্রে একনায়কত্বের প্রয়োজন আছে কিনা, তা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়।

প্রাচীন ভারতের কৃষ্টি সাধনার দিকে নজর দিলে সমস্যার কিছু হদীশ পাওয়া যেতে পারে। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতিতে সমবেত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাবে শিক্ষা দেওয়ার কোন বিশেষ নজীর আমরা দেখতে পাই না। শিক্ষার্থীকে শিক্ষাগুরুর নিকট গিয়ে গুরু গৃহে থেকে গুরুসেবা করে, আশ্রমিক প্রথায় শিক্ষা গ্রহণের একাধিক ঘটনা জানা যায়। গুরুর নিকট একাধিক শিষ্য থাকলেও গুরু তাঁর প্রতিটি শিষ্যের পৃথক দায়িত্ব নিতেন ও পৃথক শিক্ষা দিতেন, এরূপ শোনা যায়। প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির অনুসন্ধান করে একটি পুরাতন ঘটনার বিবরণ জানা যায়। বিখ্যাত দুই প্রথিত যথা গুরু "হরদেও এবং গণবাজার" মধ্যে সঙ্গীতের নৃত্যাধ্যায়ের শিক্ষা পদ্ধতির তর্কের এক চিত্তাকর্ষক ঘটনার বিবরণ মহাকবি কালিদাসের "মালবিকা অগ্নিমিত্রম্" নামক কাব্যে পাওয়া যায়। এই ঘটনার শিক্ষার্থীর প্রতি কি পদ্ধতি অবলম্বনে, প্রকৃত শিক্ষালাভে সহায়ক হবে ও শিক্ষার্থীকে নৃত্য বিষয়ের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করবে তার আলোচনা এই কাব্যে হয়েছে। নিত্য-কলাশিল্পের উন্নতির পথ পরিদর্শনের ও উপলব্ধিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজ দরবারে সঙ্গীত নৃত্যকলা শিল্পেরও নাট্যকলার, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যে, চর্চাক্ষেত্র থাকতো, সেখানে হয় তো সমষ্টিগত ভাবে সঙ্গীত কলা বা নাট্যকলার শিক্ষা বা চর্চা হয় তো হতো। এই সমস্ত কলাকেন্দ্রকে রাজ-দরবারের উৎসব অনুষ্ঠানে চিত্তবিনোদনের কাজে, রাজনির্দেশে কাজ করতে হত। অনুষ্ঠানে সমবেত নৃত্য বা সমবেত সঙ্গীত অনুষ্ঠান পরিবেশনের জন্য যে মহড়ার প্রয়োজন হতে সেই সমষ্টিগত ভাবে মহড়ার নামে শিক্ষার উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে। তাই এগুলি প্রকৃত শিক্ষা কেন্দ্রের পর্যায়ে আসতে পারে না। পৃষ্ঠপোষকগণের নির্দেশের অপেক্ষায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রস্তুত থাকতে হত। গুরুগৃহে থেকে গুরুসেবা করে প্রকৃত গুরুগৃহের শিক্ষাদর্শ এই পরিবেশে ছিল না।

সে যুগে নালন্দা, তক্ষশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীত, নৃত্যকলা প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল বলে মানা যায়, কিন্তু কোন পদ্ধতি এই সময় অবলম্বন করা হত এবং মহিলা, পুরুষ প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হত তার বিশদ বিবরণ পাওয়া কঠিন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে পুরুষ সঙ্গীত শাস্ত্রকারের একাধিক নাম পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে মহিলাগণের নাম খুবই কম দেখা যায়।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়বস্তুর মধ্যে ব্যষ্টিকেন্দ্রিক শিক্ষা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বা সমষ্টিগত শিক্ষা, কোনটি অধিক উপযোগী তা এক কথায় বলা খুবই কঠিন। তবে প্রাচীন কালে যে "গুরুশিষ্য" শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যথেষ্ট ধৈর্য রাখতে হত ও দীর্ঘকাল ধরে এক বিষয় বস্তুর উপর চিন্তা ও ধ্যান নিবদ্ধ রেখে শিক্ষার গতি মন্থর হলেও সে শিক্ষা গঠনমূলক ছিল। এক একটি ছাত্র গুরুর নিকট হতে আলাদাভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ এবং গুরু শিষ্যের মধ্যে প্রয়োজন মত এবং সুবিধানুযায়ী প্রকৃত শিক্ষা এবং নির্ভুল অভ্যাসের ও নিরীক্ষণের সুবিধা লাভ করত। বিভিন্ন স্তরের প্রতিভাযুক্ত ছাত্রের জন্য, যে ভিন্ন প্রথার পাঠের প্রয়োজন হয়, পৃথকভাবে শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত থাকায় তা যথোপযুক্ত ভাবে পালন ও নিরীক্ষণ করা সম্ভব হত। তবে সে যুগে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুবই কম ছিল। আজকের দিনে সাধারণভাবেই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অধিক এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভিন্ন প্রতিভা ও বিভিন্ন গুণগুণযুক্ত দেখা যায়। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ব্যষ্টিপ্রথায় শিক্ষা পদ্ধতি খুব কম ক্ষেত্রে সম্ভব হয়। ব্যষ্টিপ্রথা ছাত্রছাত্রীর পক্ষে মঙ্গলজনক, কিন্তু সখ্যায় অধিক হলে শিক্ষাগুরুর পক্ষে অসুবিধা ঘটে।

গুরু শিষ্যের মধ্যে ব্যষ্টি প্রথার শিক্ষাপদ্ধতি আজ হতে চার শতাধিক বৎসর পূর্বে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। নায়ক গোপাল, নায়কবৈজু, আমীর খুসরু প্রভৃতি সঙ্গীত সাধকেরা এই শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। এই সময়েই নায়ক গোপালও আমীর খুসরুর মধ্যে প্রতিযোগীতার নানা বিতর্কমূলক কাহিনীও ঘটেছিল বলে জানা যায়। এই সব সঙ্গীতজ্ঞেরা সেদিন সঙ্গীতের নানা দিকের অভিনবত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। আমরা প্রথমে সারঙ্গদেবের "সঙ্গীতরত্নাকরে" কল্লীনাথের টীকায়ও "রাগ এবং তাল কদম্বকস্"এ নায়ক গোপালের নাম পাই। আর ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে নূতন রাগরাগিণীর পরিচায়ক ও সঙ্গিতীক যন্ত্রের উদ্ভাবক হিসাবে আমীর খুসরুর নাম পাওয়া হায়। ইস্‌লামীয় ভক্তিপ্রধান সঙ্গীত কাওয়াল গান হজরত আমীর খুসরু প্রথম প্রচলিত করেন, উত্তর ভারতে। কেহ কেহ বলেন তিনিই এই ধারার সঙ্গীতের উদ্ভাবক। বৈজু সম্বন্ধে জানা যায় যে, তিনি দার্শনিক ভক্তিমূলক সঙ্গীতই প্রচার করে বেড়াতেন, দেশ দেশান্তরে। এই ভারতের শিল্পী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তৎকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর অন্তরস্পর্শী সঙ্গীত প্রায় পাঁচশত বৎসর পরও তাঁকে অমর করে রেখেছে। কিন্তু তাঁর এই নাম ও উপরিউক্ত বিবরণ ছাড়া, তিনি সঙ্গীত কি ভাবে শিক্ষা করেছিলেন কোন শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বনে, তাঁর সঙ্গীত জীবনে এতটা সাফল্য এনে দিয়েছিল, তার সন্ধান মেলা ভার।

এর পর আমরা যে সঙ্গীত সাধকের কথা মানতে পারি, তাঁর নাম স্বামী 'হরিদাস ডাগুর'। গত চার শতাব্দী হতে স্বামী হরিদাস উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের পিতার স্থান অধিকার করে আসছেন, বলা যায়। স্বামী হরিদাস জীর শঙ্গীত শিক্ষা পদ্ধতি ও ফলস্বরূপ তার সার্থক নজীর রেখে গেছেন মিঞা তানসেন, গোপাল লাল, রামদাস প্রভৃতি বিশিষ্ট গুণী শিল্পীর মধ্যে। সঙ্গীত জগতে এঁদের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। এঁরাই পরবর্তি কালে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে, এই সঙ্গীত প্রচার করেন। কিন্তু যে সঙ্গীত তাঁরা সাফল্যের সাথে প্রচার করেছিলেন, তার সঠিক গায়কীর বিবরণ ও কি ভাবে তাঁরা কণ্ঠসাধনা ও শিক্ষা করেছিলেন, তার উপযুক্ত নজীর দুর্লভ। সে যুগে সঙ্গীতের রেকর্ডের সৃষ্টি হয় নি এবং এমন কোন মাধ্যম ছিল না, যার সাহায্যে তৎকালীন সঙ্গীতের সঠিক নমুনা পাওয়া যাবে। কিন্তু যাঁরা তাঁদের নিকট হতে "ব্যষ্টিপদ্ধতিতে" প্রকৃত সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন, এমন কোন শিষ্য পরম্পরার প্রতিনিধি পাওয়া গেলে, তৎকালীন সঙ্গীতের রূপ কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। এই কারণেই বোধহয় তৎকালীন সঙ্গীত সাধকেরা নিজের বংশের কোনো বংশজকে, তাঁর নিজস্ব সঙ্গীত উত্তরাধিকার সূত্রে শিক্ষা দিয়ে যেতেন, যদি না উপযুক্ত শিষ্য লাভ করতেন। অবশ্য এই বংশজ "উত্তরাধিকার সূত্র" প্রথা, পরবর্তি যুগে, সঙ্গীতের ধারা বহণ করতে অক্ষম হতেও দেখা গেছে। কোনো কোনো পেশাদারী সঙ্গীতশিল্পী, বহু পরবর্তিকালে, বংশজদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য, বংশজ অনুপযুক্ত পাত্রে সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু উপযুক্ত অবংশজ পাত্রে সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করেন নি। সঙ্গীতধারা রক্ষার ইতিহাসে ইহা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিবর্তনের যুগে উপযুক্ত পাত্রের হাতেও যে সঙ্গীতের বিবর্তন হয় নি এরূপ জোর করে বলা যায় না। তবে প্রকৃত শিক্ষা পদ্ধতি এ বিষয়ে অনেকটা রক্ষণশীল বলা যেতে পারে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আলাপ ও ধ্রুপদ, যা অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ সঙ্গীত হতে উৎসারিত, এই প্রচলিত সঙ্গীত পদ্ধতিই ভারতীয় অতি প্রাচীন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিবর্তিত মূল ধারা বলে ধরা যেতে পারে। কারণ এইসব সঙ্গীত রচনার মধ্যেই উপরিউক্ত সঙ্গীত সাধকদের নামের ভনিতা পাওয়া যায়। ভারতীয় সঙ্গীতের এই ধারা শিক্ষা করার পর, অন্য যে কোনো সঙ্গীত শিক্ষা করা শিক্ষার্থীর পক্ষে আদৌ কঠিন বোধ হয় না। সঙ্গীত প্রাচীন যুগে যে ভক্তি মার্গের সাধনার পথ প্রদর্শন করতো, তা পুরাতন সঙ্গীতের রচনার দিকে একটু নজর দিলেই অনায়াসে প্রমাণ পাওয়া যাবে। ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতি ও সাধনার সাথে এই সব সঙ্গীতের যে সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তার দ্বারাই এই "সঙ্গীত", পুরাতন সিদ্ধসাধক সঙ্গীতজ্ঞের দ্বারা প্রচলিত ও গৃহীত ছিল, তার কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। পুরাকালে মন্দিরে ভক্তি মার্গের সাধনায় এইসব ধর্ম সম্বন্ধীয় ভক্তিমার্গের সঙ্গীত, উপরিউক্ত সঙ্গীত সিদ্ধরচনাকারদের দ্বারা রচিত হত এবং ভক্তের মনে এই সব সঙ্গীতের ধারা, চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। আজকের সঙ্গীত নানাভাবে বিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু এই বিবর্তিত সঙ্গীতের মধ্যে যে প্রাণ-স্পন্দনের অভাব দেখা দিচ্ছে, তার প্রধান কারন তখনকার ধ্রুপদ-আলাপের গায়কী পদ্ধতি, তখনকার কণ্ঠসাধন শিক্ষা পদ্ধতি। সঙ্গীতের জ্ঞান ও উপলব্ধি, শিষ্য বা বংশানুক্রমিক ধারা, প্রভৃতির শিক্ষা আজকের কোনো কোনো পেশাদারী সঙ্গীত মহল প্রাপ্ত হয় নি। স্বামী হরিদাসজী সম্বন্ধে জানা যায় যে, তিনি কণ্ঠসাধনার দ্বারা তাঁর কণ্ঠকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন যে, তাঁর কণ্ঠসঙ্গীতের প্রভাবে মানুষ তো অভিভূত হতই, পশু-পক্ষীরা ও জন্তু-জানোয়ারেরা পর্যন্ত আকর্ষিত হয়ে পড়ত। তাঁর সাধনা ও শিক্ষা তাঁর কণ্ঠস্বরের মিষ্টত্ব ও সুরমাধুর্য তাঁকে অতিমানবীয় অবস্থায় উন্নীত করেছিল। এই সাধনার পথই ছিল, প্রকৃত সাধনার পথ। কিন্তু যে সাধনা ও শিক্ষা পদ্ধতির ধারায় সঙ্গীতে তিনি এতটা বুৎপত্তি দেখিয়ে ছিলেন, তা সকলের নিকট আজও অজ্ঞাত। কিন্তু অনুসন্ধান ও গবেষণার দ্বারা কিছু তথ্যের পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।

যাহোক, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কিভাবে সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা হত এবং শিক্ষা দেওয়া হত তার দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা দরকার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সমষ্টিগতভাবে শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা গুরুশিষ্যের মধ্যে আলাদাভাবে শিক্ষা দিবার প্রথাই পূর্বে বেশী দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে যে সমষ্টিগতভাবে শিক্ষা দেওয়ার প্রচলন আছে, তা পাশ্চাত্য দেশে বহু পূর্ব হতে চালু ছিল জানা যায়। যেমন, গীর্জায় ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানে প্রভৃতি, সমবেতভাবে ধর্মসঙ্গীত গীত হত এবং কিছু কিছু শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল বলে জানা যায়। এই প্রকার শিক্ষা লাভের মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব লাভের মনোবৃত্তি দেখা যেত না। শিক্ষার্থীরা তাদের ধর্মানুষ্ঠানেই ধর্মের বাণীর দ্বারা জ্ঞান লাভ করে, সেই সব সঙ্গীত পরিবেশনে খুশী হতেন। কিন্তু এইভাবে কেহ কোনো বিশেষ বিষয়বস্তুর উপর আকৃষ্ট হয়ে বিশেষভাবে শিক্ষা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, 'ব্যষ্টি' পদ্ধতিতেই শিক্ষা, সমীচিন মনে করা হত এবং সেই পদ্ধতিই তৎকালে প্রচলিত ছিল। কোনো বালকের মধ্যে কোনো বিশেষ বিষয়ের প্রতিভা দৃষ্ট হলে, সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞের নিকট পাঠানো হত, প্রত্যক্ষ শিক্ষা ও নির্দেশ গ্রহণের জন্য।

এই রকম ঘটনাই ঘটেছিল বিখ্যাত পূজ্য গায়ক মিঞা তানসেনের ক্ষেত্রে। এবং বড় বড় পাশ্চাত্য সঙ্গীত রচয়িতা ও শিল্পীর জীবনেও একই রকমের উদাহরণ পাওয়া যায়। এদের সঙ্গীত শিক্ষার জীবনে, বিগত কয়েক শতাব্দী পূর্বে "ব্যষ্টি কেন্দ্রিক" শিক্ষা পদ্ধতিই সঙ্গীতে যে সাফল্য এনেছিল তা বলাই বাহুল্য। শিক্ষা লাভের সুযোগ সে যুগে মূল্য পরিমাপের উর্দ্ধে ছিল। সত্যকার বড় শিল্পীরা তাঁদের অর্জিত জ্ঞান উপযুক্ত পাত্র সন্ধান করে ও তাকে শিক্ষিত করে তবেই নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। কারণ তাঁরা জানতেন যে, যদি শিল্পকলাকে সঞ্জীবিত করে রাখতে হয়, তবে প্রকৃত আধার হল, উপযুক্ত শিষ্য। গুরুর অবর্তমানে তাঁর ধারা একমাত্র উপযুক্ত শিষ্যই, প্রকৃত বৈশিষ্ট্য বহন করতে পারে ও তা প্রচার দ্বারা প্রাণবন্ত করে। এ যুগে কোনো লোকই চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু তাঁর কৃষ্টি, শিল্পকলা ও কর্ম প্রভৃতি তাঁকে চিরস্থায়ী করে রাখতে পারে, যদি উপযুক্ত শিষ্যকে আন্তরিকভাবে শিক্ষার দ্বারা শিক্ষিত করে তুলতে পারে। কারণ শিষ্য বা বংশপরাম্পরাই ধারাকে চিরস্থায়ীভাবে রক্ষা করে এবং এই ধারাই প্রকৃত কলার মূল, বলে ধরা যেতে পারে। আর যদি বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ যদি গুরুর নিকট হতে কোনো শিষ্য প্রকৃত শিক্ষা না পায়, তবে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই ধারা বা কৃষ্টির সমাপ্তি বা মৃত্যু হয়, বলা যায়।

প্রাচীন যুগে সাধারণতঃ শিষ্যদের মধ্যে গুরুভক্তি বিশেষভাবে বিদ্যমান থাকতে দেখা যেত এবং গুরুভক্তির দ্বারা ও গুরুআশীর্বাদ লাভ করে গুরুগৃহে পরিশ্রমসহকারে শিক্ষালাভ করত। গুরুও আন্তরিকতার সাথে শিষ্যের প্রতি স্নেহ ও বাৎসল্য সহকারে প্রকৃত শিক্ষা দিতে আদৌ কুণ্ঠিত হতেন না। কারণ সে যুগে গুরু-শিষ্যের মধ্যে মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান দেখা যেত। এই মধুর সম্পর্ক বিদ্যমানের কয়েকটি বিশেষ কারণ লক্ষ্য করবার। বর্তমানে শিক্ষা পদ্ধতিতে গুরু শিষ্যের মধ্যে নানা অবশ্যম্ভাবী কারণে দেনা পাওনার সম্পর্ক কিছুটা যুক্ত থাকে। স্বাভাবিক কারণে, এই দেনা পাওনাই গুরু. শিষ্যের মধ্যে তিক্ততার কারণ হয়। কিন্তু সে যুগে সঙ্গীতের প্রতি রাজকীয় বা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থাকায়, শিল্পীর নিজের ভরণ পোষণের ভাবনা থাকতো না। রাজা বা সরকারই তাঁকে তাঁর প্রয়োজনী অর্থ ও সামগ্রী দান করতেন এবং শিল্পীর দায়িত্ব ও কাজ ছিল দেশের শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রাখা ও প্রকৃত শিক্ষার্থীকে প্রয়োজন হলে নিজের গৃহে পালন করেও শিক্ষা দেওয়া। কোন ক্ষেত্রেই অর্থ বিনিময়ের প্রশ্ন থাকতো না। প্রধানতঃ এই কারণেই শিক্ষার্থী অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে ও শ্রদ্ধা সহকারে গুরু গৃহে বাসা করে যথার্থ শিক্ষা লাভে উপযুক্ত হয়ে উঠতো। এই অবস্থায় শিষ্যকে গুরুর নিকট নানা কারণে কঠোর পরিশ্রম হয়তো করতে হত, কিন্তু ফল তার সাধারণ ভাবেই অশুভ হয় নি। এই পরিশ্রমে যদি শিষ্য অপারগ হত, তাকে তবে পূর্বেই অন্য বিষয় সূচী গ্রহণ করতে হত। কিন্তু সে যুগে পরিশ্রম ছাড়া কোন কিছু শিক্ষা করা বোধহয় সম্ভব ছিল না। শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্যে, কষ্টের দিক অনেকটা লাঘব হয়েছে বিভিন্ন দিক হতেও অনেক সুযোগ ও সুবিধা বেড়েছে। কিন্তু প্রকৃত সুযোগ গ্রহণ শিক্ষার্থী কতটা করতে পারে, তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। যা হোক প্রাচীন সঙ্গীত শিক্ষার ধারা পরিবর্তিত হয় প্রধানতঃ কয়েকটি বিশেষ কারণে। প্রাচীন যুগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যা ছিল, বর্তমানে তা নেই এবং বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা গুরুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নি রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে শিক্ষাগুরুর আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন এবং এই অবস্থার জন্য শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষাগুরুকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজের ভরণপোষণ সামলাতে হয়। প্রধানতঃ এই কারণে গুরুশিষ্যের মধ্যে অর্থের আদান প্রদান শুরু হয়ে যায়, এবং সেই প্রাচীন সম্পর্ক যা গুরুশিষ্যের মধ্যে বর্তমান থাকতো, পরবর্তি যুগে তা কমে যায়। সুতরাং গুরু শিষ্যের মধ্যে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যাপারে, স্নেহ ভালবাসা ও ভক্তির মধ্য দিয়ে যে পবিত্র ভাবে শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হত, তা পরে ব্যবসায়ের পর্যায়ে নেমে আসে ও সেই পুরাতন পবিবেশ খুব কমই পাওয়া যায়। শিক্ষা, অর্থমূল্য দিয়ে যার পরিমাপ করা যায় না, তার স্বল্য পরিমাপ, অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ হল। কিন্তু শিক্ষা করতে গেলে, তার পরিবর্তে যে উচ্চমূল্য দিতে হবে, তা হয়তো সবার পক্ষে সম্ভব হয় না এবং উপযুক্ত প্রতিভাধারী শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এই সাধ্যাতীত ব্যয় সম্ভব না হওয়ায়, শিল্প-কলারই প্রভুত ক্ষতি হয়েছে। এইভাবে প্রকৃত অধিকারী শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হতে লাগে এবং শিল্পকলা সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি চারুকলার বিশিষ্ট তথ্যগুলি এক বিশিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লো। ক্রমশঃ এক গোষ্ঠী, এগুলিকে তাদের গুপ্তধন করে ফেললো ও অতি উচ্চমূল্যের বিনিময় ছাড়া কোন শিষ্যকে শিক্ষা দিলেন না। তাদের মনোবৃত্তি ক্রমশঃ আরো উৎকট রূপ ধারণ করতে থাকে। একজন শিক্ষার্থীকে পৃথকভাবে একত্রে শিক্ষা দিলে, আর্থিক লাভের সুবিধা হবে, এই চিন্তা হতেই বোধ হয় সমষ্টিগত ভাবে শিক্ষার প্রচলন হয়। সমষ্টিগত শিক্ষার হবার আরো অন্যান্য কারণের মধ্যে এটি বোধ হয় একটি প্রধান কারণ ছিল। শিক্ষার্থীরা কিছু শিক্ষা লাভ করতে পারলো কি না শিক্ষাগুরুরা সাধারণতঃ সে বিষয়ে গ্রাহ্য করতেন না। কেবল তাঁদের নিজেদের আর্থিক লাভ কতটা হল, সেদিকেই লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকতো। সুতরাং শিক্ষাপদ্ধতির কথা বিচার না করেই সমষ্টিপত শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়ে যায়। এইভাবে ক্রমশঃ "ব্যষ্টিকেন্দ্রিক" প্রথার শিক্ষা প্রায় লুপ্তই হয়ে যায়। বিত্তবান পুরুষেরাই কেবল শিক্ষক বা ওস্তাদদের উচ্চমূল্যের বিনিময়ে ব্যষ্টিপ্রথায় শিক্ষালাভের সুযোগ হয়তো পেত। কিন্তু উপযুক্ত প্রতিভাধার না হওয়ায় কোনই সুফল দেখা যায় নি।

কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও কোন প্রতিভাধর ছাত্র একান্ত অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা সহকারে শিক্ষাগুরুর নিকট গিয়ে সমষ্টিগত প্রথায় গুরুভক্তি সহকারে শিক্ষা-করেও সাফল্যলাভ করেছে, দেখা যায়। গুরু এই সাফল্য দর্শন করে তাকে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আপন ঘরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়ে ব্যষ্টিগত প্রথায় শিক্ষা দিয়ে সত্যকারের উপযুক্ত শিল্পী হতেও নিজের ধারার প্রকৃত উত্তরাধিকারী করেছেন, দেখা যায়। অর্থাভাব যতই থাকুক, অনেক শিক্ষাগুরু এমনও আছেন, যিনি শিষ্যের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা ও বিষয়ের প্রতি প্রকৃত আগ্রহ দেখলে সেই শিষ্যকে কোনরূপ দেনাপাওনার কথা চিন্তা না করেই প্রকৃত শিক্ষা দিয়েছেন ও আপন ধারার শিষ্য করেছেন।

কোন বিখ্যাত সঙ্গীত ধারার বা ঘরানার শিষ্যত্ব গ্রহণ একটি বড় সামাজিক অনুষ্ঠানের ন্যায় হয়। সঙ্গীত শিক্ষার সুসম্পন্ন করার পর শিক্ষাগুরু যখন মনে করেন যে, সেই শিষ্যটি তাঁর সঙ্গীতধারার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে, তখনই তাকে নিজের পরিবারের একজনের ন্যায় গ্রহণ করেন। আমাদের সমাজে অপুত্রক কোন বিত্তবান ব্যক্তির যেমন অন্য কোন পুত্রকে দত্তক হিসাবে গ্রহণ করে নিজের পুত্রের ন্যায় আচরণ করেন এবং এই দত্তক পুত্র গ্রহণ অনুষ্ঠানটি একটি বড় সামাজিক অনুষ্ঠান। সঙ্গীত গুরুর নিকটও শিষ্যত্ব গ্রহণও ঠিক সেইরূপ সামাজিক প্রথা অবলম্বন করা হয়। যাঁরা বড় বড় শিল্পী হয়েছেন অথচ কোন বিখ্যাত সঙ্গীত বংশের বংশধর নন, এমন শিল্পীরা উপরিউক্তভাবে গুরুর নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ করার পর, শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। এইভাবে শিষ্যত্ব গ্রহণ করার নাম "গাণ্ডাবাঁধা" বা "নাড়া বাঁধা"। দত্তক পুত্র, যে বংশের পুত্র হয়, সেই বংশের সমস্ত সম্মানের ও বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, গাণ্ডাবাঁধা শিষ্যও তদ্রূপ ওস্তাদ ঘরানার সঙ্গীতের ধারার সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারী হতেন এবং শিল্পী হিসাবে সঙ্গীত সমাজে সেই ধারার পূর্ণ সম্মান লাভ করতেন। অনেক শিক্ষার্থী সঙ্গীত শিক্ষাগুরু করার পূর্বেই প্রচুর টাকাকড়ি উপঢৌকন দিয়েও প্রথমেই সঙ্গীত ধারার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করত। কিন্তু সব শিক্ষাগুরু এরূপ কর্মে রাজী হন না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থলোভের বশবর্তী হয়ে কোনো কোনো সঙ্গীত শিক্ষককে এরূপ করতে দেখা গেছে। অবশ্য এরূপ করাতে অনুষ্ঠানের আদর্শের সাথে কোনো মিল থাকে না। গাণ্ডা বা নাড়াবাঁধা অনুষ্ঠান কিভাবে সম্পন্ন হয়, তার বিবরণ দেখলেই অনায়াসে বোঝা যাবে।

গাণ্ডাবাঁধা বা নাড়া বাঁধার অর্থ হল শিক্ষাগুরুর সঙ্গীত পরিবারের মধ্যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গণ্ডীবদ্ধ হওয়া, অথবা গুরুর সাথে আত্মীক বন্ধনে যুক্ত হওয়া, অর্থাৎ পুত্রবৎ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানের সর্ব প্রথ.ম শিক্ষাগুরু হয় তার শিক্ষাগুরু বা বংশের অন্তর্গত শিক্ষাগুরুর নিকট হতে সঙ্গীতে পূর্ণত্ব-প্রাপ্ত শিষ্য.কে তাঁর সঙ্গীত পরিবারের অন্তর্গত করার অনুমতি প্রার্থনা করবেন। কারণ শিষ্যটি তাঁর সঙ্গীত ধারা বহন করার উপযুক্ত হয়েছে। এই প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যে সমস্ত সঙ্গীতজ্ঞ এই ঘরোয়ানার অন্তর্ভুক্ত, তাঁরা সবাই উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সঙ্গীত ধারার সঙ্গীতজ্ঞগণ ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকগণও উপস্থিত হয়ে শিক্ষাগুরুর প্রার্থনায় সহানুভূতি জানাবেন। এরপর শুরু হবে আসল কাজ অর্থাৎ "গাণ্ডাবাঁধা বা নাড়া বাঁধা"। শিক্ষাগুরু তাঁর গুরুকে স্মরণ করবেন এবং নতুন একজনকে তাঁদের সঙ্গীত ধারার সম্মান ও সৌষ্ঠব রক্ষার দায়িত্ব অর্পন করতে যাচ্ছেন, তার জন্য নিবেদন জানাবেন। অবশ্য পাত্র অপাত্র বিচার ও নির্ধারণ বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা পূর্বেই স্থির হয়ে থাকবে। তারপর বিদ্যাদেবীর আরাধনা শুরু হবে। এবং শিক্ষা গুরুর সাথে শিষ্যও এই আরাধনায় যোগ দিবেন। ধূপ, ধুণা প্রভৃতি পূর্ণ আচার উপাচার সহযোগে সঙ্গীতধারার অন্তর্ভুক্ত হবার নিয়মানুসারে শিক্ষাগুরু লাল ও হলদে সূতা মিলিয়ে একটি বিশিষ্ট মাপ গ্রহণ করে শিষ্যকে প্রদান করবে এবং শিষ্য সেইটিকে ভক্তিসহকারে তার সাধনার ও শিক্ষার মাধ্যমে তানপুরা বা অনুরূপ যন্ত্রকে সেই লাল হলদে সূতার দ্বারা আবদ্ধ করবেন। তারপর শিক্ষাগুরু তাঁর পুরাতন শিষ্য যাঁরা ইতিমধ্যে এরূপ বন্ধনে আবদ্ধ তাঁদের এই লাল হলদে সূতা দিয়ে আবার আবদ্ধ করবেন। শেষে এই লাল হলদে সূতা নূতন শিষ্যের দক্ষিণ হস্তে তিন পাক জড়িয়ে গাঁট বাঁধবেন। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে শাস্ত্রীয় কিছু মন্ত্রও পাঠ করা হবে। এরপর শিক্ষাগুরুর দক্ষিণ হস্ত ও নূতন শিষ্যের দক্ষিণ হস্ত একত্রে রেখে আবার কিছু মন্ত্র গুরু শিষ্যকে দিয়ে পাঠ করাবেন। তারপর শিক্ষা বিষয়ক প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পালা। অর্থাৎ গুরু তখন শিষ্যকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান যে, সে সর্ব সময়ে তার শিক্ষার আদর্শের কথা স্মরণ রাখবে এবং যে বিষয়বস্তুর শিক্ষা গ্রহণ করার দায়িত্ব নিচ্ছে তা সর্বশক্তি দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করে তার সম্মান ও সৌষ্ঠব রক্ষা করবে। কোনো অবস্থাতেই তার আদর্শের কথা বিস্মৃত হবে না। এরূপ ভাবনা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মনে রেখে গুরু আদর্শ বজায় রাখবে শিক্ষা গুরুও কোনো প্রকার বিনিময়ের আশা মনের মধ্যে পোষণ করবেন না এবং শিষ্যের যাবতীয় শিক্ষাবিষয়ক দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিষ্যের ভরণপোষণের দায়িত্বও শিক্ষাগুরুর উপর ন্যাস্ত হতে দেখা গিয়েছে। যাহোক এই প্রতিজ্ঞা বদ্ধের পর, গুরু শিষ্যকে নিজ হস্তে কিছু প্রসাদ খাওয়াবেন এবং শিষ্যও তারপর নিজ হস্তে গুরুকে আরো কিছু শুভানুষ্ঠানের প্রসাদ ভক্ষণ করাবেন। শেষে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রসাদ বিতরণ করতে হবে শিষ্যকে। এই শিষ্য সবার সামনে গুরু দক্ষিণা প্রদান করে গুরু প্রণাম করবে ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করবে। সর্বজন সম্মুখে গুরু এবার শিষ্যকে কিছু সঙ্গীত শিক্ষা প্রদান করবেন। এইভাবে একটি পূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠানের ন্যায় নিয়মকানুনের মধ্য দিয়ে গুরু-শিষ্যের মধ্যে এক পূর্ণ আত্মীয়তা ও প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠতো এবং সেই সঙ্গে গুরুভক্তির মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ পূর্ণরূপে ও দ্রুতগতিতে চলতে থাকত। আর গুরুর উপরও শিষ্যকে তৈয়ারী করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বর্তাত। এই ধরণের বন্ধন ও শিক্ষা গ্রহণের ফল সাধারণ ক্ষেত্রে অশুভ হয় নি। কিন্তু যখন গুরু-শিষ্যের মধ্যে অর্থ বিনিময় ও শিক্ষা ব্যবস্থার এক উৎকট রূপ দেখা দিয়েছিল, তখন এই সমস্ত বন্ধনের দ্বারা প্রকৃত সম্পর্ক ও শুভ লক্ষণের পরিবর্তে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর প্রকৃত অর্থ বিপরীত রূপ ধারণ করেছে। তবে মোটামুটিভাবে এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভালই ছিল এবং শিষ্য যে কোনো অবস্থার মধ্যেই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করত এবং সঙ্গীতের মান বরাবর একটি নির্দিষ্ট স্তরে থাকতো। শিষ্যের প্রতিভা যদি অনন্য সাধারণ হতো তবে শিক্ষা গুরুর প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গীত, শিষ্যের মধ্য দিয়ে এক অভিনবত্ব প্রকাশ করত। আর তা না হলেও সঙ্গীতের মান অন্ততঃ নির্দিষ্টমানের নিম্নে নামত না। অর্থাৎ সঙ্গীতের একটি সাধারণ মান বজায় থাকতো।

প্রত্যক্ষ শিক্ষা কিভাবে শুরু হত তা দিকে নজর দিলে দেখতে পাওয়া যায় শিষ্যকে সর্বপ্রথমে সুরব্রহ্ম সাধনায় লিপ্ত, অর্থাৎ গলার যে মধ্যস্তরে আমরা কথাবার্তা বলে থাকি ঠিক সেই স্তরের একটি স্বরকে অবলম্বন করে তাকে সুরে পরিণত করার চেষ্টা এই অভ্যাস দ্বারা একটি স্বরকে গলা হতে সংযত ভাবে নির্গত করতে ও শ্বাস প্রশ্বাসের শক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করতো। সাধারণতঃ আমাদের কণ্ঠস্বরকে ইচ্ছামত নির্দিষ্ট কম্পন সংখ্যায়, অর্থাৎ কোন একটি নির্দিষ্ট সুরে স্থির রাখতে আমরা অভ্যস্ত নই, আর শ্বাস-প্রশ্বাসের দৈর্ঘ্যও পরিমিত পরিমাণে থাকে না। তাই তাকে সংযত করতে ও শ্বাস প্রশ্বাসের দৈর্ঘকে পরিমিত অবস্থায় আনার জন্য প্রত্যহ কিছু অভ্যাস দরকার। এই অভ্যাসের প্রশস্ত সময় ছিল ব্রহ্মমুহূর্ত অর্থাৎ সূর্যোদয়ের সময় বলে জানা যায়। প্রথম অবস্থায় শুরু হত স্বল্প সময়ের অভ্যাস। যখন দেখা যেত কণ্ঠস্বর ও শ্বাসপ্রশ্বাস কিছুটা সংযত হয়েছে, তখন অভ্যাসকাল কিছু কিছু করে বর্দ্ধিত করা হতো। প্রথম স্তরে সপ্তস্বরের একটি সুরের উপর নির্ভর করে এই অভ্যাস চালু থাকতো। এই সময় শিক্ষাগুরু শিষ্যের সঙ্গীত অভ্যাসের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। কারণ সঙ্গীতের উপযোগী সুকণ্ঠ অর্জন করতে যে পদ্ধতি-সম্মত কণ্ঠস্বরের প্রকাশ বা নির্ভুল স্বর লাগাবার যে কৌশল, তা শুরু হতেই ঠিক ভাবে অভ্যস্ত না হলে পরে কণ্ঠস্বর সাধনা শারীরিক শক্তির সমতা বজায় না রেখে, সীমার বাইরে চলে যায় তো কণ্ঠস্বর বিনাশের সম্ভাবনা থাকে এবং গায়কের কণ্ঠস্বরের বিনাশ হলে গায়কের আসল ঐশ্বর্যই বিনষ্ট হয়। তাই এই সময় শিক্ষাগুরুর প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে স্বর-সাধনার অভ্যাস অল্প হতে বৃদ্ধি করা হত। আমরা সাধারণতঃ দেখি কোন গায়ক বা সঙ্গীত-শিল্পী সঙ্গীত পরিবেশনায় ঘটনাধিক সময় তাঁর কলা প্রদর্শন করতে থাকেন বিনা দ্বিধায় এবং কোনরূপ কণ্ঠস্বরের ক্ষতি বা অধিক সময় চিৎকারের ফলে কণ্ঠস্বরের বৈকল্য আসে না। আমাদের মনে স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে যে, আমরা অধিক সময় কথা বল্লে পর বা চিৎকার করলে আমাদের কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে যায়, কিন্তু গায়ক বা শিল্পীরা ক্রমাগত ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান করলেও অর্থাৎ চিৎকার করলে, কোন অসুবিধা বোধ করেন না বা কণ্ঠস্বরের বিকৃতি না ঘটার কারণ কি? গায়ক বা শিল্পী সঙ্গীত শিক্ষার প্রথম পর্ব হতেই পদ্ধতি অনুসারে কণ্ঠ প্রয়োজন শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা গুরুর নিকট হতেই শিক্ষা করে, তবে ঘটনাধিক কাল সঙ্গীত পরিবেশন করার যোগ্যতা অর্জন করেন। নচেৎ প্রথমাবস্থাতেই যদি ঘণ্টাধিক কাল গান করার চেষ্টা করতেন, তাহলে সাধারণ মানুষের ন্যায় গায়কের কণ্ঠস্বরও বিকৃত হত। এছাড়া মানুষের কণ্ঠস্বরে কয়েকটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থাকে। যা সবার কণ্ঠস্বরের সাথে এক নয়। কোন কোন কণ্ঠস্বর গাম্ভীর্যপূর্ণ আবার কোন কোনটি গম্ভীর নয়। যে কণ্ঠস্বরের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মধ্যে নিম্ন কম্পন সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাই গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠস্বর, অর্থাৎ নীচু স্বরের উপযোগী কণ্ঠস্বর। এরূপ কণ্ঠস্বর যুক্ত শিল্পী নীচু সুরে গান করলে সুরগুলি তার কণ্ঠে বেশ উজ্জল ও লালিত্যপূর্ণ হয়। আবার সেই শিল্পী উপর দিকের সুরগুলিতে কণ্ঠস্বরের নির্দিষ্ট সীমানা ছাড়িয়ে গেলে সুরের মিষ্টত্ব নষ্ট হবে এবং সুর কর্কশ প্রতীয়মান হবে ও কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। সেজন্য কণ্ঠস্বরের উপযোগী সুর অর্থাৎ যাকে ইংরাজীতে Scale বলা হয়, তার যথাযথ নির্বাচন হওয়া বিশেষ দরকার। আবার কোন কোন কণ্ঠস্বর উচ্চকম্পন সংখ্যাযুক্ত দেখা যায়। অর্থাৎ উঁচু সুরের বা scale-এর কণ্ঠস্বর অধিক উজ্জল ও মিষ্টতা লাভ করে। সুর উঁচু হওয়ার দরুন, কণ্ঠস্বরে আদৌ বিকৃত ভাব পরিলক্ষিত হয় না। এইরূপ কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্য, উত্তরাঙ্গের রাগে এবং উত্তরাঙ্গে বিস্তার করলে কণ্ঠস্বরে কোন প্রকার আঘাত লাগা বা ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। বরং নীচের দিকে এরূপ কণ্ঠস্বরের প্রকাশ স্পষ্ট হয় না। প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থাকার সাথে সাথে নিয়মমত প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা কণ্ঠস্বরের পরিধির উন্নয়ন অর্থাৎ সুরের উঁচু ও নীচু উভয় স্কেলে গাইবার উপযোগী কণ্ঠস্বর হতে পারে। কিন্তু ঠিক কোন scale বা সুরে গান গাওয়া উচিৎ তা সর্ব সময়ে প্রকৃত শিক্ষাগুরুর নির্দেশে স্থির হওয়া বাঞ্ছনীয়।

স্বরের জ্ঞান শ্রবনেন্দ্রিয়কে শিক্ষিত করে তোলার জন্য প্রথমে একটি সুরকে নিয়েই স্বর সাধনা সুরু হত। একটি স্বর ভালভাবে আয়ত্বে আনতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু' তিন মাস লেগে যেত। আবার ততোধিক সময় লাগতেও দেখা গেছে। কিন্তু ধৈর্য সহকারে শিষ্য শিক্ষা গুরুর পরিচালনায় এভাবে একটি একটি স্বরের উপর সাধনা চালিয়ে যেত, যতদিন শিক্ষাগুরু নির্দেশ না দিতেন। শিক্ষাগুরু একটি সুরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না হওয়া পর্যন্ত বা স্বর কণ্ঠের আয়ত্বে না আসা পর্যন্ত কোনো ক্রমেই শিক্ষা আগে বাড়াতেন না। এই তালিম বা শিক্ষা পদ্ধতি আজকের দিনে ছাত্রদের নিকট হয়তো অচল অবস্থার সৃষ্টি করবে এবং ছাত্রেরা বিরক্তি বোধ করবে। এক একটি স্বর ষড়জ ঋষভ গান্ধার প্রভৃতি সুরে, মাসের পর মাস সাধনার দ্বারা সুরের উপর যে দৃঢ়তা লাভ হতো, কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না। ওস্তাদ বা শিক্ষাগুরুর সাথে থাকা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কালীন, ছাত্রের বা শিষ্যের শিক্ষাগুরুর গৃহে বা অন্যত্র, কোনো সঙ্গীতের আলোচনায় বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গীত প্রায়শই শোনার সৌভাগ্য হত এবং তার সঙ্গীতের শিক্ষার সাথে উচ্চমানের সঙ্গীত শোনার সুযোগ ও পরিবেশের মধ্যে, নানা দিক থেকে শিক্ষিত হবার সুযোগ ও সুবিধা থাকতো। এই পরিবেশের মধ্যে থাকাকালীন প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার সাথে যখন সুরজ্ঞান লাভ হত তখন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গীত ও রাগরাগিনীর আলাপ প্রভৃতি যথেষ্ট শোনা থাকায়, পরবর্তি শিক্ষার সময় অতি সহজেই সেগুলি কণ্ঠের আয়ত্বে এসে যেত।

এরপর আরম্ভ হত, বিশিষ্ট কয়েকটি মেলের মধ্য দিয়ে সুরের আরোহণ অবরোহণ চলনের অভ্যাস। স্বরের উপর দখল হয়ে থাকায় এবার এক সুর হতে অন্য সুরে চলার গতি ক্রমশঃ একটু করে বাড়ানোর অভ্যাস করানো হত। প্রথম দিকে শিক্ষা শুদ্ধ স্বরের উপরই নিবদ্ধ থাকতো। এরপর ঋষভ গান্ধার ধৈবৎ নিষাদ ও মধ্যম প্রভৃতি স্বরের কোমল ও তীব্ররূপগুলি সংযুক্ত করে বিভিন্ন অলঙ্কারিক গানের অভ্যাসের মধ্য দিয়ে স্বর সঞ্চারের শিক্ষা ও অভ্যাস চলতো। এভাবে শিক্ষা আরো কিছুদিন চলার পর ছোট ছোট স্বর মালিকা, যেগুলি তাল ও লয়ের মধ্যে নিবদ্ধ এই রকম স্থায়ী ও অন্তরাযুক্ত গানগুলির শিক্ষা চলত। এ সময় ছাত্রদের লয় এবং তান শিক্ষা অভ্যাসের জন্য বিশেষ বিশেষ "সারগম"এর ছন্দ ও লয়কারীযুক্ত তান শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষা দেওয়া কালীন কোনো সীমাবদ্ধ সময় রাখা হত না। কিন্তু বর্তমানে সীমাবদ্ধ সময়ে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। শিক্ষাগুরুর সাথে শিষ্য থাকতেন এবং যখনই শিক্ষাগুরু শিক্ষা দিবার জন্য শিষ্যকে ডাকতেন তখনই শিষ্যকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হত এবং শিক্ষা গ্রহণ আরম্ভ হলে শিক্ষাগুরু নিজে শিক্ষা দেওয়া সমাপ্ত না করলে বা তার মন সন্তুষ্ট না হলে শিক্ষা অব্যাহতভাবে চলতে থাকতো। তাঁদের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে আজকের ন্যায় কোনো "পাঠ্য তালিকা" বা 'সিলেভাস্' বলে থাকতো না। তাঁরা শিষ্যের প্রতিভা ও কণ্ঠস্বরের উপযুক্ততা লক্ষ্য করে ও উচিত বিবেচনার দ্বারা শিক্ষা চালিয়ে যেতেন। শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁদের এই কথা বলতে শোনা যেত যে, শিক্ষা পদ্ধতির কোনো একটি সাধারণ নিয়ম কখনও সকলের প্রতি প্রযোজ্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয় না। কারণ একটি ছাত্রের বা শিক্ষার্থীর প্রতিভা আর একটি ছাত্রের বা শিক্ষার্থীর সাথে তুলনায় কোনো দিনই সমান দৃষ্ট হয় না। তাই তাঁরা শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে সাধারণ নিয়ম বলে কিছু স্থির নিয়ম মানা সমীচিন মনে করেন নি। কারণ তাতে হয় কোনো কোনো ছাত্রের পক্ষে সুবিধা হবে বা অন্য কোনো ছাত্রের পক্ষে অসুবিধাকর হবে, এরূপ মনে করতেন।

শিক্ষার সময় প্রথম দিকে ছাত্রদের ঔপপত্তিক বিভাগের দিকে বিশেষ নজর রাখতে দেওয়া হত না। অর্থাৎ তারা শিক্ষা করার সময় যে সব স্বরবিন্যাস ও অলঙ্কার শিক্ষা করতো, তার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, নামকরণ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হত না। কোনো স্বর সংযোগে কি রাগ বা রাগিনীর সৃষ্টি হয় বা স্বরের অলঙ্কার রচনায় কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হল বা কিভাবে স্বরমালাগুলি গ্রথিত হয়েছে সে বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন হত না। সে সময় শিক্ষাগুরু শিষ্যকে নিজ কণ্ঠস্বরের দ্বারা যে স্বরবিন্যাস স্বরালঙ্কার ও রূপ শিক্ষা দিতেন, সেই ভাবেই শিষ্যকে গুরুর নিকট হতে নিজ কণ্ঠে, সেইরূপ গ্রহণ করতে হত। তারপর এগুলি পূর্ণ শিক্ষা অর্জন করলে সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয়ের আলোচনা ও শিক্ষা আরম্ভ হত। ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে সঙ্গীতের আসল রূপ শিষ্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হত। সঙ্গীত শিক্ষার (অতি প্রাচীন নয়) পুরাতন শিক্ষা পদ্ধতি এরূপ ছিল বলে বর্তমান বিশিষ্ট সঙ্গীতের ধারক বা শিক্ষা গুরুদের নিকট হতে জানা যায়। এ বিষয়ে শিক্ষা গুরুদের মতামত যতদূর জানা যায় যে, বিজ্ঞান চারুশিল্পকলার ব্যাকরণ মাত্র। চারুকলা শিল্প নিজে বিজ্ঞান বা উপপত্তি নয়। তাই প্রকৃত শিল্পকলার, চিত্রের রূপ যেমন চোখে না দেখতে পেলে তার সম্বন্ধে কোনো সঠিক ধারণা জন্মে না, তেমনই সঙ্গীত, যা শ্রবনেন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধনীয়, তার আসল রূপ শ্রবনেন্দ্রিয়ের দ্বারা মনের মধ্যে উপলব্ধি করতে না পারলে কোনো দিনই তার সূক্ষ্ম শিল্প চারুকলার জ্ঞান অর্জিত হবে না। এ জন্যই বিশেষ করে সঙ্গীত চারুকলার আসল রূপ বাঁচিয়ে রাখতে গেলে, চাই "গুরুমুখী বিদ্যার" শিক্ষা। গ্রন্থ হতে সঙ্গীতকে উদ্ধার বা রূপ দেবার চেষ্টা অমূলক। অবশ্য যে কোন বস্তুকে সঞ্জীবিত করে রাখতে হলে, পদ্ধতি সহকারে পরিচর্যার দরকার আছে। তেমনই সঙ্গীতকে রক্ষা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করতে হলে এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে উপপত্তির ও বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। সঙ্গীত কলা চর্চা যে একটি কঠিন সাধনার বস্তু, সে বিষয়ে কোন দ্বিমত হবার কারণ নাই। তাই সমস্ত আয়াস সাধ্য সাধনায় যেমন প্রকৃষ্ট মার্গের সন্ধান পাওয়া যায়, ঠিক সেই প্রকার এই সঙ্গীত চারুকলার সাধনায়ও একটি বিশিষ্ট পদ্ধতির বা পথ নির্দেশের প্রয়োজন আছে। ইহাই "বর্তমানে বিজ্ঞান বা উপপত্তি" বলে মানা হয়।

———

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক কালে সঙ্গীতের সমস্যা ও শিক্ষা পদ্ধতি

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে এবং উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে, সঙ্গীত অভিজাত সাম্প্রদায়ের লোকের নজরে অত্যন্ত হীনস্তরের শিল্পকলা বলে বিবেচিত হত। এই সময়টিকে আমরা আমাদের সমাজের অন্ধকার ময় যুগ বলে মনে করতে পারি। এজন্য বোধহয়, সাধারণ লোকের মনে সঙ্গীত শিল্পী হওয়া বা সঙ্গীতের পেশা গ্রহণ করা যেন সমাজের নিয়ম বহির্ভূত কাজ বলে গণ্য হত। এই ভাবে সঙ্গীত কলাকে যে অবজ্ঞার চোখে দেখা হত, ফলস্বরূপ এই সঙ্গীত যা ভারতীয় কৃষ্টির এক মহান দিক, তা অবহেলিত হয়ে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সঙ্গীতের বা সঙ্গীত শিল্পীর সাধারণ সমাজে কোনরূপ সম্মান বা সামাজিক মর্যাদা ছিল না। যে মহান শিল্পকলা ভারতীয় মুনিঋষি কর্তৃক আমাদের পবিত্র বেদপুরাণে উজ্জ্বল আলোকে সমাদৃত ছিল, এবং যাবতীয় উৎসব অনুষ্ঠানে প্রাধান্য লাভ করতো, তা তৎকালীন সমাজে তার কিয়ৎ পরিমাণ স্বীকৃতও পায়নি। যাঁরা এই মহান সঙ্গীতের পূজারী, তাঁরা তদনীন্তন সমাজে অনাদৃত ছিল। এই তৎকালে সঙ্গীত যথাযথ ভাবে রূপ পরিগ্রহ করতে পারিনি এবং সাধারণ সমাজ ও এই মহান সংস্কৃতির প্রতি উদাসীন ছিল। কিন্তু এই অবস্থা চিরকাল চলতে পারে না। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সৌভাগ্যক্রমে সংস্কৃতির আলো জাগরিত হল। ক্রমশঃ সংস্কৃতির নানা বিষয়ের উন্নতির সাথে সাথে, সঙ্গীত কলার প্রতিও সাধারণের দৃষ্টি পরিবর্তন লাভ করল এবং সঙ্গীতের উন্নতি আসার আলোকপাত হল। পরিণামদর্শী সমাজের লোকের, সঙ্গীতের প্রতি সুরুচি উদ্রেক হল এই চারুকলার দিকে সাধারণের মন আকৃষ্ট হতে লাগলো। বিভিন্ন বিভাগের শিল্পকলার ও বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সাথে সামাজিক শিক্ষার মধ্যে সঙ্গীতের অপরিহার্য প্রয়োজন ও সংস্কার সাধনের প্রয়োজনের দিকটা, অনুভূত হতে লাগলো। মনোবৃত্তি ও সর্বসাকুল্যে মানুষকে যদি সার্থক মানুষ গড়ে তুলতে হয়, তাহলে সঙ্গীতকলাকেও যথাস্থানে ও প্রকৃত মর্যাদা সহকারে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই উপলব্ধি বর্তমান সমাজের শিক্ষাবিদ্‌দের বোধ হয়েছিল এবং তাঁরা সেইভাবে নানা পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। সাধারণ শিক্ষার মধ্যদিয়ে, চরিত্রের ও শিক্ষার মান উন্নত করতে হলে এই সমস্ত বিভিন্ন ভারতীয় চারুকলার সাথে সাধারণ শিক্ষার একটা আত্মিক যোগ থাকা দরকার এবং সেইভাবে আধুনিক শিক্ষাজগৎ, শিক্ষার মানকে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে উন্নতির দিকে পরিচালিত করা হয়েছে।

আমাদের দেশের স্বর্ণযুগের ইতিহাসে এই ভারতেরই ৬৪টি প্রকার চারুকলা শিল্পের ও ১৪ প্রকার বিজ্ঞান শাখার সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল দেখা যায়। তাই সে যুগে বিদেশ হতে উৎসাহী শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে জ্ঞান আহোরণে ও নিজেদের বিভিন্ন চারুকলা শিল্পে ও বিজ্ঞানে বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তুলতে এখানেই আসতেন ও থাকতেন। এ বিষয়ে আরো অনুধাবন করতে হলে আমরা যদি প্রাচীনকালের দিকে এবং অষ্টদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর চিত্রকলা ও স্থাপত্য শিল্পকলার দিকে দৃকপাত করি তা হলেও আমরা অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবো যে, আমাদের চিত্রকলা, স্থাপত্যবিদ্যা, সঙ্গীত নৃত্য প্রভৃতি চারুকলা কিরূপ উচ্চ পর্যায়ে উন্নত ছিল। অজন্তা, ইলোরার কীর্তি, বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদ্‌দের অমর রচনা, যেমন—নায়ক বৈজু, নায়ক গোপাল, স্বামী হরিদাস, মিঞা তানসেন, অদারঙ্গ, সদারঙ্গ, প্রভৃতি আমাদের পুরাতন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের সাক্ষ্য বহণ করে আসছে।

প্রাণী মাত্রের উপর সঙ্গীতের বিশেষ প্রভাব অনস্বীকার্য এবং তার মনোহারিতা ও সৌন্দর্য সর্বজন বিদিত। যতদূরই এর মধ্যে প্রবেশ করা যায়, ততোই এর গভীরত্ব বেড়ে যায়। কিন্তু খুব কম লোকই এ যুগে দেখা যায় যিনি তাঁর সারা জীবন সঙ্গীতের জন্য উৎসর্গ করেছেন। আবার যিনি তাঁর সম্পূর্ণ জীবন সাধনায় অতিবাহিত করলেন তিনি হয়তো সে পর্যায়ের সঙ্গীতজ্ঞ নন বা কোনো গোঁড়ামির বশবর্তি হয়েছেন।

আবার সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া যেন সমাজবিরোধী কাজ, তাই অন্যান্য বিষয় বস্তুর ন্যায় সঙ্গীতকলা চর্চা করা সহজ কাজ ছিল না। এই সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করেও যাঁরা শিল্পী পদে প্রতিষ্ঠিত হতেন তাদেরও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সমাজের অধিকাংশ লোক সুনজরে দেখতেন না। কেবল সমাজের একাংশ যাঁরা বিশেষভাবে সঙ্গীতপ্রেমী বা সঙ্গীতের প্রভাবে পাগল প্রায় হয়ে যেতেন এবং লোকের সমালোচনা অগ্রাহ্য করতে পারতেন তাঁদের নিকট হতেই কেবল শিল্পীরা সমাদর ও মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হতেন। সমাজের এই অংশের লোকদের মধ্য হতেই সঙ্গীত শিক্ষার্থী আসতো। বহু কষ্টে ও নানারূপ বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে পারলে, তবে সঙ্গীত শিক্ষা করতে পারতেন। এ জন্যই সঙ্গীতকলার ক্ষেত্রে এ যুগে সর্বতোভাবে সঙ্গীতের উন্নতি হতে পারেনি এবং একটি অনুন্নত গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে সঙ্গীত সীমাবদ্ধ রয়েছিল।

এ ব্যাপারে তৎকালীন যেসব গুণী সঙ্গীতজ্ঞ হয়েছিলেন তাঁদের জীবনী অনুসন্ধান করলে পর দেখা যায় যে, সঙ্গীত শিক্ষার জীবনে তাঁদের কি পরিমাণ অসুবিধা ও বাধা পেতে হয়েছিল এবং তা অতিক্রম করতে কিভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। অনুসন্ধান করলে বহু বাস্তব ঘটনারও সন্ধান পাওয়া যায়।

কিন্তু এই অবস্থা চিরকাল চলতে পারে না। সমাজের চিন্তাবিদেরা এই চারুকলার গুরুত্ব অনুভব করলেন ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। সঙ্গীতকলাকে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন শিক্ষার পর্যায়ে যুক্ত করা হল। ক্রমে সাধারণ শিক্ষার সাথে সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা ও অত্যাবশ্যকীয়তা অনুভূত হল। এ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হল। ভারতীয় সঙ্গীতকলাকে সাধারণ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সম্মানজনক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার মূলে, যে সমস্ত বিজ্ঞব্যক্তির জীবনব্যাপী সাধনা ও ত্যাগ দৃষ্ট হয়, তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় বিষ্ণুদিগম্বর পুলস্কর ও স্বর্গীয় বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের দান সর্বস্বীকৃত। পূর্বভারতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র সঙ্গীত রচনার দ্বারা সঙ্গীত জগতে সঙ্গীতকে সমাজে আবার এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন যে, তার প্রভাব আজ সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। স্বর্গীয় বিষ্ণুদিগম্বর ও স্বর্গীয় বিষ্ণুনারায়ণের চেষ্টায় ভারতীয় সঙ্গীত শিক্ষিত সমাজে পূর্ণ মর্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এঁদের চেষ্টায় সঙ্গীতকলা বিদ্যালয় মারফৎ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়। দৈনন্দিন সঙ্গীত শিক্ষার প্রবর্তনের সাথে সাথে সঙ্গীতের মধ্যে সমস্যার যে উদ্ভব হয় নি তা নয়। পূর্বে যেসব শিক্ষার্থী সঙ্গীত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শিক্ষার জন্য নির্বাচিত হত বা সুযোগ লাভ করতো তারা তাদের সারাজীবন ধরে কেবল সঙ্গীতের সাধনায় মগ্ন থাকতো। অন্য কোনো বিষয় বস্তুর দিকে বা অন্য কাজের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকতো না। কিন্তু বর্তমানকালে শিক্ষার নানা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গীতকে একটি শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। ফলস্বরূপ সঙ্গীত শিক্ষার মধ্যে নিবিষ্ট ধ্যান সহকারে সঙ্গীত শিক্ষার অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং সঙ্গীতের মান নিম্নগামী হবার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। এভাবে সঙ্গীতের বহুল প্রচারের সাথে সঙ্গীতের মানের অধোগমণের দিক বিশেষভাবে লক্ষ করার মত বিষয়। কিন্তু প্রকৃত সঙ্গীতজ্ঞ হয় তারাই যে সব শিক্ষার্থী সঙ্গীতের প্রকৃত মান বজায় রাখতে পারে, সঙ্গীতকে তাদের জীবনের একমাত্র সাধনার লক্ষ্য মনে করে। আর তা না করে শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি ঐচ্ছিক বিষয়বস্তু হিসাবে সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ বোধহয় সঙ্গীতের প্রকৃত মান রক্ষার সহায়ক নয়। শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে সঙ্গীতকলাকে নির্বাচন করার সময় কয়েকটি মৌলিক লক্ষ্যের উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন হয়। এভাবে সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের দুভাগে ভাগ করা হয়। একদল যারা সঙ্গীতকে তাদের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে এবং অন্যদল যারা শিক্ষার নানা বিষয়ের সাথে সঙ্গীতকে একটি বিষয় হিসাবে গ্রহণ করবে। এই দুই দলের মধ্যে সঙ্গীতের শিক্ষাক্রম, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের হয়। যারা সঙ্গীতকলাকে বিশেগভাবে একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় রাখে, তাদের সঙ্গীত পাঠ্যক্রম বা শিক্ষাক্রমে সঙ্গীতের প্রতিটি বিষয় ও বিভাগের সাথে যাতে সম্যক জ্ঞান হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখে পাঠ্যক্রম রচিত হয়। আর যারা শিক্ষার নানা বিষয়ের সাথে সঙ্গীতকে, একটি শিক্ষার বিষয় করবে, তাদের সঙ্গীতের পাঠ্যক্রম এমনই হয়, যাতে সঙ্গীত সম্বন্ধে মোটামুটি একটা জ্ঞান হয়। স্কুল বিভাগের শিক্ষার্থীরা নানা বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গীত শিক্ষা করার পর, সঙ্গীত বিষয়ের উপর অধিক আকর্ষণ ও প্রতিভা দেখা দিলে, সঙ্গীত শিক্ষার জন্য তারাই মুখ্যতঃ মনোনীত হয়।

শিক্ষার্থীদের কণ্ঠস্বর, প্রতিভা, স্বাভাবিক জ্ঞান ও গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রভৃতি বিচার করে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রথম দলটি হল—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যেসব ছাত্রছাত্রী সুকণ্ঠের অধিকারী এবং সেই কণ্ঠস্বর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের উপযোগী এবং পদ্ধতিযুক্ত বিষয়বস্তুর শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম বা মেধাবী শিক্ষার্থী।

দ্বিতীয় দল—যারা সুকণ্ঠের অধিকারী, কিন্তু শিক্ষা বিষয়বস্তুর শিক্ষা গ্রহণে ততোটা তৎপর নয়।

তৃতীয় দল—সুকণ্ঠযুক্ত নয়, কিন্তু শিক্ষা বিষয়বস্তু সম্বন্ধীয় প্রতিভার অধিকারী।

চতুর্থ দল—সুকণ্ঠযুক্ত এবং প্রতিভা উভয়টিতেই বঞ্চিত, কিন্তু সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও সঙ্গীত শিক্ষায় আগ্রহী। প্রভৃতি উপরিউক্ত গুণাগুণ সম্পন্ন শিক্ষার্থীর দল আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির অন্তর্গত দেখা যায়। প্রথম দলটির শিল্পী এবং শিক্ষক উভয় ক্ষেত্রেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখা যায়। দ্বিতীয় দলে সাধারণ সঙ্গীত শিল্পী হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। তৃতীয় দলে সাধারণ সঙ্গীত শিক্ষকের স্থান পূরণ হচ্ছে। আর চতুর্থ দলে সঙ্গীতের সমঝদার শ্রোতার সংখ্যা বাড়ছে।

উপরিউক্তভাবে বর্তমানকালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ও সাধারণ সঙ্গীত বিদ্যালয়ে সঙ্গীতের শিক্ষা চলছে এবং উপরিউক্ত ফল পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সাধারণ বিদ্যালয়ে সঙ্গীত একটি শিক্ষার বিষয়বস্তু হওয়ায় সঙ্গীত সাধারণের মধ্যে বিশেষ সম্মানের সাথে জনপ্রিয়তা ও সমাদর লাভ করছে এবং সঙ্গীত শিল্পীরাও সম্মানের সাথে জীবন যাপন করতে সক্ষম হচ্ছেন। বর্তমনে শিক্ষা পদ্ধতিতে সঙ্গীতের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে, তার সাথে ভাল অভিজ্ঞ সঙ্গীত শিক্ষকেরও চাহিদা বাড়ছে। সঙ্গীত শিক্ষা, বিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান পাওয়ায়, সঙ্গীত শিক্ষা করার সুযোগ জনসাধারণের অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে সঙ্গীত পিপাসু শিক্ষার্থীর সঙ্গীত শিক্ষা করা এক দুরূহ ব্যাপার ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদার প্রশ্ন জড়িত হত। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে আজ সঙ্গীতের সুজন্য পূর্বের ন্যায় অবিধা বোধ করতে হয় না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বৈজ্ঞানিক জগতে বিজ্ঞানের সাহায্যে অর্থাৎ রেডিও, রেকর্ড ফিল্‌মস্‌ প্রভৃতির দৌলতে ভারতীয় সঙ্গীতকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার অনেক সুযোগ বেড়েছে এবং সেই সাথে শিক্ষার্থীরও বহু জিনিষ শোনার ও জানার সুযোগ অনেক অংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকের যুগে সঙ্গীত বিষয়ক গবেষণা ও আবিষ্কারও পিছিয়ে নাই। নূতন নূতন শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রম রচিত হচ্ছে। এই ব্যবস্থার পরবর্তি ফল বিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পঞ্চম অধ্যায়

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সুর সাধনা

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বরসাধনা, ভারতে ভারতীয় সঙ্গীতের ন্যায় পুরাতন নয়। ভারতীয় সঙ্গীতে গীতবাদ্য ও নৃত্য ও নাট্যশাস্ত্রের প্রচুর আলোচনা ও বিষয়বস্তুর নির্দেশ আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বর সাধনা, শারীরিক সম্বন্ধ বজায় রেখে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে নজর রেখে কোনো শাস্ত্রকার শাস্ত্র রচনা করেছেন কিনা তার নজীর নাই। তবে সঙ্গীতজ্ঞের বা গায়কের কণ্ঠের বিশেষত্ব, গুণ প্রভৃতির আলোচনা কখন কখন হয়েছে। পরবর্তি যুগেও ওস্তাদ ও পণ্ডিত মহলে স্বরসাধনার কিছু পদ্ধতির কথা শোনা যায়। তাঁদের মতানুসারে কণ্ঠসাধনা বা স্বরসাধনার প্রথম এবং প্রধান পদ্ধতি হল "খরজ-সাধনা"। অর্থাৎ উদারা বা মন্দ্র সপ্তকে গলার অভ্যাসই "কণ্ঠসাধনা বা স্বরসাধনা"। ঠিক এই প্রকার গলার অভ্যাস দ্বারা গলার কিছু উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়তো হত, কিন্তু এই প্রকার ক্রমাগত অত্যধিক অভ্যাস গলার স্বর মধুর ও লালিত্যপূর্ণ হওয়ার বদলে ধরা, ভারী ও কর্কশ আওয়াজেরই উৎপত্তি হত। এই সব কারণে, অবশ্য সমস্ত গায়ক মাত্রেই নয়, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীর জনপ্রিয়তালাভে বঞ্চিত হবার নানা কারণের মধ্যে ইহা একটি প্রধান কারণ বলা যেতে পারে।

যান্ত্রিক যুগে যন্ত্রের আবিষ্কারের সাথে, রেডিও, মাইক্রোফোন প্রভৃতি আবিষ্কৃত হওয়ায় গায়ক মহলেও তার প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হয়। যন্ত্রের প্রচলনের উদ্দেশ্য হয়তো সঙ্গীতকে অনায়াসে বেশী সংখ্যক শ্রোতার নিকট পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু গায়ক মহলে তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে "মাইক-টেকনিক" নামক "ভয়েসের" উদ্ভব হয়। এই পদ্ধতি হল প্রধানতঃ গলাকে দাবিয়ে ও তার স্বরকে যথা সম্ভব সংযত করে, গান গাওয়া। আর যন্ত্রের সাহায্যে তা পরিবর্দ্ধিত হয়ে সবার নিকট উচ্চ আওয়াজে পরিণত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যন্ত্রের গুণাগুণ হিসাবে আওয়াজও সেরূপ ধারণ করে। আর শিল্পীর আসল পরিচয় চাপা পড়ে যায়। এরূপ ক্রমাগত অভ্যাস কণ্ঠ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে। কণ্ঠস্বরের আয়ুও এতে কমে যায়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চলচ্চিত্রশিল্পী ও কিছু সংখ্যক বেতার শিল্পীর মধ্যে, ইহা বিশেষভাবে পরিদৃষ্টমান। তাদের ধারণা এই প্রথা গানে ভাব সংযোজনা করতে বেশী সহায়ক ও অল্প পরিশ্রম হয়। কিন্তু আসল দিকটার কথা তাঁরা ভুলে যান। ফলস্বরূপ আসল স্বরসাধনার পথ হতে বিপথগামী হয়। প্রকৃত স্বর কণ্ঠ হতে নির্গত না হলে সঙ্গীতের ও তৎসংশ্লিষ্ট সাহিত্যের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না।

ভারতীয় সঙ্গীতে ঘরোয়ানার চলন বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। ঘরোয়ানার উদ্দেশ্য কি এবং তার কি কি বিশেষত্ব থাকলে একটি ঘরোয়ানার সৃষ্টি হয়, তার দিকে দৃষ্টি না রেখেই ভিন্ন ভিন্ন ঘরোয়ানার সৃষ্টি হয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে। বনেদী পরিবারে ঘর বা বাড়ি ভাগাভাগী হলেই পরিবারের বংশজাত পরিচয় যেমন আলাদা হয় না, তেমনি গায়কের সামান্য মতভেদ, ভিন্ন ঘরোয়ানার সৃষ্টি অমূলক। আর নিছক গায়কীর মতভেদ ভিন্ন ঘরোয়ানার নিদর্শন হওয়া উচিত নয়।

সঙ্গীত সমাজে প্রকৃত কণ্ঠের বিনাশ সাধন হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে ঘরোয়ানার গায়কীর বিশেষত্ব দেখাতে গিয়ে। গুরুজী হয়তো যে কোনো কারণে হোক, তাঁর গলার স্বর মিষ্ট বা সুরলালিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছেন বা পারেন নি, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য ও শিল্পকুশলতার দ্বারা প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। কিন্তু শিষ্য তার ঘরোয়ানার বিশেষত্ব দেখাতে গিয়ে তার নিজের সুকণ্ঠের অপব্যবহার করেছেন এরূপ দৃষ্টান্ত বহু দৃষ্ট হয়। যে কোনো বিষয় হোক গুণ অর্থাৎ ভাল জিনিষ নকল করা বড়ই শক্ত। কিন্তু খারাপটা নকল করতে অধিক সময় লাগে না। তাই গুরুজীর শিল্পকুশলতা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করার চেয়ে তাঁর দোষ ত্রুটিগুলি বেশী বিদ্যমান দেখা যায় পুরুষানুক্রমে।

আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশে সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। সাধারণের দৃষ্টি শিল্পীর কণ্ঠের সুরলালিত্যের ও স্বর সাধনার দিকে সচেতন হচ্ছে। এই স্বরসাধনার বিষয়বস্তু নিয়ে পাশ্চাত্য দেশে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। এ সম্বন্ধে তাঁর বহু নির্দেশও পুস্তকাকারে দিয়েছেন ও দিচ্ছেন। যাঁরা এ বিষয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিনা দ্বিধায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শিক্ষা দিচ্ছে পরবর্তি যুগের কর্মীদের প্রতি। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও তাঁদের চিকিৎসার পেশা এই বিষয় বস্তুর উপর নিবদ্ধ রেখে তাঁরা গায়কদের কণ্ঠসাধনার কাজে সহায়তা দিচ্ছেন। এইভাবে অনুসন্ধিৎসু শিক্ষাবিদ্‌গণ, বিশিষ্ট শিল্পীগণ, কণ্ঠসাধনার শিক্ষকগণ, যাঁরা নিজের গলার শারীরিক, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা পূর্ণভাবে নেন নি, তাঁরা চিকিৎসকের সাহায্যে প্রত্যক্ষ কণ্ঠসঙ্গীতের সাধনার পথ ও পদ্ধতি অনুসন্ধানক্রমে লিপিবদ্ধ করেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন। ফলতঃ কণ্ঠসাধনার বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

আমাদের দেশে এই স্বরসাধনার পদ্ধতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে, ত্রুটিপূর্ণ গলার স্বর ত্রুটিশূন্য হয়েছে শিক্ষাগুরুর উন্নত ধরণের শিক্ষকতায়। তাঁরা বলেন, এক বিশেষ ধরণের শিক্ষা পদ্ধতি আছে যার দ্বারা এই দোষত্রুটিযুক্ত গলার স্বর শুদ্ধ স্বরে পরিণত হয়। কিন্তু সেইসব শিক্ষাগুরুর নিকট গিয়ে অনুসন্ধান করলে তাঁদের নিকট হতে গলার "খরজসাধনার" পদ্ধতি ছাড়া, অন্য কোনো বিশেষ ধরণের পদ্ধতির আভাষ জানা যায় না। এ বিষয়ে আরো বিশেষভাবে অনুসন্ধানের পর জানা যায় সুকণ্ঠ ভগবানের দান। যেসব স্বর ত্রুটিযুক্ত তা সুরু হতেই এবং তা ভবিষ্যতে ঠিক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তবে ব্যতিক্রম হিসাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিল্পীর গলার শিল্পকুশলতা সাধনার দ্বারা পরিবর্ধিত হয়েছে। কিন্তু ঠিক কি পদ্ধতিতে তা সমৃদ্ধ হয়েছে, সে বিষয়ে শিল্পী, নিজেই জানেন না। অনেক সময় আমরা শুনি যে, ওস্তাদরা তাঁদের বিশেষত্ব বজায় রাখার জন্য তাঁরা তাঁদের পদ্ধতি অন্য কাকেও জানতে দেন না। কেবলমাত্র তাঁদের নিজের পুত্র বা পুত্রবৎ শিষ্য ছাড়া। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, পিতার কণ্ঠে যে শিল্পকুশলতা ও সুরচাতুর্য রয়েছে বা ছিল, তা তাঁর পুত্রবৎ শিষ্যের বা পুত্রের কণ্ঠে নাই। অবশেষে তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হন তাঁদের স্বরসাধনার দূরদৃষ্টির অভাব এবং মনে করেন সুকণ্ঠ ভগবানেরই দান। পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিদ সম্বন্ধেও তাঁরা একই মত পোষণ করেন।

পাশ্চাত্য দেশে একটি গবেষণাকারীর দল যাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ, কণ্ঠধ্বনি শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ, শ্রবণশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ, শরীর ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যাবিদ, শারীরিক বিদ্যাবিদ্ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের সাহায্যে গবেষণার দ্বারা কণ্ঠসাধনার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ও স্বর সাধনার যে সব তথ্য আবিষ্কার করেন, তার দ্বারা ভগবান প্রদত্ত কণ্ঠস্বরের যুক্তি ছিন্ন হয়ে যায়। তবে কণ্ঠস্বরের যে গুণাগুন থাকে, তা প্রকৃতিগত বলা যেতে পারে। তাকেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ও কণ্ঠের ধ্বনিশাস্ত্রের দিকে নজর রেখে শিক্ষিত করতে পারলেই সুন্দররূপে ও সুষ্ঠুভাবে সুকণ্ঠ অর্জন করা যায়।

এখন প্রশ্ন উঠে, ভারতীয় কণ্ঠসঙ্গীতের স্বরসাধনায় পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় কি না। কারণ এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। তাই সেই পদ্ধতি ভারতীয় কণ্ঠসঙ্গীতের স্বরসাধনায় গ্রহণ করলে ভারতীয় কণ্ঠসঙ্গীতে পাশ্চাত্য কণ্ঠসঙ্গীতের প্রভাব এসে যাবে এবং ভারতীয় কণ্ঠসঙ্গীতের আসল রূপ নষ্ট হবে, এরূপ ধারণা অনেকেই পোষণ করেন মনের মধ্যে। আর ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ঠিক ঐরূপ কোনো গবেষণা হয় নি পূর্বে। বর্তমানে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ও বৈজ্ঞানিক চিন্তায় সঙ্গীতজ্ঞগণ নানা গবেষণায় যুক্ত আছেন। পাশ্চাত্য দেশে অন্যান্য বিষয়ের উন্নতির সঙ্গে সমতা বজায় রেখে কণ্ঠসঙ্গীতের ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা উন্নতি সাধন করা হয়েছে। তাই ভারতীয় কণ্ঠসঙ্গীতে স্বরসাধনার ক্ষেত্রেও উন্নতি সাধিত হওয়া দরকার।

এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, আমাদের ভারতীয় কণ্ঠসঙ্গীতের স্বরসাধনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব আমরা নিজে প্রবেশ না করালে আসার কোনো সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ে অন্যান্য যুক্তি ছাড়াও সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, কোনো প্রকার শারীরিক অসুস্থতা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায়, শরীরের রূপ বদল হয় কিনা। আর যে বিষয়ে যে দেশে গবেষণা বেশী হয়ে, তার উন্নতি সাধিত হয়েছে, ঠিক সেই বিষয়ে সেই দেশের নির্দেশ বা পরামর্শ পৃথিবীর সর্বদেশের সকল লোকই গ্রহণ করে থাকে। তাই এই কণ্ঠসঙ্গীতের স্বরসাধনার ক্ষেত্রে তাঁদের নির্দেশ, কোনো ক্ষতির কারণ হওয়া উচিত নয়। মানুষের দেহের অভ্যান্তরীণ গঠন ও শ্বাসপ্রশ্বাস প্রণালী প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য ভেদে ভিন্ন নয়। যে প্রথায় পাশ্চাত্য শিল্পীর কণ্ঠস্বর সমৃদ্ধ হয়, ঠিক সেই প্রথায় প্রাচ্যের শিল্পীর কণ্ঠস্বর সমৃদ্ধ না হবার কোনো কারণ নাই। তবে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞ স্বরসাধনার ও ধ্বনি-শ্রবণ-শাস্ত্রের শিক্ষকের নিকটেই শিক্ষা গ্রহণ সহায়ক, অন্যথায় বিপরীত ফল দৃষ্ট হয়।

আমাদের কণ্ঠের মধ্যে স্বরের উৎপত্তির স্থলে তিনটি প্রধান বিভাগ দৃষ্ট হয়। তার বৈজ্ঞানিক নাম, Actuator, vibrator ও Resonator। এই অংশগুলির ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ না থাকায় এবং বাংলায় এর যা অনুবাদ আছে তা ওই নামকরণগুলির বাংলা প্রতীক নামকরণ হিসেবে যতদিন না নির্ধারিত হবে, ততোদিন সহজবোধ্য হবে না। বর্তমানে এই অবস্থায় ব্যাখ্যার ও প্রকাশের সুবিধার জন্য, আসল ইংরাজী নামগুলির সাহায্য গ্রহণ করা হল। আর পাঠকদের তুলনামূলক আলোচনার সময় এই বিষয়বস্তুর যে সব গ্রন্থ আছে, তার সংজ্ঞামূলক আলোচনার আসল নামকরণ-গুলিও যথেষ্ট সহায়তা করবে, উচ্চ শিক্ষালাভের সময়। তাই প্রথম অবস্থা হতেই আসল বৈজ্ঞানিক নামগুলির ব্যবহার দরকার।

Actuator (প্রোৎসাহনকারক) শ্বাস-প্রশ্বাসের চাপ শ্বাসপ্রশ্বাসের সাহায্যকারী মাংশপেশীর সম্প্রসারণ দ্বারা পরিচালিত এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের, প্রশ্বাসকালীন (শ্বাস নির্গত হবার সময়) অবস্থাতে শব্দ বা ধ্বনি উদ্ভুত হতে প্রোৎসাহিত করে।

Vibrator (স্পন্দনকারক) কণ্ঠের স্পন্দনকারক হচ্ছে Larynx (ল্যারিঙ্গস্)। এই ল্যারিঙ্গস্ই হচ্ছে কণ্ঠস্বরের উৎস ও ইহাকে কণ্ঠস্বর বললে ভুল হবে না। কারণ ল্যারিঙ্গস্ ব্যতিরেকে সঙ্গীতে কণ্ঠস্বরের উৎপত্তি হয় না। (170 পৃষ্ঠার Fig. 2 চিত্রে দ্রষ্টব্য)

Resonator (প্রতিধ্বনিকারক) কণ্ঠনালীর উর্দ্ধভাগীয় গহ্বর। কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি কারক। শ্বাসনালী এবং শ্বাসনালীর শাখা-প্রশাখাগুলি মিন্নাংশ নাদের প্রতিধ্বনি কারক। প্রতিধ্বনি গহ্বরের আকৃতি অনুযায়ী গলার স্বর ও তার তারতম্য নির্দ্ধারিত হয়। (170 পৃষ্ঠার Fig. 2 চিত্রে দ্রষ্টব্য)

এ বিষয়ে সংক্ষেপে আরো কিছু আলোচনা দরকার। কণ্ঠনালীর উপরিভাগের পথ রুদ্ধ হয়েই শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যকারী মাংসপেশীর সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাসে চাপের সৃষ্টি হয়। আর কণ্ঠনালীর উপরিভাগে ভোক্যাল কর্ডের যে কাটা অংশ ফাঁকা থাকে তার মধ্যদিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের বায়ু চলাচল করে। (172 পৃষ্ঠার Fig. 5 চিত্রে দ্রষ্টব্য)। আবার ঠিক প্রয়োজনানুসারে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শূন্যস্থান জোড়া লাগে "অ্যারিটিনয়েড" মাংস পেশীর নির্দিষ্ট সম্প্রসারণতার ও ঢাকনীর কাজ করে। নিম্নাংশে ও পিছনের দিকে পাঁজরার নিকটস্থ যে সকল মাংশপেশীগুলি আছে, সেগুলি দুই শ্রেণীভুক্ত এবং পরস্পর বিরোধী আকর্ষণের কাজ করে। অর্থাৎ এক শ্রেণীর মাংসপেশীগুলি একদিকে আকর্ষণ করলে, অন্যশ্রেণীর মাংশপেশীগুলি বিপরীত দিকে আকর্ষণ করে। এবং দুই দিকের সমানভাবে আকর্ষণ এবং স্থিরভাবে থাকাকালীন অবস্থায় আওয়াজের সৃষ্টি হয় "ভোক্যাল কর্ডের" স্পন্দনে। আর ধ্বনি সৃষ্টির সময় ঢাকনীটি (কণ্ঠনালীর উপরিভাগে) এবং পিছনের পাঁজরার মাংসপেশীগুলি টান থাকা দরকার। বুকের, কাঁধের ও ঘাড়ের মাংস পেশীগুলি অবশ্য সাধারণ অবস্থায় থাকবে। তবেই ঠিকমত ও পদ্ধতিযুক্ত আওয়াজের সৃষ্টি হয়। আর বুকের কাঁধের ও ঘাড়ের মাংসপেশীগুলি আলগা থাকলে স্বরোৎপত্তির স্থানে মাংসপেশীগুলি নির্বিঘ্নে কাজ করতে সক্ষম হয়। আমাদের কণ্ঠের মধ্যে যে "ল্যারিঙ্গস্‌টি" আছে সেটি একটি রবার জাতীয় বস্তু। দরকার মত টানলে সম্প্রসারিত এবং আলগা করলে সঙ্কুচিত হয়। ইহা ঠিক কণ্ঠনালীর উপরিভাগে অবস্থিত। "ভোক্যাল কর্ডগুলি" দুইটি শ্রেণীর জোড়া মাংসখণ্ড বিশেষ। (172 পৃঃ Fig. 5 চিত্রে দ্রষ্টব্য)। ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হবার সময় ভোক্যাল কর্ডগুলি টান হয় এবং কণ্ঠনালীর পথটি রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে বায়ু "লাঙ্গস্‌" হতে বাহির বা "লাঙ্গসের" ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। কণ্ঠনালীর মুখটি যাকে "গ্লটিস্‌" বলে সেই পথটি বন্ধ হয়ে যায়, যখন ভোক্যাল কর্ডগুলি সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। (172 পৃঃ Fig. 5 চিত্রে দ্রষ্টব্য)। "অ্যারিটিনয়েড" এবং "ক্রিকো থাইরয়েড" মাংস পেশীগুলির সাহায্যে ভোক্যাল কর্ডগুলি সম্প্রসারিত হয়। এই শ্রেণীর মাংসপেশীগুলি ল্যারিঙ্গসের সামনেও পিছনের দিকে অবস্থিত। এগুলি আবার "থাইরো অ্যারিটিনয়েড" মাংসপেশীর টানের দ্বারা সঙ্কুচিত হয়। এবং এগুলি ভোক্যাল কর্ডের মধ্যেই অবস্থিত। মাংসপেশীগুলির যথাবিহিত-ভাবে মিলিত প্রক্রিয়ার দ্বারা স্বরের তারতম্য ঘটায়। এর সঙ্কুচিত ভাব স্বরের কম্পন শক্তিকে বৃদ্ধি করে অর্থাৎ সুর উপর দিকে চড়ে যায় এবং এর সম্প্রসারিত ভাব স্বরের কম্পন সংখ্যাকে কমায়, অর্থাৎ স্বর নীচের দিকে নামে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কণ্ঠনালীর উপরিভাগে যে গহ্বর, "ল্যারিঙ্গসের" উপরি ভাগের যে নালী, মুখের ভিতরের উপরিভাগের যে পথ এবং নাসিকার উপরিভাগের যে নালী, ইহারাই আওয়াজের প্রধান প্রতিধ্বনিকারক। (169 ও 171 পৃঃ চিত্রে দ্রষ্টব্য)। শ্বাসনালী ও তার শাখা প্রশাখা নালীর বর্তমান নিম্ন কম্পনযুক্ত আওয়াজের সহায়ক। বায়ুর দ্বারা পরিপূর্ণ, নিয়মিতভাবে পরিবর্তনশীল যে গহ্বর, প্রতিধ্বনিত হবার সময়, ইহা কাহারোর সহিত পরস্পর স্পর্শ করে না। যে স্বরের প্রযোজনার জন্য, যে সুর প্রয়োজন হয়, ঠিক সেইভাবে এগুলি নিয়মিত হয় বা সেই আকার ধারণ করে প্রতিধ্বনিত হয়।

প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষামূলক গবেষণার ফল স্বরূপ এই বিষয়বস্তুর "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্বরসাধনা" যে গঠনমূলক তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই আলোচ্য বিষয়বস্তু নিবিড় কলাতত্ত্ব বিষয়ক এবং সাধারণের পক্ষে সহজ বোধগম্য নয়। তাই ইহার ঔপপত্তিক বিষয়টি যথাসম্ভব সহজ ভাষায় ও আমাদের দেশীয় শিল্পীদের সাধারণ দোষগুণ ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি উল্লেখ পূর্বক ব্যাখ্যা হওয়া উচিৎ। কণ্ঠস্বর নির্গত হওয়ার সময় মুক্তভাবে, সাবলীলভাব ও স্বাভাবিকভাব বজায় থাকা চাই। কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পীদের মধ্যে খুব কমই এমন গুণ দৃষ্ট হয়। ঘাড় এবং চোয়ালের মাংসপেশীগুলি অপ্রাকৃত, মুখেরভাব বিকৃত, বসার ভঙ্গীতে বৈকল্য, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালী অসংশোধিত, শব্দ উৎপাদনকারীর যে "রেজিষ্টার", তার বিকাশ শাস্ত্রসম্মত নয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভয়ানক বিকৃত অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি অনেক শিল্পীর মধ্যে বিদ্যমান। এগুলির ধারাবাহিক বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে প্রকৃত কণ্ঠস্বর উৎপাদনের সময় এগুলি কিভাবে বাধা দেয়। সঙ্গীত শিল্পীরা গান গাইবার সময় মুখের মুদ্রা শুদ্ধ ও সুন্দর রাখতে সমর্থ না হলে, এই মুখভঙ্গী বিকৃত হবার সময়, ঘাড় এবং চোয়ালকে পরিচালিত করতে যে সমস্ত ঘাড়ের ও চোয়ালের মাংসপেশী আছে, সেগুলি শক্তরূপ অর্থাৎ টানভাবে থাকে। মুখের মুদ্রা সাধারণ অবস্থায় থাকলে, মাংসপেশীগুলিও সাধারণ অবস্থায় থাকে। স্বরবর্ণ উচ্চারিত হবার সময় চোয়াল ও ওষ্ঠের মাংসপেশীগুলির আকর্ষণে মুখগহ্বর একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় স্থির থাকলে, সেই নির্দিষ্ট স্বরের উচ্চারণ সম্ভবপর হয়। চোয়ালের মাংসপেশীর সহিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঘাড়ের মাংসপেশীর খুব নিকট সম্বন্ধ, তাই চোয়ালের মাংসপেশীর আকর্ষণের সাথে ঘাড়ের মাংসপেশীগুলিও আকর্ষিত হয়। আবার ঘাড় ও চোয়ালের মাংসপেশী আকর্ষিত হওয়ার সাথে বুকের মাংসপেশীগুলিও আকর্ষিত হয়। এইভাবে শক্তিশালী মাংসপেশীগুলি পরস্পর আকর্ষিত হতে থাকলে কম শক্তি সম্পন্ন "ল্যারিঙ্গসের" ছোট মাংসপেশীগুলি ঠিকভাবে প্রথানুযায়ী কাজ করতে পারে না এবং "ভোক্যালকর্ড" ধ্বনি উৎপাদক সংযুক্ত অবস্থায় আসতে পারে না। আর ভোক্যালকর্ড সংযুক্ত অবস্থায় না এলে শব্দ বা ধ্বনি উৎপাদিত হতে পারে না। ধ্বনি উৎপাদনের জন্য শিল্পীকে ভোক্যালকর্ড সংযুক্ত অবস্থায় আনার জন্য এবং ধ্বনি বা শব্দ উচ্চারণের জন্য 'ল্যারিঙ্গস্'কে নিপীড়িত করতে বাধ্য হয়। ফল ধরা এবং কর্কশ ধ্বনি ছাড়া আর কি মিষ্ট সুরের উৎপাদন হতে পারে? চোয়ালের মাংসপেশীর সঙ্কুচনে মুখমণ্ডলের ভাবও বিকৃত হয়ে যায়।

আমাদের ভারতীয় স্বরোৎপাদন পদ্ধতিতে স্বর উৎপাদন করার সময়, জিহ্বাকে আলগা রাখতে আমরা অভ্যস্ত এবং এরূপ অবস্থায় থাককালীন জিহ্বার পিছন দিকটা "ল্যারিঙ্গসকে" অভিভূত করে ফেলে ও সঙ্কুচক তন্তুপেশী ও জিহ্বার পিছন দিকটা একত্রে গলার পথটি প্রায় বন্ধ করে দেয়। এই সময় গলায় বেশ জোর না দিলে অর্থাৎ প্রশ্বাসের চাপ বৃদ্ধি না করলে কণ্ঠ হতে স্বর নির্গত হয় না। ফলে অস্বাভাবিক আওয়াজের উৎপত্তি হয়। জিহ্বার পশ্চাৎ ভাগও সঙ্কুচক তন্তুপেশীর দ্বারা পথ বন্ধ হওয়ায় সুমিষ্ট ও প্রকৃত কণ্ঠস্বর নির্গত হতে বাধা প্রাপ্ত হয়।

গান গাইবার সময় গলার ভিতরের অংশ ঢিলা অবস্থায় থাকবে, এরকম একটা জনপ্রিয় বিশ্বাস আমাদের শিল্পীদের ছিল। আজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আওয়াজ উৎপন্ন হওয়ার সময় গলা সম্পূর্ণ খোলা ও নির্দিষ্ট অবস্থায় থাকবে, কিন্তু চোয়ালের ওষ্ঠ ও ঘাড়ের মাংসপেশীগুলি সাধারণ অবস্থায় থাকবে। কণ্ঠস্বর উৎপাদন করতে কণ্ঠনালী ঠিক নির্দিষ্ট আকার ধারণ করবে ও স্বরের উৎপত্তি ঠিক কণ্ঠনালীর "ল্যারিঙ্গসের" স্থানে সম্পূর্ণ হবে। এই প্রথাই উপরিউক্ত দোষত্রুটিগুলি সংশোধনের একমাত্র পথ। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শব্দ উচ্চারিত হবার সময় চোয়াল ও ওষ্ঠকে কি ভাবে আলগা রাখা সম্ভব হতে পারে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কারণ, জিহ্বা, ওষ্ঠ, দন্ত প্রভৃতি চোয়ালের সাহায্যেই শব্দ অর্থাৎ কথা উচ্চারিত হতে সহায়তা করে থাকে, আর সেগুলিকেই যদি নিষ্ক্রয় রাখতে হয় তো কথার উচ্চারণ হতে পারে না। যেসব সঙ্গীত ভাষার সহিত জড়িত আছে, সেগুলি কি ভাবে শুদ্ধ প্রথায় পরিবেশিত হবে? এ বিষয়ে অনুসন্ধানক্রমে জানা যায় যে, গলার স্বর যখন সুরের সহিত ভাষাযুক্ত হয় কেবলমাত্র তখনই জিহ্বা, ওষ্ঠ, দন্ত প্রভৃতি পরিচালিত হবার জন্য চোয়ালেরও ঘাড়ের মাংসপেশীগুলি কর্মরত থাকলে "ল্যারিঙ্গস" বা কণ্ঠনালী বিশেষ কোনো ক্ষতির কারণ হবে না। কারণ সে তখন নিজকর্মেরত থাকে এবং অন্যের দিকে শক্তি প্রসার করতে পারে না। কণ্ঠস্বর উৎপাদনের সময় দেহকে কি ভাবে রাখা দরকার অর্থাৎ উপবেশন বা দণ্ডায়মান কোনটি স্বর উৎপাদনের পক্ষে প্রকৃষ্ট। স্বর উৎপাদিত হয় প্রশ্বাসের (শ্বাস নির্গত হবার) সময়। এখানে আমাদের দেখা দরকার যে শ্বাস প্রশ্বাস কি অবস্থায় বেশী সহায়ক। বিজ্ঞান সম্মতভাবে দণ্ডায়মান অবস্থাই শ্বাস প্রশ্বাসের উৎকৃষ্ট অবস্থা। কারণ লম্বভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় শরীরের সমস্ত ভার পায়ের উপর পড়ে। ফলে শরীরের উপরিভাগের মাংসপেশীর উপর কোনো প্রকার চাপ পড়ে না এবং শরীরের অভ্যন্তরের কণ্ঠনালী, ধমণী, শিরা প্রভৃতিগুলি সহজেই কার্যক্ষম হয়। কোনো প্রকার ভাঁজ বা চাপ পড়ে না। কিন্তু উপবিষ্ট অবস্থায় কোমরের নিকট ভাঁজ পড়ে, কারণ কতকগুলি প্রধান মাংসপেশীর আকর্ষণিয় দ্বারাই বসা সম্ভব হয়। কাজেই শ্বাস প্রশ্বাসের সাহায্যকারী মাংসপেশীগুলি পূর্ণভাবে কার্যক্ষম হয় না। তাই শ্বাস প্রশ্বাসের লম্বভাবে দণ্ডায়মান অঙ্গন্যাস অধিক প্রশস্ত। এইভাবে মেরুদণ্ডকে অতি সহজেই সোজা রাখা সম্ভব হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাসের তন্তুপেশীগুলি প্রশস্তভাবে থাকতে পারে ও ঠিকভাবে কাজ করে। এইভাবে অঙ্গন্যাসই প্রকৃত কণ্ঠস্বর উৎপাদনে একটি প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। আমাদের দেশে যারা অভিনয় করেন ও সেইসঙ্গে সঙ্গীতের ও শিল্পী, তাঁদের জীবনে দণ্ডায়মান দেবসংস্থান কণ্ঠ প্রযোজনার একটি প্রয়োজনীয় অভ্যাস। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীর ক্ষেত্রে তানপুরা হাতে লয়ে এবং দীর্ঘ সময় দণ্ডায়মান অবস্থায় সঙ্গীত পরিবেশন সর্বসময়ে সম্ভব নয়। তবে শিল্পীরা এক্ষেত্রে কি ভাবে এবং কি দেহসংস্থান করে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন,সেই সমস্যার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উদ্ভব হয়। যখন দণ্ডায়মান অবস্থায় ভারতীয় (উচ্চাঙ্গ) সঙ্গীত পরিবেশন সম্ভব নয়, তখন দ্বিতীয় পদ্ধতি হিসেবে মেরুদণ্ড যথাসম্ভব সোজা রেখে, অর্থাৎ যৌগিক "পদ্মাসনে"র ন্যাস উপবেশন প্রকৃত স্বর উৎপাদনে সহায়তা করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে শিল্পীর তানপুরাটি তার কানের উপর চেপে রাখতে দেখা যায় এবং সেই কানে তানপুরার আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যায় না। এই পদ্ধতি, কানের সূক্ষ্ম শ্রুতিগুলির অনুভব নষ্ট করে। এই প্রকার অত্যধিক অভ্যাসে শ্রবনেন্দ্রিয়ের শ্রবনশক্তি বিনষ্টও হতে দেখা যায়। তাই উপবিষ্ট অবস্থায় তানপুরা কানের নিকট হতে যতদূর সম্ভব দূরে রাখা বাঞ্ছনীয়। যদি অন্য কোনো ব্যক্তি তানপুরা ছাড়তে সহায়তা করেন, সঙ্গীত পরিবেশনের সময় তো আরো ভাল, অবশ্য যদি শিল্পীর এ বিষয়ে কোনো দুর্বলতা না থাকে। যতদূর জানা যায় যে, আমাদের দেশে কণ্ঠস্বর সাধনা শিক্ষা করার সময়, শ্বাস প্রশ্বাসের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর দিকে শিক্ষার্থীরা বা শিক্ষকরা দৃষ্টি রাখেন না। এটা প্রমাণিত হয়, তাঁদের শ্বাস প্রশ্বাসের পদ্ধতি অবলোকন করে। স্বর সাধনার অবিচ্ছেদ্য অংশ এই শ্বাস প্রশ্বাস প্রণালীর দিকেও আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। এই বিষয়ে বহু মতদ্বৈত আমাদের এবং পাশ্চাত্যদেশেও ছিল, কিন্তু বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করেছেন তাঁরা। এসম্বন্ধে তাঁরা বলেছেন যে শ্বাস এমনভাবে গ্রহণ করা উচিৎ যে তা শ্বাস নালীর মধ্যদিয়ে সোজাসুজি লাঙ্গসের তলদেশে মধ্যচ্ছদা (Diaphragm) পর্যন্ত পৌঁছবে এবং পেটের উপরিভাগের অংশে বা বুকের হাড়ের নিম্নাংশে অর্থাৎ মধ্যচ্ছদায় সামান্য চাপ আসে। (172 পৃঃ Fig. 5 চিত্রে দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই চাপ ক্রমশঃ কমে শ্বাস ও প্রশ্বাসের সমান চাপ প্রকৃত কণ্ঠস্বর উপাদন অতি সহজভাবে সহায়তা করে।

স্বরোৎপত্তির আলোচনাক্রমে এরপর আমাদের কণ্ঠস্বরে 'রেজিষ্টার' বিষয়টির সম্বন্ধে বলা দরকার। ভারতীয় পদ্ধতিতে এই "রেজিষ্টারের" বিষয়বস্তু নিয়ে কোনো আলোচনা ইতিপূর্বে কোনো ভারতীয় সঙ্গীত গ্রন্থে আমাদের গোচরে পড়েনি। হয়তো এই "রেজিষ্টার" স্বরসাধনার ক্ষেত্রে অনেকের নিকট নূতন মনে হতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ এর বর্তমান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কণ্ঠস্বরের মধ্যে অনস্বীকার্য। অনেকে মনে করে থাকেন যে, ইহা হয়তো অন্য কিছু। কিন্তু ইহা শ্বাস প্রশ্বাসের চাপে ও তন্তুপেশীর সঙ্কুচনে ভোক্যাল কর্ডের উপর সামঞ্জস্য বজায় রেখে 'ল্যারিঙ্গস্'কে স্বপ্রধান করণই "রেজিষ্টারের" প্রধান অভিব্যক্তি বা কাজ। অবশ্য এ সম্বন্ধে ইউরোপীয় দেশেও অনেকে ভুল ধারণার বশবর্তি হয়ে, মানব কণ্ঠে সাতটি, কেহ কেহ পাঁচটি এবং কোনো কোনো মতে তিনটি রেজিষ্টারের কথাও উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে ওখানকার গবেষণার ফলই প্রমাণ করেছে যে, মানুষের কণ্ঠের মধ্যে কেবলমাত্র দুই শ্রেণীর তন্তুপেশী দৃষ্ট হয়, যার দ্বারা ভোক্যাল কর্ডগুলি পরিচালিত হয়ে থাকে এবং মানুষের কণ্ঠে দুটি "রেজিষ্টারের"ই বর্তমান পাওয়া যায়। প্রথমটির নাম "লোয়ার রেজিষ্টার" ও দ্বিতীয়টির নাম "আপার রেজিষ্টার" এবং এরা যথাক্রমে প্রথমটি "ক্রিকোথাইরয়েজ" এবং "থাইরো অ্যারিটিনয়েড" শ্রেণীর মাংসপেশী এবং দ্বিতীয়টি "পস্টেরিয়র এবং ল্যাটারেল-ক্রিকো-অ্যারিটিনয়েড" শ্রেণীর মাংসপেশীর দ্বারা পরিচালিত। (170 পৃঃ Fig. 2 চিত্রে দ্রষ্টব্য)। প্রথমতঃ রেজিষ্টারের কারীগরী হচ্ছে, স্বরোৎপাদন পদ্ধতি শুদ্ধ হলে স্বরের প্রগাঢ়ত্ব নির্ণয় করে, এ ছাড়া সুরের সীমানা নির্দ্ধারণ, এর কাজ নয়। আরো পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য আমরা যদি "ডবল রীড" হার্মোনিয়ামের দৃকপাত করি তাহলে দেখি "ডবল রীড" অর্থে দুই শ্রেণীর রীড্ দ্বারা দুই প্রকার আওয়াজের উদ্ভব অর্থাৎ "ব্যাস জুরী" বা যথাক্রমে পুরুষের ও নারীর কণ্ঠস্বরের সাদৃশ্য। এখন এই হার্মোনিয়ামের দুই শ্রেণীর রীডেরই ষ্টপার যদি একত্রে খুলে দেওয়া হয় এবং তার চাবির উপর বাজাবার জন্য চাপ দিলে দুই রীডযুক্ত আওয়াজের উদ্ভব হয়। হার্মোনিয়ামের মধ্য—সপ্তকে যখন বাজানো হয় "ব্যাসও জুরী" রীডের আওয়াজ সমানভাবে আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু যখন মন্দ্রসপ্তকের দিকে বাজানো হয়, তখন "ব্যাসরীড" আওয়াজের প্রাধান্য বেশী হয়। আবার যখন তারসপ্তকের দিকে বাজানো হয়, তখন জুরী রীড়ের আওয়াজ বেশী প্রাধান্য বিস্তার করতে আরম্ভ হয়। আমাদের কণ্ঠস্বরে যে আপার ও লোয়ার রেজিষ্টার আছে তা যথাক্রমে নারী ও পুরুষের বা জুরী ও ব্যাস রীডের আওয়াজের সমান রূপ। স্বরের প্রগাঢ়ত্ব নির্দ্ধারিত হয় লোয়ার রেজিষ্টারের প্রাধাণ্যের তারতম্যে। আপার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রেজিষ্টারের প্রাধান্য কণ্ঠস্বরে জুয়ারীর বা ওভারটোনের উদ্ভব হয়। এই দুই যেখানে সমানভাবে ও প্রয়োজনানুসারে আংশিকভাবে বর্তমান থাকে সেখানে কণ্ঠস্বরের মিষ্টত্ব ও লালিত্যভাব বেশী বিদ্যমান হয়। সাধারণত পুরুষের কণ্ঠস্বরে লোয়ার রেজিষ্টারের বেশী এবং মহিলার কণ্ঠস্বরে আপার রেজিষ্টারের অধিক স্পন্দন দৃষ্ট হয়। এ জন্য পুরুষের কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য এবং নারীর কণ্ঠস্বরে সরু আওয়াজ উৎপত্তি হয়। যেসব নারী-কণ্ঠস্বরে লোয়ার রেজিষ্টারের সুষ্ঠুভাবে উন্নতি দেখা যায়, তাদের কণ্ঠস্বর দীপ্তমান গাম্ভীর্যপূর্ণ ও গোল হয় এবং যেসব পুরুষ কণ্ঠস্বরে আপার রেজিষ্টারের স্পন্দন বেশী প্রতীয়মান হয়, সেইসব পুরুষ কণ্ঠস্বর নারীকণ্ঠস্বররূপ প্রাপ্ত হয়। আবার পুরুষ কিংবা নারীর কণ্ঠস্বরে যে কোনো রেজিষ্টারের যদি বৃদ্ধির কারণ স্বরূপ অদ্ভুত রকমের এক দোষ পরিদৃষ্ট হয় এবং "মিক্‌সড রেজিষ্টারের" উদ্ভব হয়। এই মিক্‌সড রেজিষ্টারের গলার সুমিষ্ট ও লালিত্যপূর্ণ স্বর উৎপত্তি হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই সব দোষ হতে মুক্ত হতে হলে গলার অভ্যন্তরের মাংসপেশীগুলি কিভাবে কাজ করে এবং কিরূপে আপার ও লোয়ার রেজিষ্টারের প্রকাশ হয়, তার অনুশীলন করলে, সমতা বজায় রাখা যায়।

সঙ্গীত পরিবেশনের সময় শিল্পীদের মধ্যে যে মুদ্রাদোষ ও বিকৃত অঙ্গভঙ্গী দেখা যায়, সেগুলিও কণ্ঠস্বর উৎপাদনের ক্ষেত্রে কতদূর সহায়ক তার দিকেও কিছু আলোচনা দরকার। ভাব প্রকাশের জন্য সামান্য জাতের প্রয়োজনীয় ও স্বাভাবিক গতিবিধি স্বরোৎপাদনে বিশেষ ক্ষতি বা বাধা প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু এই ভাব প্রকাশের দোহাই দিয়ে ওস্তাদীভাব বজায়ের জন্য হাত, মুখ, মাথা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন ক্ষতি কারক এবং সুরস্বরোৎপাদনে সর্বদা পরিত্যাজ্য। আমরা শিক্ষকতার সময় দেখেছি যে কোনো কোনো ছাত্র বা ছাত্রী গান সুরু করার সময় বা আলাপ কিম্বা তান করার সময় হাতের সঞ্চালন, ঘাড়ের বা মাথার ঝটকা বা অন্য কোনো প্রকার অঙ্গভঙ্গী ব্যতিরেকে স্বরোৎপাদনে যথেষ্ট অসুবিধা বোধ করে। এর প্রধান কারণ এই যে, চোয়াল, ঘাড়ের ও স্কন্ধের প্রভৃতি অন্যান্য মাংসপেশীগুলি সাধারণতঃ শক্ত অবস্থায় থাকে, সেহেতু কোনো ধাক্কা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বা আকর্ষণের পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত সাধারণ স্বরোৎপাদনে কর্মক্ষম হয় না।

অনেক সময় কোন কোন শিল্পীদের মুখে সঙ্গীত পরিবেশন শুরু করার সময় শোনা যায় যে, কিছু সময় গান গাইতে না থাকলে গলা গরম হয় না এবং গলা না গরম হলে কণ্ঠস্বরের প্রকৃত সুর নির্গত হয় না। এটা ত্রুটিপূর্ণ স্বরোৎপাদনেরই লক্ষণ এবং দোষ শুদ্ধ না হলে কোন সময়ই এই অভ্যাস দূরীভূত হবে না। তাদের অভ্যাস কণ্ঠস্বর উৎপাদনের সময় বুকের, স্কন্ধের ও ঘাড়ের এবং নিম্নাংশের চোয়ালের মাংসপেশীগুলি স্থিরভাবে সঙ্কুচিত থাকে এবং সেগুলি ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত আকর্ষণ মুক্ত বা স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরে না। যখনই আকর্ষণ মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আসে তখন আসল স্বরোৎপাদনকারী তন্তুপেশীগুলি ঠিক ভাবে প্রকৃত ও স্বাভাবিক স্বরোৎপাদনে কার্যক্ষম হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

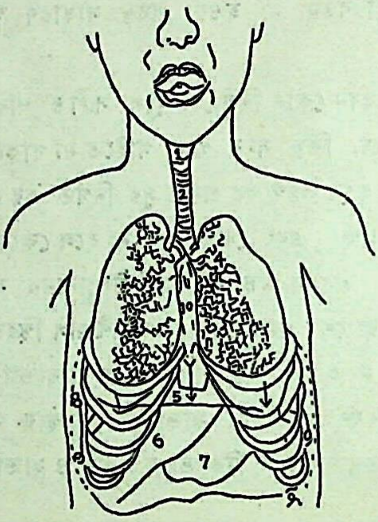

FIG. 1 The Vocal Instrument seen from the front.

The upper ribs have been omitted to allow the lungs to be seen.

The dotted line on each side of the ribs indicates their expansion when breathing in. The arrows indicate the lowering of the diaphragm.

1. Larynx	4. Left Lung	7. Stomach
2. Trachea	5. Diaphragm	8. False ribs
3. Right Lung	6. Liver	9. Floating ribs
		10. Sternum

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

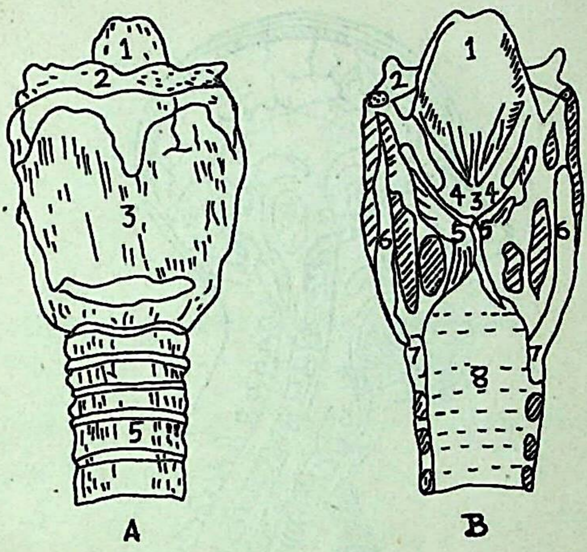

FIG. 2 Showing Organs. These are the Larynx and Vocal Cords.

Picture A Larynx Front

1. Epiglottis
2. Hyoid Bone
3. Thyroid Cartilage
4. Cricoid Cartilage
5. Trachea

Picture B Larynx (Vertical Section).

1. Epiglottis
2. Hyoid Bone
3. Glottis
4. Upper Vocal Cords
5. Lower Vocal Cords
6. Thyroid Cartilage
7. Cricoid Cartilage
8. Trachea.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

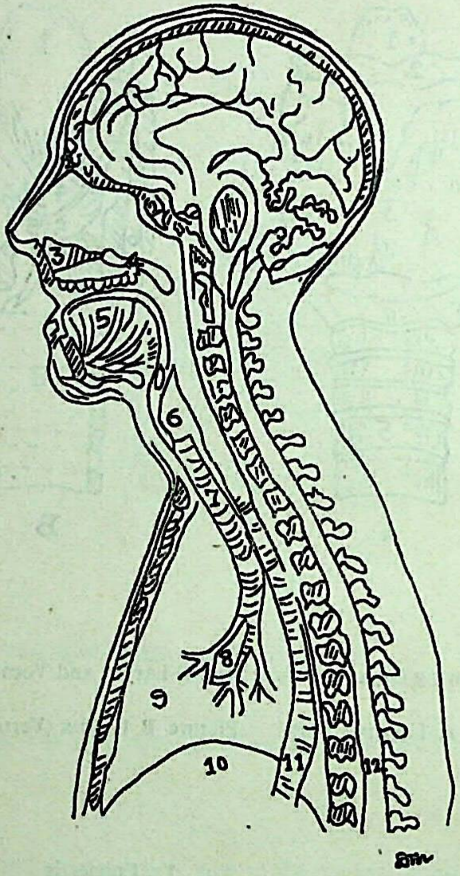

FIG. 3 The Vocal Instrument seen from the side.

1. Frontal Sinus	7. Trachea (Section)
2. Sphenoid Sinus	8. Bronchiae (Ramification of the Trachea)
3. Hard Palate	9. Left Lungs
4. Soft Palate	10. Diaphragm.
5. Tongue	11. Oesophagus
6. Vocal Cords (in Larynx)	12. Spind Column.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

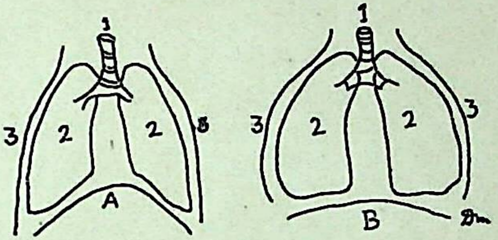

FIG. 4 Changes in Lungs and Diaphragm when breathing.

1. Frachea — A. Diaphragm at rest
2. Lungs — B. Diaphragm lowered when breathing in
3. Theracis Walls.

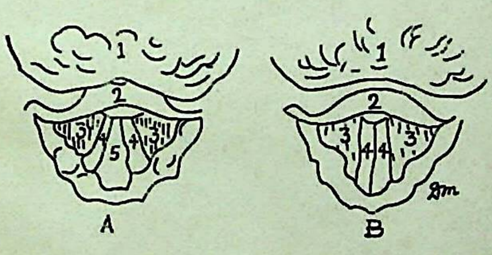

FIG. 5 Opening of Larynx seen from above.

1. Tongue — 5. Opening of the Trachea (Glottis)
2. Fpiglottis — A. Glottis Open
3. Upper Vocal Cords — B. Glottis Closed (at production of sound)
4. Lower Vocal Cords.

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

NOTES :

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi